মরুভাস্কর

হজরত মোহাম্মদ

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বুলবুল হাউস
২৩ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'মরুভাস্কর' প্রকাশিত হইল। বইখানি লেখা হয় প্রায় চার বছর আগে। তখন এর নামকরণ হইয়াছিল 'মরুর দেশের নবী'। নানা কারণে নাম পরিবর্ত্তন করা হইল।

হজরতের জীবনীর উপকরণের জন্যে আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় কোরান, হাদিস, তাবকাত, তাবারি, ইবনে হিশাম, তারীখে সগীর ও কবীর প্রভৃতি জীবনেতিহাস, মক্কা ও মদিনা শরীফের বিবরণ এবং 'মাগাজী' ও 'কিতাবুশ শামায়েল' নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীর উপর।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া এই পুস্তক ও ইহার ভূমিকা প্রণয়নে মওলানা শিবলীর 'সিরাতুন্নবী', মওলানা মোহাম্মদ আলীর কোরানের অনুবাদ ও Muhammad : the Prophet, সৈয়দ আমীর আলীর Spirit of Islam, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত', মওলানা সুলায়মান নদবীর 'খোতবাতে মাদ্রাজ', মিঃ খালেদ গবার 'The Prophet of the Desert, খাজা কামালুদ্দীনের 'The Ideal Prophet', কারলাইলের Heroes and Hero-worship ও অন্যান্য পুস্তক হইতে নানাভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় হজরতের জীবনী এখনো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ হিন্দু লেখকরাই বাঙ্গলায় হজরতের জীবনী আলোচনার সূত্রপাত করেন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে মরহুম শেখ আবদুর রহীম ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের পুস্তকই উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেব তাঁহার বহুদিনের সাধনা ও দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষার ফল মোস্তফাচরিত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার মুসলিম সমাজের ধর্ম্মগুরুর প্রতি অবহেলার কলঙ্ক অনেকখানি দূর করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গলা ভাষায় একখানি সর্ব্বজন পাঠ্য প্রামাণ্য হজরতের জীবনীর অভাব বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম। এই অভাব দূর করিবার জন্যই 'মরুভাস্কর' প্রকাশিত হইল।

মরু-ভাস্কর

—মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্

যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে—সাধনা ও তপস্যার গহনে তলিয়ে গিয়ে মানুষের জন্যে যাঁরা উদ্ধার করে এনেছেন মহাসত্য—পিষ্ট ঘৃণাহত মানুষের জীবনে যাঁরা এনেছেন সৌষ্ঠব, ফুটিয়েছেন লাবণ্য, মরু-ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা তাঁদের একজন। মহাগ্রন্থ কোরাণে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

يا ايها النبى انا ارسلنٰك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الى الله باذنه و سراجاً منيراً *

"হে নবী তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে, খোশখবরদাতা হিসাবে, সতর্ককারী হিসাবে,—আল্লার অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসাবে এবং উজ্জ্বল আলো হিসাবে।"

যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষকে সত্যপথ দেখাবার জন্য নবী পয়গম্বরেরা এসেছেন। তাঁদের এক একজনের চরিত্রে ফুটে উঠেছে মহৎ জীবনের এক একটা বৈশিষ্ট্য। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, এ সকল বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ হয়েছে মোস্তফা-চরিতে। শেখ সাদীর ভাষায়: বালাগালউলা বেকামালিহি—কাশাফাদ্দুজ্জা বেজামালিহি—তাঁর গুণাবলী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে—তাঁর সৌন্দর্য্য সব অন্ধকার দূর করেছে।

শুধু ভক্ত মুসলমান সমাজেই নয়, অন্য সমাজেও হজরতের প্রশংসাগীতি বিঘোষিত হয়েছে উদাত্ত স্বরে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার সুবিজ্ঞ

লেখক লিখেছেন : 'Of all the religious personalities of the world Muhammad was the most successful'. 'পৃথিবীর ধর্মনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছেন হজরত মোহাম্মদ।'

মনীষী ড্রেপার লিখেছেন : হজরত ছিলেন সেই মানুষ, মানব-সমাজের উপর যিনি সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন "The man who of all men has exercised the greatest influence upon the human race."

ঐতিহাসিক গিবনের মতে ইসলামের অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, মনুষ্য-সমাজে যার প্রভাব হয়েছিল স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী—"one of the most memorable revolutions which impressed a new and lasting character on the nations of the globe."

জর্মন মনীষী Joseph Hell বলেছেন : Never in so rapid and direct a manner, has any religion achieved such world-affecting changes as Islam has achieved. And never has the setter-forth of a new religion been so complete a master of his time and people as Mohamed was.

ধর্মগুরুর কাছে মানুষ কি আশা করে? কার মাথায় দিতে চায় সে মহাপুরুষের গৌরবমুকুট? অধঃপতিত জাতিকে ধ্বংসের পাঁক থেকে তুলে উন্নতির রাজপথে তুলে দিলেন যিনি, তাঁকেই বলব মহাপুরুষ? তাই যদি হয়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের অমানুষগুলোকে অল্প দিনের মধ্যে যিনি জ্ঞানেবিজ্ঞানে, শৌর্য্যেবীর্য্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন তাঁর চেয়ে বেশী কৃতিত্ব কার এই ব্যাপারে? একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা জাতি সভ্যতার উচ্চতম স্তরে আরোহণ

করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন নজির নেই এর : Never has a people been led more rapidly to civilization, such as it was, than were the Arabs through Islam (Hirshfeld).

শতধা বিভক্ত কলহরত মানুষকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে জাতিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা যদি মহাপুরুষের লক্ষণ হয়, আরবের রক্তপিপাসু গোত্রগুলোকে যিনি একত্ব ও জাতিত্বের রশিতে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁর চেয়ে মহাপুরুষত্বের যোগ্যতর দাবীদার আর কাকে বলব ?

পাপ ও কুসংস্কার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যেই যদি হয় মহাপুরুষের আবির্ভাব, বলা যেতে পারে, রসুলের সময় আরব দেশ সম্পূর্ণরূপেই মুক্তি পেয়েছিল অন্যায় অবিচার পাপ ও কুসংস্কার থেকে।

রাজ্যজয় যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয়, বিধবা আমিনা মায়ের সন্তান যে রাজ্য জয় করেছেন এবং যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোথায় পাওয়া যাবে তার তুলনা ?

দেখতে চাও চরিত্রবল, মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, আল্লার উপলব্ধি, বিপদে ধৈর্য্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতা—হজরতের জীবনী পাঠ কর—কত কোমল মধুর সুরে, কত কঠিন মূর্চ্ছনায় আমৃত্যু বেজেছে আল-আমিন হজরত মোস্তফার জীবন !

ব্যক্তিত্বের কথা বলবে ? মৃত্যুর পূর্ব্বেই আরব দেশ তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল—আর আজ তেরশ' বছর পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের চল্লিশ কোটি লোক তাঁর অভিবন্দনা করে—মারহাবা ইয়া সারওয়ারে কায়েনাত—সুন্দর তুমি, মহান তুমি বলে'।

হজরত মোহাম্মদের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তার ঐতিহাসিকতা। * হজরতের জীবনের প্রত্যেকটি

* মওলানা সুলীয়মান নদবীর 'খোৎবাতে মাদ্রাজ' দ্রষ্টব্য।

ঘটনা প্রত্যেকটি খুটিনাটির বিবরণ যে ভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কষ্টি-পাথরে কষে যে ভাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোন মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয় নি। কোরানের উক্তি ছাড়াও সাহাবী, তাবায়ী, তাব য়ে তাবায়ী এবং এক লক্ষের মতো রাবী হজরতের জীবনের ঘটনা বিবৃত করেছেন।

হজরত বলেছেন—'আমার সম্বন্ধে যা জান প্রচার কর', সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন—'আমার সম্বন্ধে যে মিথ্যা প্রচার করবে তার স্থান জাহান্নামে।' এই জন্যে হজরতের সম্বন্ধে প্রচার হয়েছে খুব—তেমনি মিথ্যা প্রচার করতেও সকলের হয়েছে সঙ্কোচ।

আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্য-গ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেল্‌ত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোন কিছু লিখে রাখা আরবেরা লজ্জার কথা বলে মনে করত। সাহাবীরা এবং অন্যান্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

শুধু মুখস্থ করেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সত্যের কষ্টিপাথরে প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি উক্তি তাঁরা যাচাই করে দেখেছেন। হাদিস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের হালে-চালে, আচারে-ব্যবহারে, স্বভাবে-চরিত্রে, কথায়-কাজে এতটুকু ত্রুটি হাদিসশাস্ত্রবিদরা উপেক্ষা করেন নি। যে সব হাদিস, কোরানের, ঐতিহাসিক সত্যের, বৈজ্ঞানিক সত্যের, সুপ্রচলিত ও বিশ্বাসযোগ্য অন্যান্য তথ্যের বিরোধী, তা বাতিল করা হয়েছে নিঃসঙ্কোচে। যে সব লোক জীবনে কখনো মিথ্যাচরণ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে—যাঁদের দেহমনের সুস্থতা সম্বন্ধে হয়েছে সন্দেহ—যাঁরা এতটুকু অতিরঞ্জনপ্রবণ—যাঁরা রাজশক্তি বা অন্য কোন পার্থিব শক্তি কর্তৃক প্রভাবান্বিত হতে পারেন বলে সন্দেহ হয়েছে, তাঁদের উক্তি সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে বর্জ্জিত। এই ভাবে হাদিস যাচাই করতে গিয়ে মুসলিম

শাস্ত্রবিদরা 'আসমায়ে রেজাল' اسماء الرجال নামে এক নূতন শাস্ত্রেরই সৃষ্টি করেন। *

মোস্তফা-চরিত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার জীবনী ও ইতিহাস-গ্রন্থ ছাড়াও আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক লক্ষ হাদিস। সুবিজ্ঞ মুহাদ্দেসরা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর গবেষণা করে এই এক লক্ষ হাদিসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 'সেহাহ্ সেত্তা'র লেখকরা সত্য ও বিচারের কষ্টিপাথরে হাদিস তথা হজরতের জীবনকে যেভাবে কষে নিয়েছেন তাতে জলজ্বল করে' ফুটে উঠেছে হজরত-জীবনের ঐতিহাসিকতা।

জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন: কোন ধর্মনেতা বা বিজয়ীর জীবনীই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হজরত মোহাম্মদের জীবনের সঙ্গে তুলিত হতে পারে না।

অন্যান্য নবী-পয়গম্বরদের সঙ্গে হজরত মোস্তফার তফাত এই যে তিনি জাতি বিশেষ বা দেশবিশেষের জন্যে আসেন নি। তিনি এসেছেন বিশ্ব-মানবের মঙ্গলের জন্যে। তাই অন্য যত নবী জন্মেছেন যুগে যুগে দেশে দেশে, সকলকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই কোরানের ভাষায় তিনি বলছেন:

و ان من امة الا و خلا فيها نذير

'এমন কোন জাতি নেই যার ভেতর সতর্ককারীর আবির্ভাব হয় নি।'

সত্যিকারের মুসলমান যে, তাকে মেনে নিতে হবে সকল নবীকে। শুধু কোরানে উল্লিখিত নবী নয়, কোরানে উল্লিখিত হয় নি এমন অখ্যাত,

* জার্মান মনীষী ডক্টর শ্প্রিঙ্গরের মতে:—একমাত্র মুসলিমরাই 'আসমায়ে রেজালে'র মতো শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। 'আসমায়ে রেজালে' ৫ লক্ষ লোকের জীবনী আলোচিত হয়েছে। হজরতের মৃত্যু-সময়ে সাহাবী-সংখ্যা ছিল এক লক্ষের বেশী। এঁদের মধ্যে ১১ হাজার সাহাবী হজরতের জীবনী সম্বন্ধে উক্তি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'আসমায়ে রেজালে'র বদৌলতে। ('সিরাতুন্নবী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

অপরিচিত নবীরাও ইসলামের নবী—মুসলমানের সম্মানের পাত্র। কোরান বলছে :

و لقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك *

'আমরা তোমার (মোহাম্মদের) আগে অনেক রসুল পাঠিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কারো কারুর কাহিনী তোমায় বলেছি—কারো কারুর কাহিনী বলিনি।'

এই ভাবেই মরুভাস্কর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বশান্তি ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আয়োজন করেছিলেন।

আমাদের হজরত মোস্তফা মানবতার গৌরব। তিনি ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের পুত্র নন, দেবতা নন, অবতার নন—তিনি মানুষ—আমাদেরই মত দোষে গুণে তিনি মানুষ। দোষ-ত্রুটিকে জয় করে তিনি মানুষ—দিনের পর দিন সাধনায় তপস্যায় উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর রূপে আত্মার আগুন জ্বালিয়ে তিনি মানুষ। জলদগম্ভীর স্বরে তিনি ঘোষণা করেছেন :

انا بشر مثلكم

'তোমাদেরই মতন মানুষ আমি।' মানবতার এই যে জয়ঘোষণা—এ এনেছে চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব—করেছে নূতন সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন।

মানুষ এতদিন নিজেকে নিতান্তই ছোট ভেবে এসেছে। যে কেউকে দেখেছে সে মহান, যে কেউকে দেখেছে সে বিরাট—তাকেই ভেবেছে সে দেবতা। মহাপুরুষকে দেবতা ভেবে সে পর করেছে—নিজের সম্বন্ধে হয়েছে নিরাশ। মানুষ মোহাম্মদ তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন—তার সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন সম্ভাবনার বিরাট রেখাচিত্র। আত্মবিশ্বাসে মন তার পূর্ণ হয়েছে—উন্নতির আবেগে হৃদয় হয়েছে আন্দোলিত।

হজরতের দাবী তিনি আদর্শ মানুষ—ওস্‌ওয়াতুন্ হাসানা—জীবনের সকল সময়, সকল অবস্থায় তিনি মানুষের আদর্শ হতে পারেন। অনাথ এতিমের

আদর্শ যদি দেখতে চান আবুল কাসেম মোহাম্মদ বিন আবদুল্লার শৈশবের খেলাধূলা স্মরণ করুন, মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশুর আদর্শে যদি প্রয়োজন হয় তায়েফের খোশনসিব ধাত্রী হালিমা সাদিয়ার ঘরে শিশু মোজতাবাকে দেখে আসুন। "ধনাঢ্যের আদর্শ মক্কার বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী আর 'বাহরায়েন' এর খাজিনার মালিক 'বাদশাহ' মোহাম্মদের জীবন; সর্ব্বহারা নির্য্যাতিত মানুষের আদর্শ আবুতালেবের গিরিগুহায় দীর্ঘ দিনের জন্যে নির্ব্বাসিত অত্যাচারিত মোহাম্মদ (দঃ), বিজয়ী বীরের আদর্শ বদর আর হুনায়েনের সেনাপতি মোহাম্মদ (দঃ), বিজিতের আদর্শ ওহোদের মোহাম্মদ (দঃ), শিক্ষকের আদর্শ মদিনার মসজিদ আর 'আহ্‌লে সাফ্‌ফার' শিক্ষকের বরণীয় জীবন, ছাত্রের আদর্শ হেরাগুহায় জিব্রাইলের নিকট শিক্ষা-পাওয়া সাধক। নবীজীর বাগ্মিতার পরিচয় পেতে চান তো মদিনার মীনারে দীর্ঘ দশ বছরের বক্তৃতা শুনুন, আল্লার পথে সহায়সম্বলহীন সংগ্রাম ও সাধনারত মহামানবের আদর্শ খোঁজেন তো মক্কায় নবীজীর তের বছরের নবীজীবনের ইতিহাস পাঠ করুন। আবার যদি পরাজিত শত্রুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছেন এমন বিজয়ী বীরের আদর্শ চান, তবে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কাবিজয়ী মোহাম্মদ মোস্তফাকে দেখুন। আদর্শ সাংসারিক মহামানবকে যদি দেখবার ইচ্ছা হয়, তবে খয়বার, ফিদাক আর বনীনোজায়ার গোত্রের ভূসম্পত্তির মালিক হজরতের সন্ধান করুন। আরব মরুর মেষচারক সংযতচরিত্র আহমদ আল-আমিনের বরণীয় জীবনী সারাবিশ্বের যুবজীবনের আদর্শ; ব্যবসায়-দ্রব্য স্কন্ধে কোরেশ কাফেলার সাথী, সিরিয়াগামী সওদাগর মোহাম্মদ, কর্ম্মী ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজের সম্মুখে আদর্শের আলোকস্তম্ভ।" *

৬১ বৎসরের ক্ষুদ্রপরিসর জীবনে হজরতকে কত পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখ্‌লে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন দুর্ব্বল এতিম

* মওলানা সুলায়মান নদবীর 'খোৎবাতে মাদ্রাজ'। এই অনুচ্ছেদের অনুবাদ: অধ্যাপক মোস্তফিজুর রহমান

তিনি হয়েছিলেন আরবের পরাক্রান্ত 'অধীশ্বর'। যিনি ছিলেন সর্ব্বহারা, তিনি হয়েছিলেন আরবের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েও তাঁর জীবনের মূলসূত্র ছিল অপরিবর্ত্তিত। Bosworth Smith কেমন সুন্দর বলেছেন: "In the shepherd of the desert, in the Syrian trader, in the solitary of Mount Hira, in the reformer in the minority of one, in the exile of Medina, in the acknowledged conqueror, in the equal of Persian Chosroes and the Greek Heracleus, we can still trace a substantial unity. I doubt whether any other man, whose external conditions changed so much, ever himself changed less to meet them: the accidents are changed, the essence seems to me to be the same in all."

সর্ব্বহারা-জীবনে তাঁর ছিল যে পোষাক, যে আহার, যে চালচলন—পরের সফল জীবনেও ঠিক ছিল তাই। রাজসিংহাসন এক কথায় পরিত্যাগ করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন কাজ রাজশক্তি হাতে রেখে ফকির-দরবেশের জীবন যাপন করা। হজরত যখন মদিনার রাষ্ট্রের অধিনায়ক তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল—একখানি খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সোরাহী। অনেক দিন তাকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।

আরবের যিনি অধিপতি, গোষ্ঠিপতি দলপতি দেশাধিপতি যাঁকে দেয় আনুগত্য, সেই মহিমান্বিত হজরতের মৃত্যু-সময় কি ছিল সম্বল? তাঁর বর্ম্ম বন্ধক রেখে এক ইহুদীর বাড়ী থেকে কিছু খাদ্য-শস্য আনা হয়েছিল, কর্জ্জ শোধ দিয়ে সেখানি তখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুর পূর্ব্ব নিশীথে বিষাদের অন্ধকারে তাঁর ঘরে আলো দেয় নি স্নেহবর্জ্জিত প্রদীপ।

হজরতের চরিত্রে অদ্ভুতভাবে সংমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজেয় অকুতোভয়—সত্যে ও সংগ্রামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্ব্বতের মতো অচল*—শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্য্যাতন আহত হয়ে ফিরে যায় যাঁর অন্তরের লৌহ-কবাটে, সেই লোকই —আবার দেখতে পাই—কুসুমের চেয়েও কোমল। বন্ধুবান্ধবের জন্যে তাঁর প্রীতির অন্ত নেই—মুখ তাঁর সবসময় হাসিহাসি†, ছেলেপিলের সঙ্গে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে—পথে দেখা হলে বালক-বন্ধুকে তার বুলবুলির খবর জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভুল হয় না। করমর্দ্দন করবার সময় হাত টেনে নেন না তিনি কখনো আগে। বন্ধুবিয়োগে চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহুদিন পরে ধাই-মা হালিমাকে দেখে 'মা আমার—মা আমার' বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন।

মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্ব্বতের ধারে বসে হজরত বক্তৃতা করছিলেন। একটা লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হজরত অভয় দিয়ে বললেন: ভয় কচ্ছ' কেন? আমি রাজা নই—কারুর মুনিবও নই—এমন মেয়েমানুষের সন্তান আমি, শুষ্ক খাদ্যই ছিল যার আহার্য্য।

হজরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেন নি—কাউকে অভিসম্পাৎ করেন নি। আনাস নামক ভৃত্য দশ বছর হজরতের চাকুরি করার পর বলেছেন—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হজরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেন নি কখনো। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েও হজরতের

* ওহোদের যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্য চতুর্দ্দিক থেকে আক্রান্ত হয় এবং হুনায়েনের যুদ্ধে যখন বেশীর ভাগ সৈন্য পালাতে শুরু করে, হজরত তখন অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন

† জাব্বির বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন—হাসিমুখ ছাড়া তিনি কখনো হজরতকে দেখেন নি।

মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয় নি। বরং তিনি বলেছেন: এদের জ্ঞান দাও প্রভু—এদের ক্ষমা করো।

হজরতের জীবনের ও সত্যের নিকৃষ্টতম শত্রু মক্কাবাসীদের প্রতি বিজয়ের দিনে হজরতের ব্যবহার ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে। জীবন ভর যারা দিল লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার নির্য্যাতন—প্রত্যেক সুযোগেই যারা হেনেছে বৈরিতার বিষাক্ত বাণ, মক্কাবিজয়ের পর জয়ীর আসনে—বিচারকের আসনে বসে তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা। বললেন: তোমাদের সম্বন্ধে ফরিয়াদ নেই কোন আমার। তোমরা আজাদ—মুক্ত—স্বাধীন। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কাল দিনের পর দিন যারা করেছে তাঁর উপর অত্যাচারের পরখ, তাদের ক্ষমা করায় হজরতের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন Muir সাহেবও হয়েছেন অবাক: The magnanimity with which Mahomet treated a people who had so long hated and rejected him is worthy of admiration.

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা-চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাসব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, 'রহমতুল্লিল আলামিন' রসুলুল্লাহ্ তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী। কোরানের ভাষায়:

يـا ايها الداس انا خلقدا دم من ذكـر و انثى و جعلنا كم شعوبا و
قبايل لتعارفـوا - ان اكرمكم عدد الله اتقكم *

"হে মানুষ তোমাদের সৃষ্টি করেছি একই পুরুষ ও স্ত্রীলোক থেকে। তোমাদের বিভাগ ও গোত্র শুধু পরিচয়ের জন্যে। আমার কাছে সে তত বেশী মহৎ যে যত বেশী সৎকাজ করবে।" হজরত আরো বলেছেন—"ইসলামে জাতিভেদ নেই।" "যারা সংযত ও চরিত্রবান তারা যে বংশের যে দেশের লোক হোক না কেন, তারাই আমার স্বজন।"

শুধু উপদেশ নয়—সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

মানুষকে নমাজে আহ্বান করার জন্য মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হয়েছিল হাবশী গোলাম বেলালকে। গোলাম জায়দের সঙ্গে হজরত বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের নিকট আত্মীয়—ফুফুতো বোন জয়নবের। ইসলাম-জগতে এই আদর্শ যুগে যুগে অনুসৃত হয়েছে। এরই প্রভাবে ভারতের ইতিহাসে আমরা দাসরাজবংশ দেখতে পাই।

মাত্র কয়েক বৎসর আগের কথা। হেজাজের সুলতান ইবনে সউদ কাবাশরীফে তওয়াফ করতে আসেন। নজদ-হেজাজের পরাক্রান্ত বাদশা শুধু একখানি সাদা তহবন্দ পরে ও একখানি গায়ে জড়িয়ে খালি পায়ে মাতাফে প্রবেশ করলেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে মিশে দৌড়ে দৌড়ে তওয়াফ করতে লাগলেন। 'হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' চুম্বনের সময় ভিড় হওয়ায় সিপাহী সুলতানের জন্যে একটু জায়গা করে দেবে ভেবেছিল। বৃদ্ধ বেদুইন চেঁচিয়ে উঠল—'কে মালিক, কে রাজা! তোমার রাজারও ঘর নয় এটা—বাবারও ঘর নয়। দীন দুনিয়ার মালিকের এই ঘর।' শুনে সৈনিক চমকে উঠল। সুলতান হেসে বললেন—ঠিকই বলেছ বাবাজী, এ ঘর আল্লার; আমরা তাঁর বান্দা আর পরস্পর ভাই ভাই!*

শুধু দাসের অবস্থা নয়, নারীর অবস্থায়ও পরিবর্ত্তন এনেছেন আঁ হজরত। নারীর মর্য্যাদা ছিল তাঁর মহাশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা খাতুন-ই-জিন্নাত ফাতেমাতুজ্জোহ্‌রাকে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হজরত ঘোষণা করেছেন:

الجنة تحت اقدام الامهات—বেহেশ্‌ত মায়ের পদপ্রান্তে।

ইসলামে—আইনে ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর যে স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল

* 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য': মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত

তা দেখে আজিকার সভ্যযুগেও আমরা বিস্মিত হই। মুসলিম নারী ১৩শ বছর আগে যে আইনগত অধিকার পেয়েছে এখনও পাশ্চাত্যের মেয়েরা সম্পূর্ণরূপে তার অধিকারী হয় নি।*

মানব-সমাজে অসাম্য দূর করবার জন্যে হজরতের চেষ্টা ছিল অসাধারণ। সুদ দেওয়া-নেওয়া (usury and interest) তিনি করেছিলেন নিষিদ্ধ। এখনও হয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে ইসলামের সাম্যনীতি। ইসলামী উত্তরাধিকার-বিধি ব্যক্তি-বিশেষের হাতে ধনসঞ্চয় অসম্ভব করে তোলে। সঞ্চিত ধনের শতকরা আড়াই টাকা জাকাত বা Poor-Tax হিসাবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত দরিদ্রের জন্যে আদায় করে নেওয়ার নিয়মও একেবারেই আধুনিক। এই নিয়ম কাজে পরিণত হলে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে দেশের সমস্ত অকেজো মূলধন (unproductive capital) জাতির জন্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ইসলামের অদ্ভুত সাফল্যের গোড়ায়ও হয়ত ছিল এই সমাজ-বিপ্লবের আদর্শ। মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন: "Revolt of Islam saved Humanity······ইসলাম মানব-সমাজকে রক্ষা করেছে। বিজয়ী আরবরা যে দেশেই অভিযান করেছেন সেখানকার অধিবাসীরাই তাঁদের বাইজানটাইন দুর্নীতি (corruption), ইরাণী স্বেচ্ছাচার (despotism) ও খৃষ্টান কুসংস্কারের হাত থেকে পরিত্রাণকারী বলে বরণ করে নিয়েছে।" †

রাজনীতি-ক্ষেত্রে হজরতের পরিকল্পনা ছিল হয়ত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইখওয়াতে ইসলামের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হলে বিশ্বসংগ্রামের উপদ্রব থেকে মানুষ উদ্ধার পেত, সন্দেহ নেই।

সভ্যতার ইতিহাসে হজরতের শ্রেষ্ঠ দান হয়ত চিন্তার স্বাধীনতা—বুদ্ধির মুক্তি। কোরান বলছে لا اكراه فى الدين—ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তির স্থান

* Status of women in Islam অধ্যায় :Spirit of Islam by Amir Ali.

† Historic Role of Islam by M. N. Roy.

নেই। হজরতও বারেবারে এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। মদিনা-বাসীরা হজরতের সেবাব্রতে দীক্ষিত হওয়ার সময় যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন নানা কারণে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আকাবার এই বায়আৎ পুণ্যের দীক্ষা—পবিত্র জীবনের দীক্ষা—মুক্তবুদ্ধির দীক্ষা। এই বায়আতের সর্ত্ত এই যে হজরতের সৎ ও সঙ্গত কাজে মদিনাবাসী যোগদান করবেন। অর্থাৎ হজরতের কোন্ আদেশ তাঁরা প্রতিপালন করবেন তার বিচারের ভার দীক্ষিতদের ওপর। দীক্ষাগুরুর কথা বিচারের উর্দ্ধে এই ধারণার জ্বলন্ত প্রতিবাদ এই বায়আতের সর্ত্ত। অতএব বলা যায় "স্বাধীনচিন্তা মুসলমানের দীক্ষামন্ত্র—তার বায়আতের প্রধানতম সর্ত্ত।" * পরবর্ত্তী যুগের মুসলিম দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের মূলসূত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে এইখানে।

কুসংস্কারকে হজরত কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নি। একবার হজরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্য্যগ্রহণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে: বুঝি হজরতের বিপদে প্রকৃতি শোকবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হজরত এই যুক্তিবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন: "আল্লার বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি—চন্দ্র ও সূর্য্য। কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে এদের গ্রহণ লাগতে পারে না"।

হজরত জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান হারাণো উটের মতো—তাকে তিনি খুঁজে বার করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরো বলেছেন তিনি: জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালী শহীদের লোহুর চাইতেও পবিত্র। কোরানের সর্ব্বপ্রথম আয়ত—একরা বে ইস্‌মে রাব্বাকাল্লাজি খালাকা—اقرأ باسم ربك الذى خلق......এতেও রয়েছে জ্ঞানের উল্লেখ—এর ভেতর দিয়ে স্রষ্টা লেখনী নিঃসৃত জ্ঞানের আলোক দিয়ে মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করলেন।

* 'মোস্তফা-চরিত' (৩৯৮—৩৯৯ পৃষ্ঠা): মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

এইভাবে ইসলামের Rationalistic Philosophyর আরম্ভ হল— যা থেকে জন্ম হয়েছে ইউরোপের রেঁনেসার। হজরতের আবির্ভাব ও পৃথিবীর নবজন্মলাভ কারলাইল কেমন সুন্দর বর্ণনা করেছেন:

To the Arab Nation it was as a birth from darkness into light; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world; a Hero-Prophet was sent down to them with a word they could believe: see, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world-great; within one century afterwards, Arabia is at Grenada on this hand, at Delhi on that;—glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life-giving. The history of a Nation becomes fruitful, soul-elevating, great, so soon as it believes. These Arabs, the man Mahomet and that one century,—is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand; but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Grenada! I said, the Great Man was always as lightning out of Heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame.

মরু-ভাস্কর

পাপের রাজ্য

মানুষ স্বভাবতই পাপপ্রবণ ; পাপের মোহন মায়া তাহাকে অতি সহজেই আকর্ষণ করে। যখন আদিম মানুষ সকল ব্যথাবেদনার উর্দ্ধে, সমস্ত দুঃখ-ক্লেশের অতীতে, আল্লার অনন্ত করুণার সৃষ্টি—নিঃসীম শান্তির নিলয় স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিত, তখনও পাপের আহ্বান তাহার কাছে আসিয়াছিল। সেদিন সে এক অনাস্বাদিত সুখের প্রলোভনে মজিয়া আপনাকে কালিমালিপ্ত করিয়াছিল, অনন্ত আলোকের দেশ ছাড়িয়া সে এই দুনিয়ার শত দুঃখের কণ্টকবনে অশ্রুজলে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে মলিনতার দিকে মানুষের বিরামহীন প্রবৃত্তি, পঙ্কিল পথের দিকে তাহার অবিশ্রান্ত গতি।

কিন্তু মানুষের যিনি স্রষ্টা, সৃষ্টির মহান্ উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যর্থ হইতে দেন নাই। জগতে যখনই নীতি ও ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়াছে, দুর্নীতি ও অধর্ম্ম মানুষের পাপ-প্রবৃত্তির আশ্রয়ে লালিত ও পুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিয়াছে, তখনই আল্লার অন্তহীন প্রেম-করুণার মূর্ত্তিমান প্রতীকরূপে আলোকের প্রদীপ হাতে লইয়া মহামানুষেরা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শত দুঃখ-লাঞ্ছনা সহিয়া—লৌহের মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-

বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দৃষ্টিহারা মানুষের জন্য পথ কাটিয়া চলিয়াছেন। কণ্টকের ঘায়ে চরণ তাঁহাদের ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, অস্ত্রের আঘাতে দেহ তাঁহাদের জর্জ্জরিত হইয়াছে, ঝঞ্ঝার দাপটে অঙ্গের বসন তাঁহাদের ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু হাতের বাতি তাঁহাদের নিবিয়া যায় নাই, উর্দ্ধদেশ হইতে যে আলোক-ধারা নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের অন্তরগুলিকে চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা পরিম্লান হয় নাই।

জগতের এই সব মহামানুষেরাই নবী, রসুল বা পয়গম্বর। স্বর্গের শুভ সন্দেশ বহন করিয়া তাঁহারা মানব-সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন। পাপ-তাপের দহনে মানুষ জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহারা আসিয়া তাহাকে জীবনের কল্যাণ-বাণী শুনাইয়াছেন। রঙীন মোহের আকর্ষণে চিরসুন্দরের পথ ছাড়িয়া মানুষ আবিলতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাঁহারা নিজেদের মঙ্গল-হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিয়াছেন। আত্মাকে ভুলিয়া ভ্রান্তি ও বিস্মৃতির ঘোরে মানুষ আপনার ভাগ্যে শত নিগ্রহ সহস্র দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিয়াছে; তাঁহারা নন্দন-বনের মধু বিলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। আপনার আবাস ছাড়িয়া মানুষ শত লাঞ্ছনা ও অপমানে অশ্রু-নীরে তিতিয়া ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়াছে; তাঁহারা প্রেম ও পুণ্যের অভিসিঞ্চনে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

তথাপি পাপের দিকে মানুষের অন্তহীন প্রবণতা, কলুষিত জীবনের দিকে তাহার অবিশ্রান্ত প্রবৃত্তি। এইজন্যই নবী, রসুল ও পয়গম্বরদের নিবেদিত জীবনের শত প্রয়াসকে তুচ্ছ করিয়া যুগে যুগে তাহার পতন যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিঃসীম করুণার পারাবার—রহমানুর্রহিম্ আল্লার যেন ইচ্ছা নয় যে পাতিত্য ও ভ্রষ্টতার পঙ্কিল পথে অনন্ত অভিশাপের দিকে মানুষের অবিরাম গতি হোক। তাই নীতি ও ধর্ম্মকে তাহার জীবন-কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অধর্ম্ম ও অনাচারের

প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সৎ ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য, যুগে যুগে মহামানুষেরা ঊর্দ্ধলোকের আহ্বান লইয়া জন-সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (তাঁহার উপর আল্লার আশীর্ব্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক !) এই শ্রেণীর একজন মহামানুষ। মরুভূমির দেশ—আরবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অধঃপতিত মানুষকে মুক্তি-সাধনার পথ দেখাইবার জন্য জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে শত শত নবী ও রসুল আলোকময় জীবনের আহ্বান লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরদিন তাঁহাদের মতানুসরণ করে নাই। পাপের প্ররোচনায় সে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া দুর্নীতিকণ্টকিত, শত কলুষকলঙ্কিত জীবনকে সাগ্রহে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। যে পূত পবিত্র—শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মাকে মানব সমাজে চিরঞ্জীব করিবার জন্য তাঁহারা জগতের মঙ্গল-প্রয়াসে আপনাদেরে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, মানুষ তাহাকে বিভ্রম ও বিলাসের প্রবঞ্চনায় পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে।

পবিত্র জীবনের এই অপমান ও লাঞ্ছনা ঘুচাইয়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হজরত মোহাম্মদ আসিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের প্রাক্কালে ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া সে-যুগের সভ্যজগতের অবস্থা সত্যই অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ—সকল মহাদেশেই পাপের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান—সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই প্রাচীন গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও নীতি ছাড়িয়া দুর্নীতি ও অনাচারের পথে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ প্রাচীন সুসভ্য দেশ। কিন্তু এই সময় ভারতীয়েরা ঐশী বাণীর মর্য্যাদা ভুলিয়া সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অসংখ্য দেব-দেবীর

মূর্ত্তিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা, একদিকে, উদার সাম্যনীতির আশ্রয়ে লালিত মহান মানবতার মূল্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া তাহার জন্য দেবতার বেদী রচনা করিয়াছিলেন; অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘৃণায়, অবহেলায় পতিত শূদ্র ভাবিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের তুচ্ছতম অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

চীনের ধর্ম্মীয় জীবনেও এইযুগে চরম অধঃপতন দেখা দিয়াছিল। কংফুচ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া চীনবাসীরা শুধু নানারূপ দেবদেবীর কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দেশের রাজাকেও পুরুষানুক্রমে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার আসনে বসাইয়া তাঁহার পূজায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমাপূজা ও মানবপূজার নিত্য সহচর যে-সব নৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি, সেগুলিও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বিবিধ প্রকার ব্যভিচার ও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহারা পুণ্য ও পবিত্রতার পথ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

সুসভ্য ইরাণের অবস্থাও এযুগে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখানকার অধিবাসীরা নিরাকার বিশ্বস্রষ্টাকে ছাড়িয়া অগ্নিপূজা গ্রহপূজা প্রভৃতিকে নিজেদের আত্মিক জীবনের প্রধান সম্বল করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সমাজের নৈতিক ভিত্তিও একেবারে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। পশুপ্রকৃতির প্ররোচনায় তাঁহারা হীনতম প্রবৃত্তিপূজাকে ধর্ম্মানুষ্ঠান কল্পনা করিতে শিখিয়াছিলেন।

ইউরোপে এক রোমান সাম্রাজ্য ছাড়া আর সবখানেই ধর্ম্মের নামে অনাচার ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ত্রিত্ববাদের নামে মানুষপূজা, যাজক ও পুরোহিতদের পূজা খৃষ্টান সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং সুসভ্য রোমান সাম্রাজ্যের দশাই বা কি দাঁড়াইয়াছিল? সম্রাট জষ্টিনিয়ান যখন কনষ্টান্টিনোপলের সিংহাসনে সমাসীন, তখনকার সমাজের

পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত চরিত্রে। চরিত্রহীনা থিয়োডোরা সম্রাটের সঙ্গিনীরূপে রাজসম্মানের অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আদর্শ মানুষের সামাজিক ও গোপন জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্ম ও নীতির বাধা পায়ে দলিয়া জনসাধারণ অতি সহজেই পাপের পূজারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সে-কালের জগতের এই কালিমাকলঙ্কিত চিত্রকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল আরব দেশ। মদাসক্তি, ব্যভিচার, জুয়াখেলা আরবসমাজের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছিল। নরহত্যা, শিশুহত্যা, দস্যুতা আরবদের গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মীয় শাসনের নামগন্ধ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। অবাধ ব্যভিচারের ফলে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও এই পাপ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।

এক অদ্বিতীয় বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব মুখে মুখে স্বীকার করিলেও আরবেরা হাতে-গড়া প্রতিমাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। দেবতার প্রীতি কামনা করিয়া নরবলি দেওয়ার প্রথাও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। সদ্যপ্রসূত সন্তান কন্যা হইলে তাহাকে তাঁহারা জীবন্ত সমাহিত করিতেন। আত্মহত্যা আরবসমাজে অত্যন্ত সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোষ্ঠিগত কলহ-বিবাদ প্রায়ই রক্তপাতকর যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিণত হইত। লুণ্ঠন, নরহত্যা ও প্রতিহিংসা আরব প্রকৃতিকে এমনই হিংস্র করিয়া তুলিয়াছিল যে নারীরা শত্রুর রক্তে বসন রাঙাইয়া তাহার কাঁচা কলিজা চিবাইয়া খাইত।

আরবদের এই পতনের পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রতিমা-পূজা। শত শত দেব-মূর্ত্তি রচনায় যেন তাঁহাদের অবনত আত্মার তৃপ্তি হইতেছিল না। তাই তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদের, এমন কি মূর্ত্তিহীন প্রস্তরখণ্ডের পূজা করিতেন। আরব দেশে এ যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানের সংখ্যাও নিতান্ত কম

ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা তাঁহাদের ধর্ম্মের নীতি ও শিক্ষা হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। নিরাকার আল্লার উপাসনা খৃষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা। কিন্তু এ কালের খৃষ্টান সমাজে প্রাচীন ভারত, গ্রীস, পারস্য ও রোমের পৌত্তলিকতা ও জড়পূজা ধীরে ধীরে আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। খৃষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগুরুর প্রচারিত সহজবোধ্য পবিত্র বিশ্বাস হারাইয়া নানারূপ কুসংস্কার ও পাপপ্রথার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক কথায় যীশুর ধর্ম্ম জড়পূজার মূলোচ্ছেদ করিয়া জগতে মহান আল্লার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু সেই ধর্ম্মই আবার মানুষের পাপ-প্রবণতার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়াছিল। যীশু আসিয়াছিলেন, আল্লার প্রেরিত রূপে, কিন্তু অনুবর্ত্তীরা দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব ও মধ্য-এসিয়ার সেমিটিক জাতিগুলিও প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অতি জঘন্য রকমের পৌত্তলিকতায় ডুবিয়া গিয়াছিল। মানুষের এই প্রকার অধঃপতনের ফলে যত রকমের দুর্নীতি ও অনাচার সমাজ-দেহে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে তাহার কোনোটীর প্রভাব হইতেই তাহারা মুক্ত ছিল না। ফলকথা, সে যুগে পরিজ্ঞাত জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন এক অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পতিত মানুষের মলিন আত্মা পঙ্কিলতার অতল তলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

সৃষ্টির সেরা মানুষের এই দুর্গতি দেখিয়া বিধাতার আসন টলিল। গহীন রাত্রির বুকে ঊষার জন্ম হইল। চারিদিকে যখন কেবলই অন্ধকার, তখনই আলোকের আগমন-সম্ভাবনা নহবতের বাজনায়, বাঁশীর সুরে বাজিয়া উঠিল। জগতের কৃষ্ণতম অংশে ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানহীন পশু-মানুষের মধ্যে আল্লার মূর্ত্তিমান করুণা মোহাম্মদ আত্মপ্রকাশ করিলেন।

শৈশব—বাল্য—কৈশোর

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ কোরেশ। আবদুল মুত্তালিব কোরেশ বংশের দলপতি। তিনি বয়সে, বুদ্ধিতে, বিচারে প্রবীণ। কা'বা আরবের—সম্ভবতঃ জগতের প্রাচীনতম উপাসনালয়। ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া মানুষের অধঃপতন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কা'বায় প্রতিমা পূজার প্রচলন হইয়াছিল। লাত্, ওজ্জা, হোবল প্রভৃতি তিন শত ষাটটী প্রতিমা এখানে আরবদের পূজাপ্রবণ মসীমলিন চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কা'বার নামে অখণ্ড আরবদেশ সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইত। এই সম্মানিত কা'বার সেবক ও রক্ষক আবদুল মুত্তালিব। নিঃসীম তাঁহার প্রভাব, অন্তহীন তাঁহার খ্যাতি, ধীর প্রশান্ত গভীর গম্ভীর তাঁহার মূর্ত্তি। তাঁহার পরিপক্ক কেশ, সুচিক্কণ শ্বেত শ্মশ্রু আরবের অন্তরে এক অপূর্ব্ব সম্মোহন জাগাইয়া তোলে। মক্কার সামাজিক ও ধর্ম্মীয় জীবনে সমুচ্চ তাঁহার আসন।

আজ আবদুল মুত্তালিবের গৃহে আনন্দ উৎসব। প্রদীপ্ত সূর্য্য মরুভূমির বালুকায় আগুন লাগাইয়া তাহাতে যেন আপনিই জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দগ্ধ কাঞ্চনের মত তাহার রূপ। দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশির ওপারে অনন্ত জলধি-বক্ষে সে অস্তোন্মুখ। মদিনার পথ ধরিয়া মক্কার দিকে চলিয়াছে সুসজ্জিত পথিকদল। এপথে বণিকদলের দৈনন্দিন গতিবিধি। কিন্তু আজিকার নিশা-সমাগমে এই পথিকদের দেখিলে মনে হয় ইঁহারা বণিক নন। উটগুলির মনোরম সাজ-সজ্জা আরবীয় অশ্বগুলির সুশিক্ষিত পদচারণ, পথবাহীদের অঙ্গের বসন-ভূষণ—সব কিছুতেই যেন এক উৎসবের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মরু-ভাস্কর

শহরের একখানি গৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আগুনের কুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে রাশি রাশি ধূম উপরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন ধরণীর বক্ষ হইতে উৎসবের আবেদন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত আকাশের উদ্দেশে উৎসারিত হইতেছে। গীতবাদ্য, হাসি-তামাসায় স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অতিথিরা দলে দলে আসিয়া মিলিত হইতেছেন। সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয় মরুভূমির দুর্দ্ধর্ষ সন্তানদের জীবনে আজ এক অপূর্ব্ব উৎসব-লীলা শুরু হইয়াছে। অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে সমবেত অতিথিরা ভূরিভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন। পরিবেশনকারীরা বড় বড় থাঞ্চায় ভরিয়া পালান্ন, পেয়ালায় ভরিয়া নানা প্রকার সুপক্ক মাংস, লঙ্কামিশ্রিত কফি, গ্লাস ভরিয়া গাঢ় তপ্ত চা বহন করিতেছেন। দুই শতের উপর অতিথি—দলপতি শেখ, যাযাবর বেদুইন, নগর-কোতোয়াল, পণ্যব্যবসায়ী বণিক, কোরেশ বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যুদ্ধকুশল সেনানী, হোবল মন্দিরের কথক-পুরোহিত—সকলেই আজ আবদুল মুত্তালিবের গৃহে আনন্দ-ভোজনে যোগ দিয়াছেন।

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কা'বার সেবক ও রক্ষকরূপে আরব সমাজে তাঁহার অদ্বিতীয় স্থান। তিনি আজ অতিথি-সৎকারে মহাব্যস্ত। বৃদ্ধের জীবনে যেন সহসা যৌবনের ছোঁয়া লাগিয়াছে। তিনি একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া অতিথিদের তুষ্টিসাধন করিতেছেন। হাসি-রহস্যে নিরুদ্বেগ আনন্দে মজলিসটীকে তিনি গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব দেহকান্তি, হাস্যদীপ্ত মুখসৌষ্ঠব দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, বৃদ্ধের রাজমহিমার সম্মুখে আরব সমাজ মস্তক অবনত করে। তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টিমান চক্ষু, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর সমুন্নত নাসিকা, মনোহর ওষ্ঠ-ভঙ্গিমা সব কিছুতেই তাঁহার গৌরবের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আরব-শ্রেষ্ঠ আবদুল মুত্তালিবের গৃহে আজ তাঁহার এক পিতৃহীন পৌত্রের জন্মোৎসব।

শৈশব—বাল্য—কৈশোর

আপনার পৌত্রের কি নাম দিয়াছেন ? অতিথিরা প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। কোলের শিশুকে দেখাইয়া আবতুল মুত্তালিব বলিলেন : আমি ইহার নাম রাখিয়াছি মোহাম্মদ।

হাশেম, আবতুল মন্নাফ, কালেবে, লোয়া, নজর, আদনান, আজ, নাবাত, হামাল, কাইদার, ইসমাইল, ইব্রাহিমের বংশে আপনার জন্ম। তাঁহাদের নাম ছাড়িয়া এ নূতন নাম আপনি কেন রাখিলেন ?—অতিথিরা সবিস্ময়ে আবতুল মুত্তালিবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ পৌত্রের মুখে স্নেহভরে হাত বুলাইয়া বলিলেন : কারণ আমি আশা করি একদিন আমার দেওয়া এই মোহাম্মদ নামটী জগতের সবখানে প্রশংসিত হইবে, বিশ্ববাসীর অন্তরে এ নাম এক অপূর্ব্ব সম্মানের আসন অধিকার করিবে।

আবতুল মুত্তালিবের কণ্ঠে চিত্তপ্লাবী আনন্দের আভাস। তাঁহার পুত্র-কন্যা অনেকগুলি—কেহ কেহ বলেন আঠারটী। ইহাদের মধ্যে আবতুল্লাই ছিলেন তাঁহার সবচেয়ে বেশী আদরের। সত্যই তিনি আবতুল্লাকে এতো ভালোবাসিতেন যে ইব্রাহিমের ন্যায় তিনিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহাকে কা'বার প্রতিমাগুলির উদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন, কিন্তু কোরেশ প্রধানগণের অনুরোধে পুত্রের পরিবর্ত্তে একশত উট বলি দিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। শিশু মোহাম্মদের চোখে মুখে তিনি আবতুল্লার ছায়া দেখিলেন এবং এক অনাগত মহামহিম-ভবিষ্যতের আশায় তাহার নামকরণ করিলেন।

সেদিন আবতুল মুত্তালিবের গৃহে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মঙ্গল-উৎসব চলিল। ঢোলকের আনন্দ-বাজনা, সঙ্গীতের মধুর আলাপ, কলকণ্ঠের হাস্যধ্বনি সমস্তই বিবি আমিনার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তিনি শুইয়া শুইয়া তারকা-চিত্রিত আকাশের তলে আপনার অন্তরটিকে ভাসাইয়া ছিলেন। এমনই আর একটী রাত্রির কথা তাঁহার মনে পড়িল। বন্ধু

নজ্জার বংশের আবদুল ওহাবের প্রিয় কন্যা আমিনা সেদিন উচ্চশির কোরেশের গৃহে নববধূ রূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের অদৃষ্ট তাঁহার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই স্বামী আবদুল্লা তাঁহাকে ছাড়িয়া মরণের পরপারে চলিয়া গেলেন। তারপর বিধবা আমিনার কোলে আজ চাঁদ-শিশু নামিয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন; উৎসবের মধুরিমার মাঝখানেও লোকান্তরিত স্বামীর স্মৃতি তাঁহার চক্ষু অশ্রু-ছলছল করিয়া তুলিল।

শিশু-মোহাম্মদের মহান্ ভবিষ্যতের কথা মক্কাবাসীরা কিছুই জানে না। কিন্তু তিনি পবিত্র কা'বার সেবায়েত, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানপ্রবীণ আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। কোরেশ প্রধানেরা তাহাকে নয়নের পুত্তলি করিয়া রাখিলেন। আবদুল মুত্তালিব শিশু-পৌত্রকে বুকে করিয়া পুত্রের বিয়োগ-ব্যথা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে দু'হাতে তুলিয়া নাচান, মোহাম্মদের ক্রীড়ারত হাত দু'খানি দাদার চোখে মুখে আসিয়া পড়ে। বাহিরের লোকজন দেখিলে শিশু দাদার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে মুখ লুকায়। আবদুল মুত্তালিব হাসিয়া তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রস্ফুট করিয়া তোলেন। শুধু আবদুল মুত্তালিব বলিয়া নয়; শিশু মোহাম্মদের চাচারাও বিশেষতঃ আবুতালেব ও হামজা—তাঁহাকে আদরে সোহাগে অভিষিক্ত করেন। মোহাম্মদ পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া দুনিয়ার আলো দেখিয়াছেন, দেশের প্রথানুসারে শীঘ্রই তাঁহাকে জননী আমিনার বক্ষসুধা, দাদার স্নিগ্ধ দৃষ্টির ছায়া, চাচাদের আদর-সোহাগ—এসবও ছাড়িয়া যাইতে হইল। জন্মের পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত তিনি মাতার কোল জুড়িয়া রহিলেন; এর পরেই তাঁহাকে আবদুল মুত্তালিবের গৃহের ক্রীতদাসী সোয়ায়বার কাছে

আসিতে হইল। কিন্তু তখনও দাদার সঙ্গ তাঁহাকে আনন্দ দিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখ হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। বনু সা'দ বংশের হালিমা নাম্নী এক ধাত্রীর হাতে তাঁহাকে সঁপিয়া দেওয়া হইল। মোহাম্মদ মায়ের কোল, দাদার সঙ্গ ছাড়িয়া মুক্ত মরুভূমির মাঝখানে বীরহৃদয় শুদ্ধভাষী আরব সন্তানদের কঠোর সুন্দর জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন।

কিন্তু শিশু-মোহাম্মদের তখনও ধাত্রীর কোল ছাড়িয়া চলিবার বয়স হয় নাই। হালিমা সাদরে সস্নেহে তাহাকে আপনার বক্ষসুধা দান করেন। তাঁহার এক পুত্র শিশুর সমবয়সী; তাহার সহিত এক অপূর্ব্ব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রকে একই দোলনায় চড়াইয়া গান গাহিয়া ঘুম পাড়ান। দেখিতে দেখিতে দিন, মাস, বৎসর—এক, দুই, তিন বৎসর কাটিয়া যায়। মোহাম্মদ এখন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান; হালিমার ছেলেরাই তাঁহার খেলার সাথী। চার, পাঁচ বৎসরের শিশু দুধ-ভাইদের সঙ্গে ছাগল দুম্বা চরাইতে যান। ছাগল দুম্বা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা ধূলা-মাটী লইয়া খেলা করে। গায়ে তাহাদের কামিজ, পাগুলি তাহাদের নাঙ্গা। এই সব রাখাল বালকদের সঙ্গে বালক-মোহাম্মদ রাখাল সাজিয়া মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া আপনার ক্ষুদ্রতায় অবাক হইয়া যান। হালিমা দেখেন: তাঁহার ছেলেদের সহিত মিশিয়া মোহাম্মদ গৃহে ফিরিতেছেন। দৌড়িয়া গিয়া তিনি মোহাম্মদকে কোলে তুলিয়া লন। এই বালক তাঁহার নিজের সন্তান নহে। একথা তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার চোখ মুখ দিয়া অন্তরের অপরিসীম স্নেহ গলিয়া পড়ে। সত্যই হালিমার হৃদয়ে বালকের জন্য জননী-হৃদয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হইয়াছে। ছয় বৎসর পরে আবদুল মুত্তালিব পৌত্রকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ধাত্রীকে সংবাদ পাঠাইলেন। হালিমার অন্তরে যেন কেহ বিষাক্ত কাঁটা ফুটাইয়া দিল। কিন্তু ছয়টি বৎসর স্নেহময়ী জননীর আসন অধিকার করিয়া থাকিলেও তিনি ধাত্রী মাত্র। আপনার অন্তহীন

অপূর্ব্ব মমতার দৃষ্টি দিয়া বালককে ঘিরিয়া রাখিলেও তাহাকে চিরদিন লালন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাই তিনি ব্যথাজীর্ণ হৃদয়ে, সাশ্রুনয়নে বালককে পিতামহের গৃহে লইয়া আসিলেন। পুরস্কার তিনি অনেক পাইলেন, ইনাম-বক্‌শীশ তাঁহার প্রচুর মিলিল। কিন্তু তাঁহার অন্তরে বালকের জন্য যে স্নেহসুন্দর স্থানটী রচিত হইয়াছিল, তাহা শূন্য রহিয়া গেল। চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া তিনি আপনার মরু-নিকেতনে ফিরিলেন।

জননী আমিনা আপনার বুকের মাণিক ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার চোখে আজ তরলিত আনন্দ অশ্রু হইয়া দেখা দিয়াছে। একটি অসহায় অক্ষম শিশুকে তিনি হালিমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। আজ সে আর তেমনটী নাই। অস্থিমাংসের শিশুটী এখন ছোট একটি মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে। বালকের বুদ্ধি জন্মিয়াছে, আপনার মনে তিনি কত-কি ভাবিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার মতিগতি, চালচলন বিবি আমিনাকে অবাক্ করিয়া তোলে। নিঃসীম উদার আকাশের গভীর নীলিমা মরুভূমির প্রখর সূর্য্য-কিরণে ঝলসিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীতে যেন বালকের বক্ষে নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মধুস্রাবী মৃদু কণ্ঠের ধ্বনি জননীকে পাগল করিয়া তোলে। আপনার খেলা ছাড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে মায়ের কোলে ছুটিয়া আসেন, তাঁহার মুখে মুখ রাখিয়া স্নেহের আবেদনে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেন। বিবি আমিনা আপনার পিতৃহারা সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, চুমার উপার চুমা দিয়া তাহার গোলাপ-গণ্ডটীকে রাঙাইয়া তোলেন। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব দূর হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখেন; পুলকে আনন্দে আবেগে তাঁহার বুকটী দুরু দুরু কাঁপিতে থাকে; প্রিয়তম পুত্র আবদুল্লার স্মৃতি তাঁহার চোখের পাতা ভিজাইয়া দেয়।

কিন্তু পিতৃস্নেহবঞ্চিত বালকের ভাগ্যে এই সুখটুকুও সহিল না। বিবি আমিনা আপনার দুলালকে সঙ্গে লইয়া দাসী ওম্মে আয়্‌মনকে সাথী করিয়া

মদিনায় স্বামী আবদুল্লার সমাধি দর্শন করিতে গেলেন। সেখানকার বনু নজ্জার বংশে আবদুল মুত্তালিবের পিতা বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবি আমিনাও ঐ বংশ হইতে কোরেশ-দলপতির পুত্রবধূরূপে মক্কায় আসিয়াছিলেন। আজ তিনি ছয় বৎসরের পিতৃহারা পুত্রকে লইয়া স্বামীর সমাধি-স্মৃতির সন্ধানে স্বজনসম্মিলনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মক্কা হইতে এই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা হইল। তিনি আর আবদুল মুত্তালিবের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন না। প্রিয়তমের দেহের ছোঁয়া লাগিয়া যে মাটী মধুগন্ধে মেদুর হইয়া আছে, স্বামীর দেহজ বালক-পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তিনি তাহাতে মাথা ঠেকাইলেন, তারপর দাসীর সহিত মক্কার পথে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু চরণ তাঁহার চলে না ; অন্তরাত্মা তাঁহার প্রিয়তমের সঙ্গ ছাড়িয়া পৃথিবীর বুকে আর বাসা বাঁধিতে চায় না ; যতোই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততোই তাঁহার অঙ্গ বিবশ হইয়া আসিতে লাগিল। আবওয়া'য় আসিয়া তিনি একেবারেই লুটাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহাকে উঠিতে হইল না। কান্নারত বালক-পুত্রকে বুকে চাপিয়া তিনি ধূলি-মলিন ধরণীর ঊর্দ্ধে প্রিয়-সঙ্গমে চলিয়া গেলেন।

ওম্মে আয়মন বালক মোহম্মদকে সান্ত্বনা দিতে দিতে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। জন্মের পূর্ব্ব হইতে পিতৃহারা হইয়া রিক্তের বেশে যিনি প্রথম দুনিয়ার আলো দেখিয়াছিলেন, তিনি মাতৃহারা—সর্ব্বহারা হইয়া বৃদ্ধ পিতামহের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব তাঁহাকে স্নেহভরে বুকে টানিয়া লইলেন ; তাঁহার চোখের পাতা আজ আবার নূতন করিয়া ভিজিয়া উঠিল। আবুতালেব, হামজা প্রভৃতি সকলেই মাতাপিতৃহীন বালককে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। হোন মোহাম্মদ এতিম, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে পিতার স্নেহ, জননীর মায়া বিলাইয়া তাঁহার নিঃস্বতা ঘচাইবেন।

বালক মোহাম্মদ দাদার সহিত কা'বা মন্দিরে বেড়াইতে যান। সেখানে দাঁড়াইয়া শত শত দেব-দেবীর প্রতিমা। খৃষ্টানের মেরী-মূর্ত্তি, ইহুদী জোরোয়াস্ত্রীয়ের উপাস্য পুত্তলিকা—কিছুরই সেখানে অভাব নাই। সকল জাতি, সকল বংশ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে আসিয়া ভক্তিনত চিত্তে দেবতার উপাসনা করেন। হাজ্জারোল্ অস্ওয়াদ একখানা কালো পাথর। প্রাচীন কাল হইতে ইহার মহিমা ও পবিত্রতা কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই কাল পাথরও এখন মানুষের পূজা পাইতেছে। প্রধান প্রতিমা হোবলের স্থূলোদর মূর্ত্তি। সারাদিনরাত্রি পূজারীরা দলে দলে আসিয়া কা'বায় ভিড় জমায়; হোবলের সস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রণত হইয়া তাহারা ধন্য জ্ঞান করে। সমস্ত আরবে কা'বার অসীম সম্ভ্রম। পৌত্তলিক জাতি দেবতাদের সোণা-রূপা, মণি-মাণিক্য, আরো কত কি উপঢৌকন দিয়া যায়; কোরেশ-প্রধান আবদুল মুত্তালিব এ-সমস্তেরই রক্ষক। বৃদ্ধের অদ্ভুত মনোবল। মানুষের সম্ভ্রমে তিনি উচ্চ; কা'বার সেবায় তিনি মহান্। শিশু মোহাম্মদের জন্ম-সম্ভাবনা হইয়াছে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজা আব্রাহা কা'বার সম্মানে, কা'বার সেবক কোরেশের সম্ভ্রমে ঈর্ষান্বিত। তিনি কা'বা ধ্বংস করিবার জন্য বহু সৈন্য-সামন্ত, হস্তিবাহিনী সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা আবদুল মুত্তালিবের যত উট পাইল, সবই ধরিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ কা'বা-সেবক উটগুলির জন্য বড়ো ভাবনায় পড়িলেন। আব্রাহার কাছে গিয়া বলিলেন: আপনার সৈন্যেরা মিছামিছি আমার উট ধরিল কেন? আপনি এগুলি ছাড়িয়া দি'ন।

রাজা উত্তর দিলেন: আপনি দেখিতেছি উটের জন্যই মহাব্যস্ত; আপনার কা'বা রক্ষা করিবে কে?

আবদুল মুত্তালিব বলিলেন: উটের জন্যই আমার চিন্তা; কা'বা যাঁহার, তিনিই তাহার ভাবনা ভাবিবেন।

দেবতাদের উপরে এক অদৃশ্য মহাশক্তিতে আরবদের বিশ্বাস ছিল। আবদুল মুত্তালিব সেই শক্তির দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

আব্‌রাহা অরক্ষিত কা'বা ধ্বংস করিতে পারিলেন না। মহামারীর প্রাদুর্ভাবে তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর দেহ-মাংসের টুকরা পক্ষীর আহারে পরিণত হইল। মহাশক্তির এই অভিপ্রায় আরবদের চক্ষে দেবতাদের মর্য্যাদা আরো বাড়াইয়া তুলিল। জেহোভা অতি প্রাচীন কালে আরবদের এই মন্দির উপহার দিয়াছিলেন, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসমাইলের স্মৃতি ও সাধনা এই মন্দিরের সহিত জড়িত। ইব্রাহিমের পথ ছাড়িয়া তাঁহারা মলিনতার দিকে বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, পাপে তাঁহাদের আত্মা কলুষিত হইয়াছে, এক আল্লার উপাসনা প্রতিমাকে দিতে দিতে তাঁহাদের মানুষ-জীবন খর্ব্ব হইয়াছে; কিন্তু কা'বার প্রাচীন মহিমার আবেদন তাঁহাদের কাছে সম্পূর্ণ সজীব। তাই কা'বা আরবের ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্র; কা'বাকে ঘিরিয়া যে নগরী রচিত হইয়াছে সেই মক্কাই আরব-চিত্তের প্রধানতম আকর্ষণ-স্থল। এখানকার শ্রেষ্ঠ দেব-পূজারী পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে মোহাম্মদ কা'বায় যান। শত শত প্রতিমা দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যেন এক অজানা বিতৃষ্ণা জাগিয়া ওঠে, তিনি উদাস উন্মনা হইয়া যান। দেব-সেবার মাঝখানে বৃদ্ধ বালক-পৌত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক বিস্ময়ে বিলীন হন। সংঘর্ষপূত এক মহামহিম ভবিষ্যতের চিত্র মানবচিত্তের পুণ্য-জাগরণের ক্ষীণ ছায়া তাঁহার চক্ষে ঘনাইয়া আসে। পৌত্রকে আদরে স্নেহে বারবার অভিষিক্ত করিয়া তিনি গৃহে ফিরেন।

কিন্তু এভাবে তাঁহার বেশী দিন কাটিল না। জীবনের কর্ত্তব্য তাঁহার শেষ হইয়া আসিল, সন্ধ্যার কালো ছায়া তাঁহার দিনের আলো ঢাকিয়া ফেলিল। আট বৎসরের মাতাপিতৃহীন পৌত্রকে গৃহে রাখিয়া কোবেশ দূত

রূপে তাঁহাদের অভিনন্দন বহন করিয়া তিনি এক নবীন ভূপতির দরবারে উপস্থিত হইলেন। দুস্তর মরুভূমির মধ্যদিয়া দূর পথের ক্লেশ তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। তিনি প্রিয়তম মোহাম্মদকে ছাড়িয়া আত্মীয়স্বজনগণকে ছাড়িয়া মরণ-রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন। বিশ্বের সমস্ত মাতাপিতৃহীনের দুঃখ আপনার উদার বক্ষে ধারণ করিয়া সান্ত্বনার বারি সিঞ্চন করিতে যিনি আবির্ভূত হইলেন, জীবনের প্রথম প্রভাতে মাত্র আট বৎসর বয়সে তাঁহার স্নেহের আশ্রয় টুটিল, তিনি রিক্ত কাঙ্গালের বেশে দুনিয়ার দিকে অশ্রু-মলিন চোখে চাহিয়া রহিলেন।

আবদুল মুত্তালিবের অনেকগুলি সন্তান। আবদুল ওজ্জাই তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার নীচপ্রকৃতি, ক্রূর স্বভাব; ষড়যন্ত্র ও স্বার্থান্বেষণ তাঁহার চিত্তের প্রধানতম উপকরণ। নিঃসহায় মোহাম্মদ তাঁহার আশ্রয়ে গেলেন না। আবুতালিবের স্নেহভেজা মন; মমতায়, করুণায়, নীতিকুশলতায় মানুষের অন্তরে তাঁহার অবাধ অধিকার। সস্মিত বদন তাঁহার নির্ম্মল, অকুটিল চিত্তের পরিচয়। পিতামহের স্নেহ-বঞ্চিত বালক তাঁহারই কোলে স্থান পাইলেন। হামজার সুন্দর সুঠাম দেহ, বলিষ্ঠ বাহু, নির্ভীক চিত্ত। তাঁহার গভীর নীল নয়নে যেন অনাগত কালের ছায়াপাত হইয়াছে, তাঁহার পেলব কণ্ঠে নিঃসীম নিষ্ঠার সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। মোহাম্মদ হইলেন তাঁহার আদরের ধন নয়নপুত্তলি। আব্বাসের নির্লিপ্ত উদাসীন মন; যেন কোনো ভাবী ধাম্মিক, দার্শনিক পুরুষ তাঁহার মধ্যে জন্মলাভ করিতেছে। বালক মোহাম্মদের প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রীতি স্বতঃ-উৎসারিত।

আবুতালেব চরিত্রবলে পিতার সম্মানিত আসনে বসিয়াছেন। আবদুল ওজ্জা হিংসার আগুনে পুড়িয়া মরিতেছেন। আবুতালেবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কোরেশ বংশের আর আর প্রধান ব্যক্তিদের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছেন। বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া তাঁহাকে পণ্য লইয়া

যাইতে হয়। স্নেহানুগত মোহাম্মদ তাঁহার চিরসঙ্গী। বালকের বয়স যতোই বাড়িতেছে, তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় ততোই ফুটিয়া উঠিতেছে। অল্প বয়সেই তাঁহার কথাবার্ত্তা প্রবীণ লোকের মতো জ্ঞানগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আলাপ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন, বাণিজ্যের যতো কিছু খুটীনাটী সমস্তই তাঁহাকে বলিয়া দেন।

শিশুকালে যিনি রাখালরাজ সাজিয়াছিলেন কিশোর বয়সেই তিনি হইলেন আবুতালেবের বাণিজ্যসঙ্গী বণিক। আরবের বিভিন্ন বংশের লোকের চরিত্র তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন, পথহীন মরুভূমির সকল আঁক-বাঁক তিনি চিনিয়া লইলেন।

যৌবনের সাধনা

কৈশোরের শেষ, যৌবনের প্রথম উন্মেষ। জীবনের বিচিত্র রূপ মোহাম্মদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে শুরু করিল। পিতৃহীনের দুর্ভাগ্য নিয়া তিনি জগতের আলো দেখিয়াছেন; শৈশবেই মরণের নির্মম হস্ত জননীর স্নেহ-সোহাগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে; বাল্যের আশ্রয় পিতামহ তাঁহাকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য অজ্ঞাত রহস্যের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য নামিয়া বালক-মোহাম্মদকে যেন হাতুড়ির আঘাতে পিটিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। তিনি আজ কঠোরেমধুরে-মেশা জীবনকে সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আরবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অতি মনোহর রূপে তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারহীন মরুর বক্ষে যত্রতত্র তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন; সূর্য্যের অগ্নিবর্ষী কিরণ, সৃষ্টি-বিনাশী ঝড়ের রাত্রি—সবকিছুকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল সময়ে সবখানে তাঁহার গতি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। পথচিহ্নহীন ধূ ধূ বালুকারাশির এই দেশ, হিংস্র মানুষ ও পশুর এই বিচরণ-ভূমি; বাহুর বল ছাড়া অন্য কোনো আইন এখানে নাই; সাবধান সতর্ক দৃষ্টি ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় এখানে মিলে না। দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহসী মন, অশ্বারোহণে পটুতা, তরবারি-চালনায় দক্ষতা—এই সবই এ-রাজ্যে মানুষকে বিপদের মুখ হইতে বাঁচাইতে পারে। চারিদিককার এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে মোহাম্মদের জীবন ও মন লৌহের মতো দৃঢ়, কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভার মতো নির্ম্মল, বিকশিত পুষ্পের মতো মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার প্রথম জীবনের দুর্ভাগ্য তাঁহাকে প্রাচুর্য্য ও ভোগের কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার অস্থূল কিন্তু ক্ষিপ্র দেহ, শক্তিসবল বাহু। তাঁহার

দিকে চাহিলেই মনে হয় তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে এক অমিততেজা আত্মা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার ঋজু নাতিদীর্ঘ দেহ সুগোল মুখমণ্ডল তীক্ষ্ণ নয়নপাত ; যৌবনমনোহর গোলাপী গণ্ড হইতে স্বাস্থ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মাথার কৃষ্ণ কেশ তাঁহার নধর গৌরকান্তির অপূর্ব্ব শ্রী যেন দশগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার গভীর নীল চক্ষে এক অজ্ঞাত রহস্যের ছায়াপাত হইয়াছে।

আবুতালেব বণিকমাত্র নন ; পিতার সম্মানিত পদেরও তিনি অধিকারী। কা'বার সেবক ও রক্ষক হিসাবে মক্কা নগরীতে—বিশেষতঃ কোরেশ মহলে তাঁহার অসীম প্রভাব। যুবক মোহাম্মদ এই আবুতালেবেরই আশ্রিত লালিত সন্তান। শহরের সবখানেই তাঁহার গতিবিধি, সর্ব্বত্রই তিনি সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার সুঠাম দেহ-কান্তি, তাঁহার নির্ভীক নয়ন-যুগ, তাঁহার শান্ত শিষ্ট সুন্দর স্বভাব সহজেই মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে। আলাপ-আলোচনায় বাদ-প্রতিবাদে তাঁহার জোড়া মিলে না ; সত্যবাদিতায়, সরল ব্যবহারে তাঁহার সমান একজনকেও মক্কায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; ঋজুতায় আন্তরিকতায় হৃদ্যতায় তাঁহার তুলনা কাহারও চোখে পড়ে না। তাই মক্কাবাসীদের কাছে তিনি 'আল্-আমীন'—সকলেরই তিনি গভীর বিশ্বাসের পাত্র। তাই মক্কীয় সমাজে সাধুসজ্জন মোহাম্মদের অত্যন্ত উচ্চ আসন।

কিন্তু কোরেশ যুবকের এই অসাধারণ চরিত্র একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা যেন স্বভাবের অঙ্গ হইতে একটি সমুজ্জ্বল মণি ছিন্ন করিয়া দুঃখের দাবদাহনে জ্বালাইয়া সংসার-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার এই অপূর্ব্ব মনোহর প্রকৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। বাণিজ্য-সূত্রে তিনি চাচা আবুতালেবের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন ; মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কোরেশদের পক্ষে যুদ্ধে নামিয়াছেন। তাই যৌবনেই জীবনের অনেক লাভ-

-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন দেখিবার সুযোগ তাঁহার মিলিয়াছে, সংসারের প্রায় সকল দিকের সহিতই তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছে।

অনেক যুদ্ধে যুবক মোহাম্মদ যোগ দিয়াছেন, বহুবার বাণিজ্যযাত্রায় চাচা আবু তালেবের সঙ্গী হইয়াছেন। আপনার দেশ ও জাতির সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিবার সুযোগ তাঁহার মিলিয়াছে। মরুভূমির শঙ্কা-ভীতি, শোভা-সৌন্দর্য্য তিনি দেখিয়াছেন; যাযাবর বেদুইনদের কেস্‌সা-কাহিনী, প্রাচীন ইতিহাস তিনি শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন। সেকালের পরিচিত জগতের সংবাদ নানা পথ ধরিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহুদী খৃষ্টান মণি জোরোস্ত্রীয় সকল মতবাদের লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মোহাম্মদ শৈশবে বাল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই; যৌবনেও সে সুযোগ তাঁহার মিলিল না। কিন্তু বিশ্বের মুক্ত গ্রন্থ হইতে তিনি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; আপনার মাতৃভাষার পরিচ্ছন্ন রূপ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে। তিনি স্বদেশের, স্বজাতির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিতে শিখিয়াছেন।

কিন্তু আপনার চারিদিকে চাহিয়া তিনি কি দেখিলেন? আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব নাই। বিভিন্ন বংশের লোকেরা পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত। তুচ্ছতম কারণে তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়, পুরুষানুক্রমে তাহার জের চলিতে থাকে। কেবল কা'বার সন্নিধানে আরবেরা যুদ্ধ করেন না। কেননা এ মন্দির তাঁহাদের চক্ষে পরম পবিত্র। কা'বা তাঁহাদের 'হরম'। অন্য সবখানেই তাঁহাদের হিংস্র জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট। এদেশে কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপনের চেষ্টা যে হয় নাই এমন নয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় বেদুইন কোনো শাসন বারণ মানিতে চায় না; শান্তি ও শৃঙ্খলা তাহাদের অতি অপ্রিয়। মরু-বাহন উষ্ট্র এবং ছাগ দুম্বা প্রভৃতিই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। এই সব জন্তু চুরি করাই তাহাদের কাজ।

অন্যের পশুচারণ ক্ষেত্র গোপনে ব্যবহার করাই তাহাদের স্বভাব। আবার এই দুইটী কারণেই তাহাদের মধ্যে কলহবিবাদ বাধিয়া যায়, তারপর হয়তো সর্ব্বনাশা লড়াই শুরু হইয়া যায়। আরবেরা কবিতার বড় অনুরাগী। কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁহাদের হিংসার আগুন জ্বলিয়া ওঠে। আবার ছন্দ গাঁথার যশোগানে তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হন। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যচর্চ্চায় সর্ব্বদাই সুরুচির একান্ত অভাব। কুৎসিৎ বিষয়ের নির্লজ্জ বর্ণনাই তাহার বিশেষত্ব।

যেখানে মানুষের স্থায়ী বসতি ও কিঞ্চিৎ সমাজবদ্ধ জীবন সেখানে গোষ্ঠিপতির আদেশ সকলে মানিয়া চলেন, কিন্তু এখানেও কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। কেহ কোনো আদেশ অমান্য করিলে বংশের শাখা-প্রশাখার মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে; তা'ছাড়া গোষ্ঠিপতির শাসন-প্রতিষ্ঠার অন্য কোনো উপায় নাই। মোহাম্মদ বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ববংশ কোরেশ তাহাদের শাখাপ্রশাখা ও মিত্রবংশগুলি লইয়া দেশের পশ্চিম দিকে সমুন্নত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তারপর কেন্দ্রভাগের সংখ্যাহীন গোষ্ঠিগুলি। তাঁহারা কোনো শাসনের অধীন নন; কাহাকেও কর দেওয়া তাঁহাদের অভ্যাস নয়। দক্ষিণে পূর্ব্বে উত্তরে প্রাচীন এয়মনীয় রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ সানা, হিরা, গাসান। কার্য্যতঃ ইহারা পারস্য ও রোমের অধীন। কিন্তু এই সব রাজ্যের শাসনশক্তি দুর্ব্বল। তাহাদের যে অধীনতা, তাহারও কারণ এই দুর্ব্বলতা।

শহরবাসীদের জীবনও ক্ষুদ্র সীমায় বেষ্টিত। বংশের বাহিরে এখানেও কাহারও নজর পড়ে না। এক একটি নগরের উন্নতি ছাড়া কোনো বৃহত্তর কামনা তাহাদের মনকে অনুপ্রাণিত করে না। নগরের আশেপাশে বেদুইন দল। কাদামাটী ও পাথর দিয়া গড়া তাহাদের বাসগৃহ। ছাগ উট চরানো তাহাদের প্রধান কাজ। পথিকদলের নিরাপদতা নির্ভর করে তাহাদেরই

উপর। বেদুইনদের ওপাশে দুস্তর মরুভূমি। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সেখানকার আকাশ তপ্ত তাম্রের বর্ণ ধারণ করে। দিনে রাতে শান্তিস্বস্তির নামগন্ধ সেখানে নাই। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সেখানে জীবগণ মরু-মরীচিকার প্রবঞ্চনায় প্রাণ হারায়; সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে অনন্ত বালুকারাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষের দৃষ্টি ব্যর্থ ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এইরূপ রুদ্র কঠোর পরিবেষের মধ্যে আরবের বিশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধনহীন জীবনকে আরো কলুষিত অধঃপতিত করিয়াছে পৌত্তলিকতার প্রভাব। কা'বা হইতে এক-আল্লা আসনচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে শতশত দেব প্রতিমা মানুষের দুর্ব্বল চিত্তের পূজা পাইতেছে। ইহুদী খৃষ্টান সাবীয়ান সকলেই আপন ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া শয়তানের অনুসরণ করিতেছে।

যুবক মোহাম্মদ চারিদিকে চাহিয়া স্বদেশের কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবনের এইরূপ চরম দুরবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। অনাগত কালের জন্য নানা চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনে ভিড় জমাইতে লাগিল। এই বিপর্য্যস্ত বিচ্ছিন্ন আরবদের কি এক সূত্রে বাঁধা যায় না, কোনো বৃহৎ ও মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা যায় না? পৌত্তলিকতার পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া কা'বাকে কি আবার তাহার প্রাচীন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না? এই সব চিন্তার আভাস তাঁহার মনে আসিয়া উঁকি মারিতে থাকে, তিনি উদাস উন্মনা হইয়া যান।

তাঁহার বয়স এখন বিশ বৎসরের কম নয়। তাঁহার সুস্থ সবল সহন-শীল দেহ, নানা অভিজ্ঞতায় পুষ্ট সুদৃঢ় মন। সাধুতায় সত্যবাদিতায় তিনি মহান; মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনায় তিনি সুন্দর। কিন্তু বহু জনের মাঝখানেও তিনি একা—নিতান্ত একা। চাচা আবুতালেব ছাড়া তাঁহার সহায় বন্ধু পৃষ্ঠপোষক আর কেহ নাই। যাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার জীবনযাত্রা,

তাঁহাদের সহিত তাঁহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আরব সমাজে তিনি নূতন, তিনি অদ্ভুত।

ইতিমধ্যে যুবক মোহাম্মদের বেদনা-রঙীন চিত্তের এক অপূর্ব্ব প্রকাশ মিলিল। আরবদের নিয়ম: স্ববংশের লোকজনের স্বার্থ সকলকে দেখিতে হইবে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বিচারের অবসর সেখানে নাই। স্ববংশের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে নিঃস্বদরিদ্র, বৃদ্ধস্ত্রী সকলেরই উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাইতে হইবে। তাহাতে বংশে বংশে যুদ্ধ লাগিতে পারে, দেশের শান্তি নষ্ট হইতে পারে—এসব ভাবনা কাহারও নাই। এই সঙ্কীর্ণ বহির্ব্বিমুখ মনকে উদার করিবার জন্য এক নবীন সংঘের প্রতিষ্ঠা হইল। মোহাম্মদ হইলেন তাহার প্রাণ। সংঘের যাঁহারা সেবক, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন: দেশ হইতে অশান্তি দূর করিতে হইবে; দেশী বিদেশী সকল লোককেই অত্যাচারের অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; দীন-দুঃখী, এতিম-বিধবাদের সকল রকমে সাহায্য করিতে হইবে। মানুষের কল্যাণ-সাধনার বীজ মোহাম্মদ আরব সমাজে এই প্রথম বপন করিলেন। সংঘের যে প্রতিজ্ঞা তাহার নাম হইল: হল্‌ফুল ফজুল বা হিতসাধনার সঙ্কল্প। মোহাম্মদ হইলেন এই শুভসঙ্কল্প যুবকদলের নেতা। মক্কাবাসীরা উৎসুক দৃষ্টিতে এই সব নবব্রতী তরুণদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন।

মক্কার এক বিধবা মহিলা—তাঁহার নাম খদিজা। তাঁহার স্বামী প্রচুর ধনসম্পত্তি ও একটী চল্‌তি কারবার রাখিয়া অল্প দিন হইল মারা গিয়াছেন। এ কারবার চালাইতে হইলে দুস্তর মরু পার হইয়া দূর-দূরান্তরে শহর-বাজারে যাইতে হইবে। খদিজা কোন্ এমন ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পান, যিনি এই কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাঁহার উপর পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নির্ভর বিশ্বাসে তিনি মন বাঁধিয়া রাখিতে

পারেন। খদিজার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—পরম সাধু লোকহিতব্রতী 'আল্-আমীন' মোহাম্মদের প্রতি।

বিধবা মহিলাটীর আহ্বানে মোহাম্মদ আসিয়া দেখিলেন : খদিজার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি গিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য এখনো চমৎকার। তাঁহার অদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, কমনীয় মুখচ্ছবি দেখিলে মনে হয় না যে খদিজার যৌবন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সুকোমল হাত দু'খানি তাঁহার বংশ-গৌরবের পরিচয়। খদিজাও কোরেশ বংশের সন্তান; সে হিসাবে মোহাম্মদ—দূর সম্পর্কের হইলেও তাঁহার আত্মীয়। তিনি যুবকের শিষ্টতা ও সৌজন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

মোহাম্মদ—আল্-আমীন, পরম বিশ্বস্ত মোহাম্মদ খদিজার বাণিজ্য চালাইবার ভার লইয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। আবুতালেবের সঙ্গীরূপে দূর-দূরান্তরের শহর-বাজার ও বণিকদলের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে। সবখানেই সাধু সচ্চরিত্র সুচতুর বণিক বলিয়া তাঁহার সুনাম। খদিজার কর্ম্মসচিব হইয়া তিনি যেখানে গেলেন সেখানেই আগেকার সুনাম তাঁহার কাজে আসিল; প্রচুর লাভে তিনি খদিজার পণ্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন। মক্কা হইতে ফিরিবার পথে তিনি ইয়াস্রেব গেলেন। ইয়াস্রেব আরবের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর; মক্কার নীচেই ইহার স্থান। এখানে পঁচিশ হাজার লোকের অধিবাস। সুপ্রচুর বারি, ফলপ্রসূ খর্জ্জুর-উদ্যান এখানকার বাসিন্দাদের প্রকৃতি শান্তশীতল করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণে এয়মনের উর্ব্বর ভূমি হইতেই ইয়াস্রেবে বেশীর ভাগ লোক আসিয়া বসতি করিয়াছে।

ইয়াস্রেব ছাড়িয়া নজ্‌দ, নফুদ, হায়ফা, জেরুজালেম, দামশ্‌ক্—কত স্থানে মোহাম্মদ পণ্য বিক্রয় করিলেন; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রচুর লাভ হইল। তাঁহার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া গোপনে সংবাদ দিবার জন্য খদিজা আপনার

নবীন কর্ম্মসচিবের সহিত মায়সারা নামে এক ক্রীতদাসকে পাঠাইয়াছিলেন। যে-সব গোপন-বার্ত্তা তাঁহার কাছে পৌছিয়াছে, তাহাতে মোহাম্মদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ গভীরতর হইয়াছে। যুবক মোহাম্মদের মুখে যে অপূর্ব্ব দীপ্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব-ভার দিয়াছিলেন, তাহাই এখন যেন তাঁহার নিজের দৃষ্টিকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে। কি জানি কেন এই যুবকের কথা অকারণে তাঁহার মনে আসিয়া ভিড় জমাইতেছে। যখন মোহাম্মদ মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন, খদিজা দেখিলেন তাঁহার অন্তরে এক অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে, যুবকের বিচ্ছেদ বিরহের কাঁটা হইয়া তাঁহার বুকে ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে।

দরিদ্র মোহাম্মদের অন্তরে দম্পতি-জীবনের চিন্তা আজো প্রবল হয় নাই। যৌবনের জোয়ারে ভাব-প্রবাহ তাঁহার অন্তরে খেলিয়া যায় নাই, ইহা সত্য নয়। কিন্তু দুঃখ-বেদনার দুঃসহ দাহনের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন রচিত হইয়াছে; রুদ্র-কঠোর পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া সংসারের ক্ষুদ্রতা, মনুষ্যত্বের অপমান, আত্মার লাঞ্ছনা দেখিতে দেখিতে তাঁহার এক অদ্ভুত প্রকৃতি ও মন গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই নারী তাঁহার নিকট এখনো স্রষ্টার সুন্দর মনের এক মনোহর প্রকাশ মাত্র।

কিন্তু খদিজার মনের ছোঁয়া তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। মোহাম্মদ পঁচিশ বছরের যুবক, খদিজা চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া বিধবা। যুবক সে কথা ভাবিলেন না। মানুষের ব্যথা তাঁহার হৃদয়ের তারে বাজিয়া উঠিতেছে; মানুষের মলিন আত্মার দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে; বিচ্ছিন্ন মানুষকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবার জন্য তাঁহার চিত্তে আকুল আকুতি জাগিয়াছে। খদিজার চরিত্রও অনেকটা এই ছাঁচেই তৈরী। খদিজা বিধবা। খদিজারও প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে দুঃসহ বেদনার দুঃসহ দহনে, তাই মোহাম্মদ খদিজার অন্তরের অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করিলেন না।

সাধুসজ্জন যুবকের গুণপনায় মুগ্ধ নারী তাঁহার সহিত চিরজীবনের জন্য সোনার বাঁধনে বাঁধা পড়িলেন। মক্কার কা'বা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আবুতালেব বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। বিশটি উট খদিজার মহর্ নির্দ্দিষ্ট হইল। আবুতালেব তখনই সে-সব দিয়া দিলেন। আরবীয় উৎসব সমারোহের মধ্যে সমাগত অতিথিরা আনন্দ-রাত্রি যাপন করিলেন।

আলোর আগমন

যুবক মোহাম্মদের সহিত খদিজার বিবাহের পর পনরটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ নিদাঘের অগ্নি-শ্বাসে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরুর মাটী আরো কঠিন হইয়াছে; প্রচণ্ড শীতের তীক্ষ্ণ বাতাস সহিয়া সহিয়া আরবের শক্ত পাথর আরো দৃঢ় হইয়াছে; বারবার ঋতু-সমাগমে মরূদ্যানের সবুজ শোভা জাগিয়া জাগিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ যৌবনের কুহেলিকা পার হইয়া পিতৃত্বের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন; খদিজা স্বামীকে চার কন্যা ও দুই পুত্র উপহার দিয়া বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। —তাঁহাদের ছয়টী সন্তানের প্রথম—কাসেম। কাসেমের পিতা বলিয়া বিবি খদিজা স্বামীর নাম দিয়াছেন আবুল কাসেম। কাসেমের পর চার কন্যা—জয়নব, রোকেয়া, উম্মে-কুলসুম ও ফাতেমা। শেষ সন্তান একটী পুত্র; কিন্তু পুত্রটী বাঁচে নাই।

খদিজার সহিত বিবাহ মোহাম্মদকে দৈনন্দিন দুঃসহ দারিদ্রের ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিল, কিন্তু তাঁহার মনের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। বিবাহের পরও তিনি পূর্ব্বের সেই নির্ব্বিলাস নিরহঙ্কার সদাচারশীল সাধু সজ্জন ব্যক্তিটী রহিয়া গেলেন। স্ত্রীর অপরিমিত বিত্ত দিয়া দম্পতির বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ হইল না; দীনহীন দুর্গতের দুঃখমোচনে তাঁহাদের সম্মিলিত চিত্ত বিকশিত হইতে লাগিল। অনেক বিষাদ-কালো ঘরে তাঁহারা আনন্দের আলো পৌঁছাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে মোহাম্মদ ক্রমশঃ উদাস উন্মনা হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি আপনার জীবিকার্জ্জনের দায়িত্ব হইতে অনেকখানি মুক্ত হইয়া যেন

নির্জ্জনতার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। যেখানে মানুষের আনন্দকোলাহল, সেখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যেখানে সামাজিক সম্মিলনের সমারোহ সেখানে তাঁহার পদচিহ্ন পড়ে না; যেখানে বন্ধুত্বের বহুল বন্ধন, সেখানে তাঁহার গতিবিধি দেখা যায় না। সংখ্যাহীন মানুষের মধ্যে তিনি অত্যন্ত একা; শত শত সমবয়সীর মধ্যেও তিনি নিঃসঙ্গ বন্ধুবিহীন। তাঁহার বাক্‌কুশলতা যেন শিথিল ও মৃদু হইয়া আসিয়াছে; ভাষা তাঁহার নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। কেন মোহাম্মদের এরূপ হইল? নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে তিনি কিসের সন্ধানে ফেরেন? গিরিগুহার মধ্যে কি জন্য আত্মগোপন করেন? জীবনে কি তাঁহার বিড়ম্বিত হইয়াছে? আপনার অদৃষ্টে কি তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছেন? কি চিন্তায় তিনি বিভোর? তাঁহার দৃষ্টিতে কিসের এই তন্ময়তা? স্ত্রীপুত্র-পরিজনদের রাখিয়া কোথায়—কোন্ রহস্যের মাঝখানে তাঁহার গতিবিধি?—কেহই এ সব কথার উত্তর দিতে পারে না; মোহাম্মদের চিত্ত-বিপ্লবের সঙ্গে কাহারও আজো পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু কেহ না জানিলেও এক গভীর গম্ভীর শুদ্ধ পবিত্র অলোক-সামান্য ভাবপ্রবাহের মধ্যে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই ভাবের বন্যায় কি তিনি একদিন জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবেন?

মোহাম্মদের এই নিভৃত সাধনার সংবাদ কেহ জানেনা। কিন্তু সাধনায় সমাহিত হইলেও জগতের দিক হইতে তাঁহার নিজের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। কতো বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, কতো ছোটো বড়ো জাতির ভাগ্যে জয়-পরাজয় আসিয়া জমিতেছে, এ সবই দৃষ্টিমান মানুষের পরম কৌতূহলের বস্তু। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বের সে গৌরব আর নাই। যেদিন জাষ্টিনিয়ান একটী পতিতা নারীকে সিজারদের সিংহাসনের অংশ দান করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে ভীষণ রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রাচীন সাম্রাজ্য ভস্মসাৎ হইতেছে।

আলোর আগমন

নবীন সম্রাটগণের আজ্ঞা সৈনিকেরা হেলায় পায়ে দলিয়াছে, সম্রাট মরিস্‌ ও তাঁহার পুত্রেরা নিহত হইয়া সমুদ্র সমাধি লাভ করিয়াছেন, ফোকাস কিছুদিন ব্যভিচার ও অরাজকতার রাজ্য চালাইয়া জনসাধারণের বিদ্রূপ ও তিরস্কারের মধ্যে নগ্ন দশায় ঘাতকের অস্ত্রতলে প্রাণ দিয়াছেন। হেরাক্লিয়াস এখন সিংহাসনে সমাসীন। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগেও পুরাতন গৌরব-রবি আজ অস্তমিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার দিনান্তের প্রভা এখনো বিলীন হয় নাই।

পারস্যে দ্বিতীয় খসরু তাঁহার পিতামহের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। চারিদিকে তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি। দামস্কস ও জেরুজালেমের দ্বারে আসিয়া তাহারা হানা দিবার উপক্রম করিয়াছে। ভয় হইতেছে বুঝিবা তাহারা ইয়াস্রেব, মক্কা ও সানায় আসিয়া পড়ে। এদিকে আরবের অবস্থা ,যারপরনাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বংশে বংশে কলহ-বিবাদের অন্ত নাই। রক্তপাতে আরবদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। তাঁহাদের সাহস বীরত্ব ও পরাক্রম সমস্তই সঙ্কীর্ণ বংশগত, গোত্রগত চিন্তার পথ ধরিয়া দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে।

ধর্ম্মজগতে ইহুদী খৃষ্টান মনি জোরোস্ত্রীয় সমস্ত মতবাদেরই চরম অধঃপতন সূচিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মবাদী এবং একই ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধের ফলে ধরাতল রঞ্জিত হইতেছে। খৃষ্টানদের ভয়াবহ ধর্ম্মবিদ্বেষ ও সম্প্রদায়বিদ্বেষ দেখিয়া বিশ্বের আত্মা শিহরিয়া উঠিতেছে। শয়তান সাধুর বেশ পরিয়া মানুষের ধর্ম্মজীবনের নেতৃত্ব করিতেছে।

জগতের ধার্ম্মিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের যখন এই শোচনীয় দুর্গতি, তখনই মরু আরবের বুক চিরিয়া এমন এক পবিত্রাত্মা আবির্ভূত হইলেন যাঁহার পুণ্য-প্রভায় বিশ্বের পাপান্ধকার ঘুচিল, অরাজকতার অমানিশা

কাটিয়া গেল। হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় মোহাম্মদের নির্জ্জন সাধনায় সেই আত্মা লালিত হইতেছিল। তাঁহার প্রাণের কুঁড়ির ভিতরে যে গন্ধ অন্ধ হইয়া কাঁদিতেছিল, তাহার মুক্তি-কামনায় তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কস্তুরী মৃগের মতো আপনার অজানা সৌরভে অধীর হইয়া সত্যের সন্ধানে তিনি বারবার অন্তরোর্দ্ধ্ব প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

স্বামীর এই উদাস আকুল ভাব বিবি খদিজার চোখ এড়ায় নাই। তিনি উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। মোহাম্মদ কোথায় কোন্ দিকে চলিয়া যান ; তারপর চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব বিদ্যুতের আভাস লইয়া অনেক দিন গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসেন। খদিজার মনে কতো ভাবের উদয় হয়, কিন্তু তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। সাধু সজ্জন সত্যসন্ধ বিশ্বস্ত মোহাম্মদের খ্যাতি সর্ব্বত্র ; কিন্তু তাঁহার চিত্তবিপ্লবের নিগূঢ় সাধনার কথা কাহারও জানা নাই। তিনি আগের চেয়ে ঢের বেশী ধীর স্থির গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন ; বন্ধুবিহীন একাকী জীবন তাঁহার যেন আরো নিঃসঙ্গ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীপুত্রপরিজনের সহিত সময় কাটাইয়া তাঁহার শান্তি হয় না। কোথায় তাঁহার শান্তি, কিসের সন্ধানে তিনি ব্যস্ত, কোন্ মধুরিমার আশায় তিনি পাগল, তাহার খবর এখনো কেহ জানে না। তাই মোহাম্মদের জীবন যেন এক দুর্জ্জেয় রহস্যে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি মোহাম্মদের—আস্-সাদেক আল্-আমীন, সত্য ও বিশ্বস্ততার মূর্ত্ত প্রতীক মোহাম্মদের প্রতি মানুষের অচলা ভক্তি।

একদিন এক ব্যাপারে লোকসাধারণের এই অচলা ভক্তির পরিচয় অপ্রত্যাশিতরূপে ফুটিয়া উঠিল। কা'বা মন্দির নিম্নভূমিতে নির্ম্মিত ; এজন্য বর্ষার জলস্রোতে উহার প্রচুর ক্ষতি হইত। কোরেশদের ইচ্ছা এই পবিত্র মন্দিরের সংস্কার সাধন কবিয়া উহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা। ইহার উপর সম্প্রতি তাঁহারা যুদ্ধে জয় অর্জ্জন করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের

বুক আনন্দে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দকে সার্থক করিবার জন্য তাঁহারা কা'বার পুনর্নির্ম্মাণ শুরু করিলেন। বংশের সকল শাখার সহ-যোগিতায় নূতন করিয়া কা'বার রচনা আরম্ভ হইল। কাজ স্বচ্ছন্দে কিছুদূর আগাইল। তারপর আসিল কা'বার পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তর—হাজ্জারোল্ আস্ওয়াদ প্রতিষ্ঠার সময়। প্রাচীন প্রস্তরখানি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া শুধু পুণ্যের কাজ নয়, প্রচুর সম্মানেরও পরিচয়। তাই বংশের সকল গোত্রের লোকেরাই এই সম্মানের অধিকার দাবী করিতে লাগিলেন। প্রথমে মৃদু কলহ, তারপর ঘোর বিবাদ। ব্যাপার শেষে যুদ্ধে গিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল। সকল গোত্রের লোকেরাই শাণিত তরবারির সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল।

এমন সময় অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া এক বৃদ্ধ—আবু-উমাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে বিবাদে কাজ নাই, দেখা যা'ক কা'বা মন্দিরে কে সকলের আগে প্রবেশ করেন; তাঁহার মীমাংসাই সকলে মানিয়া লইবে। বৃদ্ধের কথায় কোরেশেরা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আল্-আমীন্ মোহাম্মদই প্রথমে আসিয়া দেখা দিলেন। কোরেশেরা আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। বলিলেন: এইতো আমাদের আল্-আমীন্, ইঁহার মীমাংসা আমরা স্বীকার করিব।

মোহাম্মদ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া একখানি চাদরে কালো পাথরখানি রাখিয়া প্রত্যেক গোত্রের এক একজন প্রতিনিধিকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে চাদরখানি ধরিয়া তুলিলেন, তখন মোহাম্মদ পাথরটীকে প্রাচীরের গায়ে বসাইয়া দিলেন।

এইরূপ সাময়িক সামাজিকতার মধ্যে মোহাম্মদের নিভৃত সাধনা ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতেছিল। হেরা পর্ব্বতগুহায় তাঁহার অনেক সময় কাটিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সত্যের আলোক তাঁহার চক্ষে জ্যোতির্ম্ময়

হইয়া উঠিল। যাহার আভাস নিশিদিন নিদ্রায় জাগরণে তাঁহার চোখে মুখে লাগিতেছিল আর তিনি চকিত চমকিত চিত্তে বিস্মিত দৃষ্টিতে আপনার চারিদিকে চাহিতেছিলেন, সেই সত্যের শুভ বাণী একদিন বিশ্বস্ত পবিত্র আত্মা—রহুল্ আমীন্ পাপতাপদগ্ধ ধরণীর সীমারেখার ওপার হইতে বহন করিয়া আনিলেন। সাধক মোহাম্মদ এক বিচিত্র শক্তির আকর্ষণে মানুষের ধূলিমলিন জীবনের ঊর্দ্ধে উন্নীত হইলেন। সত্য-বহনের আহ্বান বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয়বারে মোহাম্মদ যেন চেতনায় ফিরিয়া আসিলেন; শুনিলেন: পাঠ কর। কিন্তু সত্যের মন্ত্র, জীবনের মন্ত্র, জ্ঞানের মন্ত্র নিরক্ষর তিনি কিরূপে উচ্চারণ করিবেন? তিনি বলিলেন: আমি ত জানি না। কিন্তু সত্যই কি তিনি জানেন না? হয়তো তাঁহার সাধনার চরম পরিণতি কোথায় তাঁহার জানা ছিল না; সুদীর্ঘ ধ্যানের ভিতর দিয়া যে উদগ্র সত্য তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাকে তিনি জানিতেন না। কিন্তু তাহার প্রকাশের বেদনা আজ গভীরে গম্ভীরে দেখা দিয়াছে। মানুষের মুক্তির মহামন্ত্র আজ তাঁহাকে উচ্চারণ করিতেই হইবে। চক্ষের নিমিষে সত্য-বাহনের বিশাল বাহুবেষ্টনে মোহাম্মদ বাঁধা পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ চিরিয়া বাণী ফুটিল:

একরা বে-ইস্‌মে রব্বোকাল্লাজি খালাক্······

যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টির বিকাশ, তুচ্ছতম কীটাণু হইতে মানুষের জন্ম তাঁহারই নামে সত্য-মন্ত্র উচ্চারণ কর। মানুষের যাহা অজানা ছিল তাহাই তিনি মানুষকে জানাইলেন, লেখনী-নিঃসৃত জ্ঞানের আলোক দিয়া তাহার হৃদয় উজ্জ্বল করিলেন।

মোহাম্মদ সত্যের প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার নবজন্ম লাভ হইল। এক অজানা ভাব-উচ্ছ্বাসে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার

সমস্ত দেহ-আত্মা ব্যাপিয়া কম্পন জাগিল। স্পন্দিতবুকে তিনি সেই গভীর নিশীথে বাড়ী ফিরিলেন। বিবি খদিজাকে বলিলেন: শীঘ্র আমাকে বসনাবৃত কর। বিবি খদিজা শশব্যস্তে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। মোহাম্মদ বলিলেন: সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ঝঞ্ঝার মতো প্রবল, বজ্রের মতো গম্ভীর, বিদ্যুল্লেখার মতো সুন্দর—কি অপূর্ব্ব সে শক্তির বিকাশ, কি গভীর সে সত্যের প্রকাশ! খদিজা, ভাবিও না আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিম্বা জ্ঞান হারাইয়াছি। কিন্তু আমার ভারি ভয় হইয়াছে, আমার এ কি হইল!

খদিজা প্রীতিমধুর কণ্ঠে বলিলেন: ভাবিও না আবুল কাসেম, আল্লা কখনই তোমাকে উপহাস করিবেন না। তুমি সাধু সত্যবাদী সজ্জন সংক্রিয়াশীল, কিজন্য তোমার অমঙ্গল হইবে? না, না, তাহা কখনই হইবে না। হয়তো আল্লা তোমাকে কোনো মহৎ কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন! এ তাহারই পূর্ব্বাভাস মাত্র।

সেইদিনই খদিজা তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গেলেন। অন্ধ বৃদ্ধ অর্কা প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিবি খদিজা তাঁহারই কাছে স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অর্কা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন: কুদ্দুসুন্, কুদ্দুসুন্—শুভ এ সংবাদ, পবিত্র এ বাণী। মুসার কাছে যে নামুস্-উল্-আকবর যে মহিমান্বিত ভাববাণী নামিয়া আসিয়াছিল, ঈসার নিকটে স্বর্গের যে শুভ সন্দেশ আসিয়া পৌছিয়াছিল, এ-ও তাই। মোহাম্মদ তুমি নবী হইবে। যদি আজ আমি যুবাবস্থায় থাকিতাম! যখন তুমি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইবে, তখন যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতাম!

হজরত মোহাম্মদ স্ত্রীর সহিত বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার মনে আজ এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। আশা আকাঙ্ক্ষায় নিবিড় চিত্ত তাঁহার অনন্ত মহিমার তোরণ-দ্বারে আসিয়া পুলকিত চমকিত

হইতেছে। তিনি নিষ্পলক নেত্রে যেন অনাগত কালের বুকে আপনার ভবিষ্যৎ—নিখিল জগতের ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছেন। বিবি খদিজা তাঁহার হাত দু'খানি তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন: আবুল কাসেম, আমি কি বলি নাই তোমার কোনো অমঙ্গল হইবে না? আজ আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। আমি সমগ্র অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতেছি আল্লা এক, আর তুমি আল্লার প্রেরিত রসুল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্।

সত্যের পতাকা

অৰ্কা ও খদিজা হজরত মোহাম্মদের সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ইহার পর বেশীদিন গেল না, অৰ্কা পরলোকে চলিয়া গেলেন, খদিজা স্বামীর একক অবলম্বন হইয়া রহিলেন। কিন্তু বহুর বিশ্বাসে বলী না হইলেও হজরত আপনার সত্যে এক পরম আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন।—তিনি নবী, তিনি রসুল ; বিশ্বের ভাবরাজ্যের অন্তর ছানিয়া যে নিগূঢ় তত্ত্বের নির্দ্দেশ তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার তিনি প্রচারক ; দীর্ঘদিনের একান্ত সাধনায় যে সত্য তাঁহার চিত্তে বিকশিত হইয়াছে, তাহার তিনি পতাকাবাহক। কী সে সত্য, কী সে নামুসে-আক্‌বার—মহামহিমান্বিত প্রত্যাদেশ যাহার তেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া মোহাম্মদ আজ নবী হইলেন ? অতি সহজ সুন্দর সে সত্য যাহার ঋজুতা মানুষকে শিশুর মতো সরল, পুষ্পের মতো নির্ম্মল, ঊষার মতো স্নিগ্ধ, প্রস্তরের মতো দৃঢ়, গিরির মতো উচ্চশির করিয়া তোলে। হজরত শিখিলেন : আল্লা এক, অদ্বিতীয়। বিশ্বের তিনি স্রষ্টা। জগতের যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর, সব কিছুই তাঁহার ইচ্ছায় বিকশিত, বিবর্ত্তিত। তিনি নিরাকার, কিন্তু নিকট হইতেও নিকটতর। জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত; সকল বাসনা কামনার উর্দ্ধে তিনি অবস্থিত। অনন্ত শক্তির তিনি আধার, অসীম মহিমার তিনি আকর, অন্তহীন জ্ঞানের তিনি উৎস। তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহান, তিনিই মানুষের একমাত্র উপাস্য। তাঁহার সৃষ্টি মানুষের পূজা পাইবার যোগ্য নয় ; জড়-প্রতিমা কখনই মানুষের আরাধ্য নয়। পুণ্যে তাঁহার গভীর সন্তোষ, পাপে তাঁহার ঘোর অসন্তোষ। মানুষের মঙ্গল সকল পুণ্যের সার। দীনদুঃখী, নিঃসহায়, আর্ত্ত অত্যাচারিত মাতাপিতৃহীনের সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্রত। পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড হইতে

কাহারো পরিত্রাণ নাই। কিন্তু আল্লাহ মহান্; অনন্ত করুণার তিনি আধার। অনুতপ্ত পাপী মানুষ তাঁহার ক্ষমা অর্জ্জন করিতে পারিবে। এইরূপ আরো কতো সত্য হজরত পাইলেন। বিশ্ব-বিধাতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রার্থনা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল: পরম করুণাময় কৃপানিধান বিশ্বপতি আল্লারই সকল মহিমা, সমস্ত প্রশংসা। বিচারদিনের তিনি অধিপতি। প্রভু হে আমার, আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। সরল পথে আমাদের চালাইয়া লও—যে পথে তোমার সন্তোষ, ভ্রান্তির পথে, যাহারা তোমার অসন্তোষের পাত্র তাহাদের পথে নয়।

হজরত মোহাম্মদের এই সহজ সরল সত্যধর্ম্মের প্রকাশ আরবীয় সমাজে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাতে দেবদেবীর স্থান নাই; জড়পূজা, মূর্ত্তিপূজা, নরপূজার অবসর নাই। শত ত্রাসে শঙ্কিত, নানা কুসংস্কারে জর্জ্জরিত চিত্রের অভিভূতি ইহাকে মলিন করে নাই। সাধুতা, সদ্ব্যবহার, হিতসাধন, নরনারীর আত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নয়ন, নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার আরাধনার নিম্নেই এই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। ঐক্যবুদ্ধি ও শান্তিময় স্নিগ্ধশীতল কিন্তু কর্ত্তব্যকঠোর জীবন যাপন ইহার সকল শিক্ষার সার। প্রেম, ক্ষমা, তিতিক্ষা ও ভ্রাতৃজ্ঞান ইহার জীবনাদর্শ। মহামহিম আল্লা ছাড়া অন্য কোনো আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তির সম্মুখে এই ধর্ম্ম মানুষকে মাথা নোয়াইতে শিক্ষা দেয় না। নরনারীনির্ব্বিশেষে উন্নত-শির মানুষ রাজসমারোহে সুন্দরের পথ বাহিয়া চলিবে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টিকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া লইবে—ইহাই এই ধর্ম্মের অভিপ্রায়। এমন একটী ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য হজরত মোহাম্মদ লাভ করিলেন। আরবের দুর্নীতিপঙ্কিল ভেদজর্জ্জরিত হিংস্র ও পৌত্তলিকজীবনের খর্ব্বতার মাঝখানে এই সত্য বস্তুতই অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্র।

সত্যের পতাকা

হজরত মোহাম্মদ এক ভীষণ অনাত্মীয় পরিবেষের মধ্যে এই সত্যের পতাকা বহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। প্রত্যাদেশ আসিল : হে সংস্কারক, সত্যের পতাকা বহন করিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও, পরম প্রভুর মহিমা প্রচারে আত্মনিয়োগ কর। তোমার বসন যেন পবিত্র হয়, সকল কলুষ ও আবিলতা হইতে দূরে যেন তোমার গতি হয়। মানুষের মঙ্গলসাধন তোমার ব্রত, কিন্তু মঙ্গল করিয়া প্রত্যুপকারের আশা করিও না, বরং কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও প্রভুর নামে ধৈর্য্য ধারণ করিও।

মোহাম্মদের সম্মুখে এইবার কঠোর কর্ত্তব্য সমুপস্থিত। যে সত্য তিনি লাভ করিয়াছেন, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের কাছে তাহার প্রচার প্রয়োজন। এ কার্য্যে তাঁহাকে অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হইবে, নির্য্যাতন সহিতে হইবে। তথাপি আল্লার মহিমা কীর্ত্তন, সত্য ও শুদ্ধির পথে মানুষের মঙ্গলসাধন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। পর্ব্বতের মতো দৃঢ়, পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু, উষার মতো নির্ম্মল, পুষ্পের মতো কোমল হইবার জন্য প্রভুর আদেশ আসিয়াছে। কঠিন তাঁহার এ জীবন-ব্রত। কিন্তু এ ব্রত তাঁহাকে উদ্‌যাপন করিতেই হইবে।

হজরত মোহাম্মদ শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত মনে আপনার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিলেন। নীরবে তাঁহার প্রচার-কার্য্য চলিতে লাগিল। বিবি খদিজা পূর্ব্বেই তাঁহার সত্যে বিশ্বাসী হইয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যে আবুতালেবের বালক-পুত্র আলী হজরতের শান্তি ও কল্যাণময় সত্য—ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হারেসের পুত্র জায়দ ছিলেন বিবি খদিজার ক্রীতদাস। হজরত মোহাম্মদের সেবায় তিনি জায়দকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মানুষের মঙ্গল যাঁহার মাথার মণি তিনি জায়দকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করিয়া রাখেন নাই। স্ত্রীর সম্মতি লইয়া তিনি তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তথাপি জায়দ হজরতকে ছাড়িয়া যান নাই। প্রিয়তম পিতার আহ্বানও তাঁহার

তপ্ত চিত্তের কাছে ব্যর্থ হইয়াছিল। এই জায়দ প্রভু মোহাম্মদের সত্য মানিয়া লইলেন। বেলাল, আম্‌র, খালেদ-বেন-সা'দ—মেয়েদে মধ্যে আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল-ফজল্‌, আমিসের কন্যা আস্‌মা, ওমরের ভগ্নী ফাতেমা, আবুবকরের কন্যা আস্‌মা ইসলাম কবুল করিলেন।

আবুবকর হজরতের মাত্র দুই বছরের ছোটো। তাঁহারা শৈশবে, বাল্যে খেলার সাথী ছিলেন। তখন আবুবকরের নাম ছিল আবদুল্লা ইবনে আবুকোহাফা। বয়সে তাঁহার নাম হইয়াছে আবদুল কা'বা। কা'বার তিমি অন্যতম সেবক ; প্রতিমা-পূজার তিনি অন্যতম পুরোহিত। কিন্তু তাঁহার সাধুতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা অপরিসীম। তিনি ব্যবসায়ী ; তাঁহার ধনসম্পত্তি প্রচুর ; সমাজে তাঁহার প্রভূত সম্মান-প্রতিপত্তি। তিনি হজরত মোহাম্মদের সত্য গ্রহণ করিবেন ? যদি করিতেন, বড়ো ভালো হইত, ইসলামের শক্তি ও মর্য্যাদা লোকচক্ষে ঢের বাড়িয়া যাইত ! কিন্তু সে আশা কি সুদূর নয় ? হজরত মোহাম্মদের মনে এই জিজ্ঞাসা বার'বার দোল খাইতে লাগিল। আবদুল কা'বার চিত্ত কিন্তু সহজভাবেই তাঁহার বাল্য-বন্ধুর সত্যে আকৃষ্ট হইল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র মুসলিম দলের অন্তর্গত হইলেন।

ইহার পর বিবি খদিজা, জায়দ, আবদুল কা'বা হজরতের সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর নীরবে প্রচার চলিল। আফ্‌ফানের পুত্র ওস্‌মান, আউফের পুত্র আবদুর রহমান, আক্কাসের পুত্র সা'দ, জোবের, তাল্‌হা, আবু-ওবায়দা, মাজ্‌উনের পুত্র ওসমান, জায়দের পুত্র সইদ, মাস্‌উদের পুত্র আবদুল্লা, জাসিরের পুত্র আমির নবধর্ম্মে দীক্ষা লইলেন। ধীরে—অতিধীরে হজরত মোহাম্মদের শিষ্য-সংখ্যা চল্লিশে আসিয়া দাঁড়াইল। আল্লার রসুল মোহাম্মদ তাঁহাদের জাগ্রত চিত্তকে প্রেম ও পুণ্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করিলেন। যেখানে ছিল অপ্রত্যয় সেখানে বিশ্বাস দিলেন, যেখানে ছিল

দুর্বলতা সেখানে তিনি শক্তি দিলেন, যেখানে ছিল শিথিলতা সেখানে তিনি দৃঢ়তা আনয়ন করিলেন। নিজেকে তিনি অতিমানুষের স্তরে লইয়া গেলেন না; কোনোরূপ অলৌকিকতার দাবী তিনি উপস্থিত করিলেন না। অপর দশজন মানুষেরই মতো সুখ দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের ভাগী তিনি—একথা শিষ্যদের বার বার বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার সত্যের তেজ সহজভাবে নবদীক্ষিত মুসলিমের অন্তর স্পর্শ করিল। দেশব্যাপী পাপকলুষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহারা সুন্দর সমুন্নত সত্যের পতাকাকে অভিবাদন করিলেন; পতাকার যিনি বাহক তাঁহাকে শান্তিবাদ করিয়া তাঁহারা দৃঢ় পায়ে দাঁড়াইয়া গেলেন।

এইবার সত্যের পতাকা উড়িল। সত্যলাভের তিন বৎসর পরে হজরত মোহাম্মদ প্রকাশ্যত ইসলাম প্রচারের আদেশ পাইলেন। প্রত্যাদেশ আসিল হে মোহাম্মদ, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কলুষিত জীবন যাপনের অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দাও, এবং তোমাকে আমরা যে আদেশ করি, প্রকাশ্য জনসমাজে তাহা প্রচার কর, এবং আল্লাকে ভুলিয়া অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতার পঙ্কে যাহারা ডুবিয়া আছে তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না।

এই প্রত্যাদেশ লাভের পর হজরত মোহাম্মদ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে হাশেম্ বংশের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চাচা আবদুল ওজ্জা (আবু-লাহাব) হজরতের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নানা কথা বলিয়া হজরতের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিলেন।

কিন্তু এই সামান্য অকৃতকার্য্যতায় হজরত দমিলেন না। তিনি আবার এক ভোজসভার আয়োজন করিয়া স্ববংশের লোকজনদের নিমন্ত্রণ দিলেন। সেদিন আর তিনি আবদুল ওজ্জাকে কিছু বলিবার সুযোগ দিলেন না।

ভোজন সমাপ্ত হইলেই তিনি তাঁহার প্রভুর আদেশ সকলকে জানাইলেন। বলিলেন, আমি আপনাদের জন্য এক অপূর্ব্ব পার্থিব কল্যাণ—পারলৌকিক মঙ্গল বহন করিয়া আনিয়াছি। এই মঙ্গলের দিকে—শুভ জীবনের দিকে আহ্বান করিবার ভার আল্লা আমায় দিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে কে এই ভারবহনে, কর্ত্তব্যের এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে আমার সঙ্গী হইবেন?

ক্ষোভ-নীরব সভার এক প্রান্ত হইতে আলী বলিয়া উঠিলেন—আমি প্রস্তুত। আলীর উক্তি শুনিয়া সকলে বিদ্রূপের স্বরে আবুতালেবকে বলিল—দেখুন, আপনার পুত্রই এখন হইতে আপনার নেতা হইলেন!

কোরেশ-বংশীয়েরা হজরতকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্ষোভ নাই। সত্যের তিনি প্রচারক। আপনার লব্ধ সত্য মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। তিনি বিশ্বাস-বলীয়ান উদ্যম লইয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দেশের নিয়ম: কেহ কোনো বিপদের বার্ত্তা দেশবাসীকে জানাইতে চাহিলে অথবা কোনো অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি কোনো নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে জনসাধারণকে আহ্বান করিবেন। হজরত মোহাম্মদ একদিন এই নিয়মের সুযোগ লইলেন। আরবের এমন কি সমগ্র জগতের আত্মিক ও সামাজিক জীবন আজ বিপন্ন। পাপ ও আনাচার বন্ধুর বেশ ধরিয়া মানুষের মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে। এই বিপদের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। পুণ্যসাধনার লৌহসঙ্কল্প লইয়া সত্যের পতাকা বহন করিয়া তিনি জীবনপথে অগ্রসর। মানুষের মুমূর্ষু চিত্তকে জাগ্রত করিয়া সেই সত্যের অভিমুখী করিবার দায়িত্ব তাঁহার। তাই তিনি একদিন সাফা পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, চারিদিকে তাঁহার তীব্র মধুর কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল। কোরেশ-বংশীয়েরা দলে দলে সাফায় উপস্থিত হইল।

সত্যের পতাকা

তখন হজরত মোহাম্মদ বলিলেন : আজ যদি তোমাদের বলি—এই পর্ব্বতের পশ্চাতে অগণিত শত্রু-সৈন্য তোমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে, তোমরা কি তাহা বিশ্বাস করিবে ?

আবাল্য সত্যভাষী, পরম বিশ্বস্ত সাধু সজ্জন মোহাম্মদের এ কি উক্তি আজ ! কোরেশেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল : তোমাকে অবিশ্বাস করিব কেন ? মিথ্যা তো তোমাকে কোনোদিন স্পর্শ করে নাই ! তখন হজরত বলিলেন : যদি তাই হয়, তবে আমি তোমাদের বলি : তোমরা এক ভীষণ বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ। তোমরা পাপ ও অনাচারের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছ : এজন্য আল্লার ভীষণ দণ্ড তোমাদের শিরে নামিয়া আসিবে। এই বিপদ হইতে সতর্ক করিবার জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে আসিয়াছি। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তোমাদের একমাত্র মন্ত্র হোক ! নয়তো ইহকালের কল্যাণ, পরলোকের মঙ্গল হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে।

আবতুল ওজ্জা হজরতের এই আবেগময়ী বক্তৃতা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন : তুমি এই বলিতে আমাদের ডাকিয়াছিলে ? তুমি অধঃপাতে যাও।

কোরেশ-বংশীয়েরা আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহাদের বিপদ কোথায়, তাহারা বুঝিতে পারিল না। তাহারা এইমাত্র জানিল যে মোহাম্মদ প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। এইটুকু জানিয়াই তাহারা হজরতের সমালোচনা শুরু করিয়া দিল। তাঁহার অসাধারণ চরিত্র কোরেশ-দের মুগ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি যখন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ, আরবদের তুর্নীতির নিন্দা, কৌলিন্যের ভিত্তিহীনতা ঘোষণা করিলেন, তখন তাহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইল। শুধু বাঁকিয়া দাঁড়াইল নয়, সত্যের পতাকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবার জন্য তাহারা অস্ত্র তুলিয়া দাঁড়াইল। একদিন হজরত

কয়েকজন ভক্ত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া কা'বা মন্দিরে গেলেন; সমবেত পৌত্তলিকদের তৌহিদের প্রতি—অনাবিল একেশ্বরবাদের দিকে আহ্বান জানাইতে চাহিলেন। অমনি চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল। প্রতিমা পূজকেরা মারমুখী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। বিবি খদিজার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারেস তাহাদের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেলেন। যুবকের প্রতিবাদে পৌত্তলিকেরা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; উদ্যত তরবারির আঘাতে তখনই তাঁহার মস্তক ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

সত্যের পরীক্ষা

নব সত্যের প্রচার কোরেশদের অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিল। কোরেশ-প্রধানেরা সত্যের বাহন—হজরত মোহাম্মদের পথে তাহারা বহু বাধার কাঁটা ছড়াইতে লাগিল। কিন্তু হজরত কোনোদিকে না চাহিয়া আপনার কাজ করিয়া চলিলেন। কোরেশদের সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, চিরপোষিত সংস্কার ও স্বার্থের সিংহাসন দুলিয়া উঠিল। তাহারা ছিল বংশ-কৌলিন্যে প্রধান: কা'বার রক্ষক ও সেবক হিসাবে অতুল তাহাদের মর্য্যাদা। হজরত মোহাম্মদ প্রচার করিলেন—বংশে কেহ শ্রেষ্ঠ নয়, মানুষ মানুষের ভাই, মর্য্যাদায় তাহারা একে অন্যের সমান। শ্রেষ্ঠতা যদি কাহারও থাকে, সে পুণ্যশীলের, মহত্ত্ব যদি কাহারও হয় সে সাধুব্রতের। পিতৃপিতামহের আমল হইতে শত শত দেব-মূর্ত্তির পূজা কোরেশের ধর্ম্ম হইয়া আছে। তাহাদের চিন্তায় এই সব বিগ্রহেরাই শঙ্কার ত্রাণ, অভীষ্টের সিদ্ধিদাতা, কল্যাণের অধিপতি। হজরত ঘোষণা করিলেন—মিথ্যা এই সব দেবমূর্ত্তি. মাটীর পুতুল মাত্র তাহারা, মানুষের হাতের তৈরী জড়-বিগ্রহ তাহারা, পূজার যোগ্য তাহারা নয়, মঙ্গলের অধিকার তাহাদের নাই। নিরাকার আল্লাই একমাত্র উপাস্য: বিশ্বের তিনি স্রষ্টা, ধর্ম্মের তিনি উৎস, যাহা কিছু কল্যাণ, যাহা কিছু মঙ্গল—সমস্তের মূলাধার ও অধিপতি তিনি। তিনিই মানুষের সাধনার ধন, আরাধনার পাত্র। অখণ্ড আরব কা'বায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার ভক্ত; দেবশ্রেষ্ঠ হোবলের সিংহাসন ঘিরিয়া পৌত্তলিকতার যে-রাজ্য রচিত হইয়াছে, তাহার শৃঙ্খলে সকল চিত্ত তাহাদের সমর্পিত। এই প্রতিমা-পূজার রাজ্যে একমাত্র ধর্ম্মমন্দির কা'বা। কোরেশেরাই কা'বার সেবায়েত। দেবতার ভোগ-উপহারের যতো কিছু সঞ্চয়, সমস্তই

তাহাদের সম্পদ। তাহাদের সমৃদ্ধি, তাহাদের গৌরব—সব কিছুই দাঁড়াইয়া আছে আরবের পাপকণ্টকিত ধর্ম্মীয় ও সামাজিক জীবনের ভিত্তির উপর। সেই জীবনকে নবলব্ধ সত্যের তাপে ভস্মীভূত করিয়া দিতে চাহিলেন হজরত মোহাম্মদ। পাপজীবনের ভস্মের ভিতে তিনি পুণ্যের রাজ্য গড়িয়া তুলিবেন, নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার অনন্ত শক্তি ও মহিমার স্বীকৃতির উপর মানুষের মনকে নূতন করিয়া রচনা করিবেন—এই তাঁহার পণ। কোরেশেরা দেখিল, বুঝিল, ভাবিল। হজরত তাহাদের মর্য্যাদা ও স্বার্থের সিংহাসন ভাঙিয়া দিতে চান, তাহাদের ধূলামাটীর উপরে ডাকিয়া সকল মানুষের সহিত এক আসনে বসাইতে চান, তাহাদের স্বার্থসুন্দর দেবতার সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বহুদিন-ভোলা এক নূতনপ্রায় সত্যের অধিকার স্থাপন করিতে চান। কোরেশ যতোই হজরত মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা বুঝিতে চেষ্টা করিল, ততোই প্রথমে শঙ্কা, শঙ্কার পরে বিরক্তি, বিরক্তির পরে ক্রোধ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া তাহাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাহারা হজরতের প্রচার বন্ধ করিয়া দিবার মতলব আটিল। এমন কি সম্ভব হইলে তাহার সত্যাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল।

তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইল আবুতালেবকে দলে ভিড়ান। কোরেশ বংশের এক শাখা বনুহাশেম। হজরত মোহাম্মদ এই গোত্রের অন্তর্গত, আবুতালেব এই গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহাকে দলে না টানিয়া হজরতের কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করিলে গোত্রে গোত্রে বিবাদ বাধিতে পারে, বিবাদ শেষে যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। তখন আর আর বংশের লোকেরা সম্মিলিত হইয়া হাশেমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা অতি সামান্য। কেননা অনৈক্য ও বিদ্বেষ এক বংশের সহিত অন্য বংশের সম্পর্ককে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থায় আবুতালেবকে যদি

মোহাম্মদের বিরুদ্ধবাদী করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা হইতে পারে। এই ভাবিয়া আবদুল ওজ্জা, আবুসুফিয়ান, জালালুদ্দীন প্রভৃতি কোরেশ-প্রধানেরা আবুতালেবের গৃহে আসিলেন। হজরত মোহাম্মদের নবপ্রচারিত সত্য সম্বন্ধে তাঁহার কাছে নানারূপ অভিযোগ করিলেন, অনুযোগ করিলেন। আবুতালেব পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্মে আস্থাবান ; আচারে-অনুষ্ঠানে তিনি সমাজেরই অন্তর্ভূত। কিন্তু হজরতের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ। মাতাপিতৃহীন মোহাম্মদকে তিনি পুত্রজ্ঞানে লালন করিয়াছেন। সেই মোহাম্মদ আজ পৌঢ। কিন্তু তাহার স্নেহ-প্রীতি আজো তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। মোহাম্মদ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিতেছেন। ইহা হয়তো আবুতালেবের মনঃপূত নয়। কিন্তু সেজন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তিনি বিরূপ নন। মমতা, বাৎসল্য এবং সম্ভবত গোত্রানুরাগ তাঁহার ধর্ম্মমতকে ছাপিয়া উঠিয়াছে। তাই কোরেশ প্রধানদের অভিযোগ শুনিয়াও তিনি তাঁহাদের দলে ভিড়িলেন না, বরং নানা প্রবোধবাক্যে শান্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

এদিকে হজরত মোহাম্মদ পরমোৎসাহে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিলেন। নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনায় তাহার আহ্বান চারিদিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সংস্কার-অসহিষ্ণু কোরেশদের মন বার বার আহত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ আবুতালেবের সান্ত্বনাবাক্যে এবার আর তাহারা শান্ত হইবে না। হয় তিনি মোহাম্মদকে নিরস্ত অথবা দণ্ডিত করুন, নয়তো তাহারা নিজেরাই তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিবে। এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কোরেশ-প্রধানেরা আবার আবুতালেবের কাছে আসিলেন। বলিলেন : আপনার বয়স, মর্যাদা, প্রতিপত্তি—সব কিছুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিচার-ভার আপনাকেই অর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি এতোদিনেও কিছু করিলেন

না। এদিকে ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মোহাম্মদের দিকে পূর্ব্বে লোক-সাধারণ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিত, কিন্তু এখন তাঁহার কথা তাহারা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বোধ হয় মক্কায় একছত্র অধিপতি হইতে চান। নয়তো প্রাচীন সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজনা দেওয়ার তাঁহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যাহা হোক, আমরা তাঁহার এ অত্যাচার আর কিছু দিন সহ্য করিলে আমাদের সমাজের ধ্বংস, ধর্ম্মের অধঃপতন অনিবার্য্য। অতএব আমরা স্থির করিয়াছি: আপনি যদি অবিলম্বে তাহাকে নিরস্ত ও গুরুদণ্ডে দণ্ডিত না করেন, আমরা একযোগে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব, স্বজনপ্রীতি আত্মীয়ানুরাগ কিছুই আমাদের পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না।

আবুতালেবের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত। একদিকে মোহাম্মদের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ, অন্যদিকে স্ববংশের প্রতি তাঁহার চিরদিনের আনুগত্য। কোন্‌টীর আহ্বান তাঁহার কাছে ব্যর্থ হইবে? এই সংশয়মলিন মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের জন্য বিহ্বলতা আসিয়া আবুতালেবের চিত্ত অধিকার করিল। তিনি হজরতকে বলিলেন: বাবা, একটু বিবেচনা করিয়া চল, যে গুরুভার বহন করিবার শক্তি আমার নাই, তাহা আমার উপর চাপাইও না। হজরত ভাবিলেন: আবুতালেবের মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; তিনি সম্ভবতঃ আর তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন না। এ অবস্থায় নিঃসহায়তা উপলব্ধি করা হজরতের পক্ষে কঠিন নয়। চারিদিকে তাঁহার বিরুদ্ধতা। জীবনসঙ্গিনী খদিজা নারীমাত্র, আলী সবেমাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। আবুবকর সাধু সচ্চরিত্র ধনবান হইলেও গোত্রপতির মর্য্যাদা তাঁহার নয়। তিনি একাকী কি করিতে পারেন? কিন্তু আবুতালেব লোকান্তরিত আবদুল মোত্তালিবের আসনে সমাসীন; বাল্যকাল হইতে গভীর স্নেহে তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছেন। নির্ম্মম সংসারের

শত ঝঞ্ঝাবাত তিনি উন্নতশিরে সহিয়াছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের অঙ্গে তাহার এতোটুকু আঁচ লাগিতে দেন নাই। উদ্ধত রক্তচক্ষু শত্রুতার মাঝখানে সেই নিবিড় স্নেহের আবরণ আজ উন্মোচিত হইতেছে! রক্ত মাংসের মানুষ মোহাম্মদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। আপনার সত্যে পর্ব্বতের মতো দৃঢ়, সমুদ্রের মতো গভীর, আকাশের মতো মহান্ এক নির্ভয় প্রত্যয় ছাড়া তাঁহার আর কোনো সম্বল নাই। ইহাকেই পরম আশ্রয় ভাবিয়া হজরত পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। বলিলেন: চাচাজান, আমি যে সত্যের সেবক, তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি ইহারা আকাশের বুক হইতে চাঁদ সূর্য্য ছিঁড়িয়া আনিয়া আমার হাতে দেয়, তথাপি আমার পথ আমি ছাড়িব না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িব না। আল্লার যদি ইচ্ছা হয়, আমার সত্য জয়ী হইবে ; নয়তো ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিব।

হজরতের চিত্তের এই অপূর্ব্ব তেজোময় প্রকাশ আবুতালেবের স্নেহকোমল হৃদয় সহজেই স্পর্শ করিল। তিনি যেন আবার আত্মস্থ হইলেন। বলিলেন: মোহাম্মদ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, আমি কিছুতেই তোমাকে ত্যাগ করিব না। যতোদিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, তোমাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।

পিতৃব্যের এই আশ্বাস বাক্যে হজরতের বুকের বল আরো বাড়িয়া গেল। এদিকে কোরেশদল ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু এই হত্যার পরিণাম ভাবিয়া তাহারা বিচলিত হইল। মোহাম্মদকে হত্যা করিলে হয়তো তাঁহার সত্যকেও হত্যা করা হইবে, এই মনে করিয়া তাহারা উৎফুল্ল হইল, কিন্তু হাশেম ও মোতালেব গোত্র হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, সে যুদ্ধ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া হয়তো সমগ্র আরবকে গ্রাস করিবে, এ চিন্তা তাহাদের শঙ্কিত

করিয়া তুলিল। তাই কোরেশ প্রধানেরা চরম পন্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আর একবার আবু-তালেবের কাছে আসিলেন। বলিলেন: আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে এই সাধুস্বভাব, সদ্বংশজাত, সুদর্শন, সুকবি যুবকটী; নাম ইহার ওমারা-বিন্-ওলিদ; চরিত্র ইহার অতি কোমল; কর্ম্ম ইহার পরম সুন্দর, আচার ব্যবহার নম্র-মধুর। আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। মোহাম্মদকে আমরা হত্যা করিব। আমরা মানুষের বদলে মানুষ আপনাকে দিলাম। ইহাতে আপনার আপত্তির কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

আবুতালেব কোরেশদের এই দুঃসাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কতো বড় স্পর্দ্ধা ইহাদের! তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ইহারা হত্যা করিতে চায়! তিনি কোরেশদের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু আরবদের প্রকৃতি তাঁহার অজানা ছিল না। কোরেশদল হজরতকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সুযোগ পাইলেই তাহারা তাহাদের মতলব হাসিল্ করিবে। আবুতালেব পূর্ব্বাহ্নেই সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। তিনি হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের যুবকদের এক সভায় আহ্বান করিয়া বলিলেন: কোরেশ বংশের আর আর গোত্রেরা মোহাম্মদকে হত্যা করিবে স্থির করিয়াছে। আমি এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে চাই। তোমরা আমার সহায় হইবে কি না?

বৃদ্ধ গোত্রপতির এই আহ্বানে হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের পুরাতন শক্রতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সমকণ্ঠে আবুতালেবের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সন্ধ্যায় সংবাদ পাওয়া গেল: হজরতের কোনো খবর নাই। সংবাদ শুনিয়াই আবুতালেব ও হজরতের অন্যান্য চাচারা তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না। তখন আবুতালেব রোষে ক্ষোভে আত্মহারা

হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তিনি যুবকগণকে আহ্বান করিলেন। তাহাদের শাণিত তরবারি তৎক্ষণাৎ কোষমুক্ত হইল। ইতিমধ্যে হজরতের সংবাদ লইয়া তাঁহার এক সহচর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আবুতালেবের সন্দেহ ঘুচিল না। যুবকদের সঙ্গে লইয়া তিনি কোরেশ-সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রণ-সজ্জা কোরেশদের শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাহারা বিনা যুদ্ধে মোহাম্মদকে হত্যা করিতে পারিবে না, এ বড়ো কম ভাবনার কথা নয়।

তথাপি কোরেশেরা তাহাদের পথ ছাড়িল না। আপাততঃ মোহাম্মদকে হত্যা করা হইল না; কিন্তু তাঁহার ভক্ত অনুচরদের উপর অত্যাচার চালাইয়া তাঁহার সত্যের গতিরোধ করা অসম্ভব নয়। এই দিকেই তাহাদের সমস্ত মনোযোগ নিয়োজিত হইল। হজরতের শিষ্যদের মধ্যে দরিদ্র নিঃসম্বল যাহারা, তাহারাই সকলের আগে কোরেশদের কোপদৃষ্টিতে পড়িল। আম্মার তাঁহার মাতা সুমাইয়া ও পিতা ইয়াসির হজরতের সত্য—ইসলাম—গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরেশেরা আম্মারকে নির্ম্মম প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। ইহাতেও তিনি সত্য ত্যাগ করিলেন না; তখন অত্যাচারীরা পিতা ইয়াসিরের দুইখানি পায়ে রশি জড়াইয়া দুইটী উটের গায়ে বাঁধিল, তারপর উট দুইটীকে পরস্পরের বিপরীত দিকে চালাইয়া দিল। ইহাতেও সুমাইয়ার চিত্তের বল কমিল না; তিনি হজরতের সত্যে অটল হইয়া রহিলেন। তখন নরাধমেরা তাঁহার সতীত্বের অমর্য্যাদা করিল, তারপর তাঁহার দেহটীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। আবিসিনীয় ক্রীতদাস বেলাল দুঃসহ অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইতে লাগিলেন। গলায় দড়ি বাঁধিয়া মক্কার ছেলেরা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত, আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিত। শুধু এইটুকু নয়; বুকে পাথর চাপা দিয়া মরুভূমির অগ্নিময় বালুকার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখা হইত। কিন্তু

এই অবস্থায়ও বেলালের সকল অন্তর ভেদিয়া বাণী ফুটিত—আহাদ্, আহাদ্। একই আল্লা! একই আল্লা! এইভাবে খাব্বাব, ওসমান, জোবের, শোয়াএব, আফলাহ্, লাবিনা, জেন্নিরা প্রভৃতি আরো বহু ইসলামভক্ত নরনারীর উপর কোরেশদের ক্রোধ অত্যাচার রূপে নামিয়া আসিল। সে অত্যাচার ভীষণ, নির্ম্মম, লোমহর্ষণ। হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার নিকটতম সঙ্গীরাও পরিত্রাণ পাইলেন না। আবদুল ওজ্জা (আবু-লাহাব) ও জালালুদ্দীনই হইল এই নিষ্ঠুর আচরণের অগ্রনায়ক।

কোরেশদের মতলব ছিল: অমানুষিক নির্য্যাতন চালাইয়া তাহারা হজরতের সত্যকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন! অত্যাচারের অগ্নিপরীক্ষার মাঝখানে যে-সত্য আপন মহিমায় উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, যে-হৃদয় ভগ্ন না হইয়া এক পরম নির্ভরতায় দৃঢ় ও অটল হইয়া দাঁড়ায় তাহার দিকে—ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে—মানুষের মন সমবেদনায় সহানুভূতিতে আপনা হইতেই নুইয়া পড়ে। হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার অনুগামীদের উপর অকথ্য অত্যাচার হইতেছে, আর তাঁহারা নীরবে সমস্তই সহ্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অনেকগুলি চিত্ত সমবেদনায় দুলিয়া উঠিল। হামজা হজরতের পিতৃব্য; সাহসে বীরত্বে তাঁহার সিংহ-হৃদয় পর্ব্বতের মতো অটল। হজরতের অপমানে তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের ধনুক কাঁধে ফেলিয়া তিনি চলিলেন আবদুল ওজ্জার কাছে। সেই তো এই নির্যাতন, এই অপমানের মূল!

নবী মোহাম্মদ

হামজার হাতে আবছুল ওজ্জা মরিল না, সঙ্গীরা তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। কিন্তু হামজা ইসলাম গ্রহণ করিলেন; বলিলেন: তোমাদের দেবতার বেদী আমি চিরদিনের জন্য ছাড়িলাম; মোহাম্মদের সত্যই আজ হইতে আমার সত্য হইল।

হামজার দীক্ষা গ্রহণে মুষ্টিমেয় সত্য-ভক্তদের মনের বল আরও বাড়িয়া গেল। তাহার মতো অমিততেজা বীরকে হারাইয়া কোরেশ-দলের উৎসাহে ভাটা পড়িল। কিন্তু আবছুল ওজ্জা দমিবার পাত্র নয়। হামজা না-হয় গিয়াছে, কিন্তু ওমর? দেহের শক্তিতে তাঁহার জোড়া মিলে না; উগ্র-স্বভাবে তাঁহার মতো আর একজনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমনই ভীষণ তাহারই চেহারা যে অতি বড়ো সাহসীর বুকও তাঁহার দিকে চাহিলে কাঁপিয়া উঠে। এহেন ওমর থাকিতে কোরেশদের ভাবনা কি? এক হামজা গিয়াছেন, শত হামজা এখনো তাঁহাদের দলে বর্ত্তমান। তাঁহাদের সকলের উপরে আছেন ওমর—ভীমদর্শন দুর্দ্ধর্ষ ওমর। সমবেত কোরেশদের দৃষ্টি আশা-উদ্বেগে তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িল।

ছাব্বিশ বছরের যুবক ওমর। কোরেশেরা সমকণ্ঠে তাঁহার বীরত্বের অজস্র প্রশংসা জুড়িয়া দিল। যুবকের মন সহজেই তপ্ত হইয়া উঠিল। মোহাম্মদকে হত্যা করিবার গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। ওমর আর বিলম্ব করিলেন না। তখনই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন। কোরেশ-দের ক্ষুণ্ণ হৃদয় আশায় আনন্দে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হামজাই থাকুন, আর আলীই থাকুন, ওমরের হাত হইতে আজ আর মোহাম্মদের রক্ষা নাই।

শাণিত কোষমুক্ত কৃপাণ হাতে ওমর চলিয়াছেন। পথে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন : এ বেশে কোথায় চলিয়াছ ওমর ?

দেবদ্রোহী মোহাম্মদের মাথা কাটিতে।—ওমরের রোষকষায়িত চক্ষু দুইটী ঘুরিতে লাগিল।

বন্ধু বলিলেন : আমার কথা শুন, ওমর, মোহাম্মদকে হত্যা করিও না। তাহার ফল ভালো হইবে না। তুমি কি মনে কর মোহাম্মদকে খুন করিলে হাশেমবংশীয়েরা তোমাকে জীবন্ত ছাড়িয়া দিবে ? তার চেয়ে তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ মুসলিম হইয়া থাকিলে তাহাকেই বরং শায়েস্তা কর।

ওমরের কণ্ঠে কলহের স্বর ধ্বনিয়া উঠিল : আমার কোন্ আত্মীয় মোহাম্মদের দলে ভিড়িল ?

বন্ধু বলিলেন : তাও তুমি জান না ! তোমার বোন বহনাই দু'জনেই তো মুসলিম হইয়াছে।

ওমরের আর হজরতের কাছে যাওয়া হইল না। তিনি সোজা চলিলেন তাঁহার বোন ফাতেমার বাড়ীর দিকে। দরজায় দাঁড়াইয়া ওমর শুনিলেন খাব্বাব-ইব্‌নে-আরিত কোর্‌আনের একটী সুরা পড়িতেছে : জগতের সব কিছুর নিয়ামক মহান্ সেই আল্লা।...

ক্রোধে ওমরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সজোরে পদশব্দ করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই খাব্বাব পাশের এক ঘরে গিয়া লুকাইলেন ; যে-পাতা খানিতে কোরআনের অংশটুকু লেখা ছিল, ফাতেমা তাড়াতাড়ি তাহা হাঁটুর ভিতর নিয়া ঢাকিলেন।

রাগতপ্ত কণ্ঠে ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন : এখানে এ কী শুনিতেছি, ফাতেমা ?

শান্তস্বরে ফাতেমা বলিলেন : আপনি কি শুনিবেন, ভাই ?

ওমর আর বরদাস্ত করিতে পারিলেন না; তবে কি আমি কালা হইয়াছি? দাঁড়াও তোমাদের শায়েস্তা করিতেছি!

যে কথা সেই কাজ। ভগ্নীপতি সইদকে ধরিয়া তিনি বেদম প্রহার শুরু করিলেন। ফাতেমা স্বামীকে বাঁচাইতে গিয়া ভাইয়ের হাতে মার খাইলেন। তাঁহার অঙ্গের বসন রক্তে রঙ্গীন হইয়া উঠিল। কিন্তু নির্য্যাতিত হইয়াও স্বামীস্ত্রী ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। ফাতেমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন: হাঁ ভাই, আমরা মুসলিম,—আল্লা এক, অদ্বিতীয়, নিষ্প্রতিম, মোহাম্মদ তাহার বাণীর বাহন—এই আমাদের সত্য। এখন তোমার যা' খুশী করিতে পার।

ওমর অনেক পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, নারীর সহিত কোনো দিন তাঁহার বল পরীক্ষা হয় নাই। ভগিনীর কথায় তাঁহার রাগ অনেকখানি পড়িয়া গেল। বলিলেন: তোমরা কি পড়িতেছিলে, একবার দাওতো দেখি।

ফাতেমা ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ওমর বলিলেন: তোমাদের জিনিস আমি নষ্ট করিব না, একবারটী দেখিতে দাও।

ঘাতকের শান্ত স্বরের আশ্বাসে খাব্বাব বাহিরে আসিলেন। ওমর সুরা 'তা হা' পড়িতে লাগিলেন: ব্যথা-বেদনায় আর্ত্ত করিবার জন্য তোমাকে আমরা কোর্‌আন দিই নাই, মোহাম্মদ। যাঁহার ইচ্ছায় আকাশের অভ্যুত্থান, দুনিয়ার সৃষ্টি, ভয়ে ভক্তিতে সেই আল্লার অনুগত যে-জন, তাহাদেরই জন্য স্মারকলিপি এই কোর্‌আন্। অপিচ আমি—আমিই (সেই) আল্লা; আমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহ নাই। আমারই সেবায় আপনাকে নিযুক্ত কর—আমাকে স্মরণের জন্য উপাসনাকে (জীবনে) প্রতিষ্ঠিত কর। নিঃশঙ্ক হও, আমি তোমার সহায়। আমি শ্রোতা, আমি দ্রষ্টা।

কোর্‌আনের গভীর গম্ভীর বাণী ওমরের অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি মৃদু কণ্ঠে খাব্বাবকে বলিলেন: কোথায় তোমার নবী, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।

হজরত সাফায় অবস্থান করিতেছিলেন। ওমর ধীরগতিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত মুসলিমগণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেরই সন্দেহ: অস্ত্রসজ্জা লইয়া ওমর কেন এখানে আসিলেন? হজরতকে হত্যা করাই কি তাঁহার ইচ্ছা! হামজা, আবদুল কা'বা (আবুবকর), আলী সকলেই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হজরতের মুখে চোখে বিন্দুমাত্র শঙ্কা বা উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিল না। তিনি স্মিত হাস্যে ওমরকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন: তুমি আসিয়াছ ভালোই হইয়াছে, যতোক্ষণ ইচ্ছা এখানে নিরুদ্বেগে বিশ্রাম কর।

দুর্দ্ধর্ষ ওমরের কণ্ঠ অশ্রু-কোমল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন: আল্লার নবী, আমি ইসলাম কবুল করিতে আসিয়াছি,—লা-ইলাহা ইল্লাল্লা, মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লা।

মুসলিম দল আনন্দে 'আল্লাহো আকবর্' ধ্বনি তুলিলেন। হজরত ওমরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন: ওমর, আজ হইতে তুমি আমার ভাই।

হজরত মোহাম্মদের সত্যলাভের সময় হইতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। নবপ্রচারিত ইসলামের বয়স এই ছয় বৎসর। আবুতালেব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন, হজরতের রক্তপিপাসু শত্রুদের তিনি দূরে রাখিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের উপর কোরেশদের অত্যাচার দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। হজরতকেও অনেক অপমান লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে। আবদুল ওজ্জা (আবুলাহাব) ও তাহার স্ত্রী উম্ম্ জমিলের মনোযোগ নবীর দিকেই। তিনি যেখানে যান আবদুল ওজ্জা ছায়ার মতো তাঁহার অনুসরণ করে; চীৎকার

করিয়া বলে : দেবদ্রোহী মিথ্যাভাষী এই মোহাম্মদ, ইহার কথা কেহ শুনিও না। উম্ম্ জমিল কোরেশ-সর্দ্দার আবু-সুফিয়ানের কন্যা। স্বামীরই মতো তাহার মতি-গতি। সে হজরতের পথে কাঁটা ছড়াইয়া দেয়। হজরত হাসি-মুখে পথের কাঁটা সরাইয়া দেন। মানুষের পথ তাঁহারই পথ। তাঁহার পায়ে কাঁটা বিঁধিবে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আল্লার সৃষ্টি মানুষের অঙ্গ ইহার আঘাতে ছিন্ন হইবে, এতো সহিবার নয়।

অত্যাচার শুধু দেহের উপর নয়, নবপ্রচারিত সত্যের কণ্ঠরোধ করিবার ইচ্ছা চারদিকে উদগ্র হইয়া আছে। মুসলিমদল প্রকাশ্যত উপাসনা করিতে পারেন না, এমন কি কোর্‌আনের পাক কালাম সবখানে উচ্চারণ করিবারও তাঁহাদের অধিকার নাই। একদিন তাঁহারা কা'বা-গৃহে কোর্‌আন পাঠ করিলেন, অমনি কোরেশদল আসিয়া তাঁহাদের বেদম প্রহার করিতে লাগিল। মক্কার বহু শূরবীর ও সুধীসজ্জন ইসলাম গ্রহণ করিলেও কোরেশদের হিংস্রতা এইভাবে তাঁহাদের ঘিরিয়া রাখিল। দৈনন্দিন দেহের এই ভীষণ নির্য্যাতনই মানুষের সহনীয় নয়। ইহার উপর সত্যের প্রকাশ-বেদনা মুসলিমদলকে অহরহ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। হজরত মোহাম্মদ অনাত্মীয় পরিবেষের মধ্যে—মুহুর্ম্মুহু হত্যা-সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়াও আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিলেন না। শিষ্যগণ তাঁহার কাছে থাকিলে কঠিন সময়ে তাঁহার দেহের ও মনের ক্লেশ অনেকখানি ঘুচিতে পারে, এ ভাবনাও তাঁহাকে ক্ষীণদৃষ্টি করিল না। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন : দরিদ্র নিঃসহায় মুসলিমদলকে সত্যের সেবায় নিষ্কণ্টক করিতে হইলে তাঁহাদের স্বদেশ ত্যাগ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

অনেক আলোচনার পর সত্যসাধনার সেই পথই শ্রেয় বিবেচিত হইল। একদল মুসলিম বিদেশে চলিয়া গেলে মক্কায় ইসলামের শক্তি হ্রাস পাইবে। কিন্তু সত্যের রক্ষক স্বয়ং আল্লা। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাঁহার ধর্ম্মকে

এতো বিপদের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিবেন। হজরতের নিজের জীবন বিপন্ন হইবে। কিন্তু তাহারও রক্ষক আল্লা। সত্য যদি অমর হয়, তাহার বাহন যিনি, তাঁহাকেও আল্লা বাঁচাইয়া রাখিবেন। এই দুর্জ্জয় বিশ্বাসের বল হজরতের বুকে অসীম সাহস আনিয়া দিল। দীন দরিদ্র মুসলিমদলকে সহনাতীত অত্যাচারে অহরহ দলিত পিষ্ট মথিত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্তর অসীম ব্যথায় দুলিয়া উঠিতেছিল। সত্যকে মাথার মণি করিয়া মানুষের এতো দুঃখবরণ! হজরতের প্রাণ মানুষের বেদনায় অধীর হইয়া পড়িতেছিল। তাই তিনি আপনাকে—নবপ্রচারিত ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে আল্লার ইচ্ছায় সমর্পণ করিয়া একদল মুসলিমকে নেগাসের রাজ্য আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সত্যের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এই সকল মানুষ স্বদেশের—স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া পরদেশে চলিলেন। হজরতের কন্যা রোকেয়াও স্বামী ওসমানের সহিত তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন।

কিন্তু এখানেও শত্রু তাঁহাদের পিছু ছাড়িল না। নেগাস ন্যায়বান নরপতি। কাহারও ধর্ম্মসাধনায় হস্তক্ষেপ করা তাঁহার নীতি নয়। এখানে মুসলিমদল আপনাদের সত্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা কোরেশদের সহ্য হইল না। তাহারা কয়েকজন লোককে আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দিল। নাজ্জাসীর সাম্‌নে এক গুরু সমস্যা উপস্থিত হইল। কোরেশ-দূতেরা বলিল: পলাতক মুসলিমেরা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মে আঘাত করিতেছে, একটি ভয়ানক লোকের উপদেশ মানিয়া চলিতেছে। ইহাদের আমাদের হাতে ফিরাইয়া দিন।

নেগাস্ খৃষ্টান। পাদ্রীরা কোরেশদের পক্ষ সমর্থন করিয়া রাজাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। কিন্তু নেগাস্ ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি। তিনি মুসলিমদের বলিলেন: কি তোমাদের সত্য যাহার জন্য তোমরা স্বজন স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছ?

মুসলিমদের মধ্যে একজন সকলের হইয়া বলিলেন: মহারাজ, আমরা

নবী মোহাম্মদ

পাপের পঙ্কে ডুবিয়া ছিলাম ; এক আল্লার উপাসনা ছাড়িয়া আমরা মাটীর পুতুলকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতাম, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতাম, কন্যা হত্যা করিতাম, মানুষকে হিংসা করিয়া বংশানুক্রমে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতাম, ব্যভিচার জুয়া মদ্যপান প্রভৃতি নানা দুর্নীতিতে আমাদের জীবন কলুষিত ছিল। এই অধঃপতন হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য আল্লা আমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠাইলেন। তিনি আল্লার রসুল। সাধুতায়, পবিত্রতায়, বিশ্বস্ততায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম মোহাম্মদ —আবদুল্লার পুত্র, আবদুল মুত্তালেবের পৌত্র। তিনি আমাদের আল্লার পথে আহ্বান করিলেন ; পাপ-জীবন ত্যাগ করিয়া সৎ ও মহৎ হইতে বলিলেন ; কুৎসার গ্লানি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ, ব্যভিচারের কলঙ্ক ও পরস্বহরণের পাপ হইতে মুক্ত হইতে উপদেশ দিলেন। হিংসা-বিদ্বেষের বাহিরে—রক্তপিপাসু হিংস্রতার অতীতে মানুষকে তিনি মানুষের ভাই করিলেন। উপাসনা ও উপবাস তাঁহার ধর্ম্মের বিধান। মানুষের দুঃখে সহায়তা, দৈন্যে সহানুভূতি তাঁহার সত্যের সার। এমনই আমাদের নবী, এমনই আমাদের অধিনেতা। আমরা তাঁহার সত্যে বিশ্বাসী ; নিরাকার, নিষ্প্রতিম অদ্বিতীয় আল্লার আমরা সেবক। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি— আমাদের ধর্ম্ম অতি পবিত্র, সত্য অতি মহান্। এই সত্যের পথে চলিতে গিয়া আমরা স্বদেশবাসীর শত্রু হইয়াছি, তাহারা আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে। তাই জীবন ও সত্যরক্ষার জন্য আমরা মহারাজের শান্তিময় রাজ্যে আসিয়াছি।

নেগাস্ বলিলেন ঃ—তোমাদের রসুলের ভাববাণী কিছু সঙ্গে আনিয়াছ কি ?

মুস্লিম প্রতিনিধি কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি লিপিকা বাহির করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল কোর্আনের সুরা মরিয়ম্। প্রথমে উচ্চারিত হইল—বিস্মিল্লাহের্-রহমানির্-রাহীম।

নেগাস্ মধুর শব্দ-বিন্যাসে প্রীত হইয়া উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে। তারপর একটীর পর একটী আয়াত—স্বরা মরিয়মের এক একটী শ্লোক মধুকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। নেগাস্ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেনঃ চমৎকার! এ তো যীশুর শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। কোরেশ-দূতগণ, আমি এসব লোকদের আমার রাজ্য ছাড়িবার আদেশ দিতে পারি না। ইহারা কোনো অন্যায় কাজ করে নাই। তোমরা আমার দরবার হইতে চলিয়া যাও।

কোরেশ-দূতেরা ব্যর্থতা ও অবমাননা লইয়া স্বদেশে ফিরিল। নূতন করিয়া তাহাদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র মুসলিম দলের উপর তাহাদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিল। নিরুপায় হইয়া হজরতের আরো অনেক শিষ্য মক্কা ছাড়িয়া নিরাপদ আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিলেন।

ইহাতে হজরতের সঙ্গী-বল কমিয়া গেলো; কিন্তু তাঁহার সত্যে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহারই চোখের সামনে যাঁহারা নির্ম্মম অত্যাচারে নিপিষ্ট হইতেছিলেন, তাঁহাদের অন্ততঃ কতকগুলি লোক শান্তিতে থাকিতে পারিবেন, এই তাঁহার পরম সান্ত্বনা।

মাত্র কয়েকজন সঙ্গীর সহিত এই সান্ত্বনাকে সম্বল করিয়া হজরত মক্কায় রহিয়া গেলেন। এখন তাঁহাকে হত্যা করা কোরেশদের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আবু-তালেব এখনো বাঁচিয়া আছেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষক। হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প অনুদিন জাগ্রত রহিয়াছে; হজরতের তাহা দুর্ভেদ্য অঙ্গাবরণ। তাই কোরেশদের ক্রোধ এক নূতন পথ ধরিয়া চলিল। স্থির হইল: মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যদের সামাজিক শাসনে দণ্ডিত করিতে হইবে। তাঁহাদের সহিত কেনা-বেচা, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী, আলাপ-ব্যবহার সব-কিছু বন্ধ হইবে। যে

এই নিয়মের বাহিরে কাজ করিবে, সমাজপতিরা তাহার কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন।

শুধু হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে সামাজিক বর্জ্জন নীতি চালাইলে তাঁহারা বিপন্ন হইবেন না ; কেননা হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের লোকেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। এই জন্য কোরেশরা হজরতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুই গোত্রকেও বর্জ্জন করিল।

কোরেশ বংশের আর আর সমস্ত গোত্রের সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা দেখিয়া হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের লোকেরা আগাগোড়া সব-কিছু ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন : শহরের ভিতরে তাঁহাদের যতো বিপদ, বাহিরে ঠিক ততোখানি নয়। নগর-প্রান্তে বাহিরের গোপন সাহায্য সহজেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে, শত্রুসমাজের মধ্যে থাকিয়া কখনই তাহা সম্ভবপর নয়। এই ভাবিয়া আবুতালেব ও গোত্রের অন্যান্য সবাই হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া একটী গিরি-সঙ্কটে আশ্রয় লইলেন ; যাঁহার কাছে যতো কিছু আহার্য্য ছিল সবই উটের পিঠে বোঝাই হইয়া চলিয়া গেলো।

এদিকে কোরেশেরা তাহাদের সামাজিক বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা-লিপি কা'বা মন্দিরে ঝুলাইয়া দিল। সকলে জানিল : এ প্রতিজ্ঞা অটল, কা'বার দেবতারা ইহার সাক্ষী। বৎসরের মধ্যে একমাস আরব সমাজে অতি পবিত্র। এই মাসে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা সব-কিছু ভুলিয়া আরবেরা কা'বা মন্দিরে সমবেত হয়, নির্ম্মুক্ত মনে তীর্থক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যে যাহার আবাসে ফিরিয়া যায়। আরবের চিরদিনের রক্তপিপাসা এই তীর্থ-মাসে অতৃপ্ত থাকিবে, স্মরণাতীত কাল হইতে ইহাই দেশের বিধান। তাই হজরত মোহাম্মদকেও এই মাসে আপনার আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এ সময় তিনি কা'বা মন্দিরে আসিয়া

উপাসনা করিতে পারিবেন, চাই কি অন্য লোকদের কাছেও আপনার সত্যের আহ্বান পৌঁছাইতে পারিবেন। বৎসরের আর কোনো সময়ে তিনি, তাঁহার শিষ্যেরা কিম্বা তাঁহার ব্যথার সাথী হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের লোকেরা কাহারো সহিত মেলা-মেশা করিতে পারিবেন না।

হজরত মোহাম্মদ ছয় বৎসর হইল নবী হইয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের দাব-দাহন সহিয়া তিনি সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ফল অতি অল্পই ফলিয়াছে। কোরেশদের বিরুদ্ধতা, প্রাচীন সংস্কারের শক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা রচনা করিয়াছে। তাহার পর আসিল এই ভীষণ সামাজিক দণ্ড। একদিন নয় দুই দিন নয়—সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইয়া আসিল। কিন্তু কি অসীম ধৈর্য্য অন্তরীণ মানুষগুলির! দুঃখ-অনশন তাঁহারা হাসিমুখে বরণ করিলেন, কিন্তু হজরতকে রক্তলোলুপ শত্রুর হাতে তুলিয়া দিতে রাজী হইলেন না।

ব্যাপার দেখিয়া অত্যাচারী কোরেশেরা বিস্ময় মানিল। অস্ত্রের শক্তি ব্যর্থ হইতে পারে, এ আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। তাই সামাজিক বর্জ্জনের পথই তাহারা শ্রেয় ভাবিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তো হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয়েরা দমিলেন না! অনেক ভাবিয়া কোরেশ প্রধানেরা হজরতকে আর একবার প্রলোভন দিতে আসিল।

তীর্থ-মাস আসিয়াছে। হজরত একদিন কা'বায় বসিয়া আছেন। কোরেশ-সর্দ্দারেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া একজনকে—ওত্‌বা ইব্‌নে রাহিয়াকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিল। ওত্‌বা বলিল: মোহাম্মদ, তোমার বাপের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় ছিল। আবদুল্লার পুত্র তুমি কেন মিছামিছি দেশের শান্তি-সুখ নষ্ট করিতেছ। তার চেয়ে এক কাজ কর তোমার মনে কি আছে আমাদের খুলিয়া বলো, আমরা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ

করিব। যদি মণি-কাঞ্চনের তৃষ্ণা তোমার মনে জাগিয়া থাকে, তোমাকে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ ধনী করিব। মান-মর্য্যাদা যদি তোমার কাম্য হয়, তোমাকে আমরা নেতা মানিব। যদি রাজ্য-সুখে তোমার অভিলাষ হয়, অখণ্ড আরবের সিংহাসন তোমাকে দান করিব। যদি নারীর দেহ-সৌন্দর্য্যে তোমার মন মজিয়া থাকে, আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তোমার অঙ্কশায়িনী হইবে। তুমি শুধু দেবনিন্দা হইতে নিরস্ত হও, আরবের চিরাচরিত ধর্ম্মকে স্বীকার কর, আমরা তোমার জন্য সব-কিছু করিতে প্রস্তুত।

হজরত বলিলেন: ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, রাজ্য-সুখ, রমণীর রূপ—কিছুই আমি চাহি না। তোমাদের সাবধান-বাণী শুনাইতে আমি আসিয়াছি, আমি আল্লার নবী। তোমরা আমার সত্যকে স্বীকার কর, ইহ-পরকালে তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর যদি ইহাকে ফিরাইয়া দাও, বঞ্চনা কর, আল্লা তাহার বিচার করিবেন

এবারও প্রলোভন হজরতের সত্যে আহত হইয়া ফিরিয়া গেলো। এদিকে অন্তরীণ দলের দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কোরেশদের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইতে রসদ সংগ্রহের সুযোগ কমিয়া আসিল। এই দশায় দুই তিন বৎসর কাটিতে চলিল। অর্দ্ধাশন ছিল, অনশন শুরু হইল; জঠর জ্বালায় শিশু বৃদ্ধ নারী সবারই চোখে আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কচি কণ্ঠের ক্রন্দন, বৃদ্ধের অস্ফুট বিলাপ, নারীর ভাষাহীন হুতাশ মিলিত হইয়া আরবের উষ্ণ আকাশ বাতাস উষ্ণতর হইয়া উঠিল। কিন্তু কী অদ্ভুত ধৈর্য্য, ও মনোবল এই অন্তরীণ দলের। মোহাম্মদের সত্যে তাঁহারা বিশ্বাসী নন, কিন্তু তাঁহার সাধুতার আদর্শ, চরিত্রের মহত্ত্ব, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, রক্ত সম্পর্কের বন্ধনকে মৃত্যুজয়ী করিয়া তুলিল। তাঁহারা আসন্ন মৃত্যু-সম্ভাবনার সম্মুখেও বজ্রের মত কঠিন হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে কোরেশ দলে অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া

গেলো। হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয়দের দুর্দ্দশা দেখিয়া কয়েকটী মহৎ লোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। একটী মাত্র লোকের জন্য এতোগুলি নিরাপরাধ মানুষের উপর কথাতীত অত্যাচার—এ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। হেশাম, জোবের, আবুল বাখ্‌তারী, মোত্‌এম্‌ জাম্‌য়া, কায়েস ও জোহের বলিলেন: সামাজিক বর্জ্জনের এই যে অস্ত্র আমরা চালাইতেছি, এ অস্ত্র অন্যায়ের। ইহার আঘাতে মানুষ মরণের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর নয়, সকলে ক্ষান্ত হও। কা'বায় লম্বিত সামাজিক বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা-লিপি আমরা ছিঁড়িয়া ফেলিব।

আবু লাহাব এই মানুষ কয়টীর সাধু প্রস্তাবে জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলিল: তাহা কখনই হইবে না। প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ করে সে বিশ্বাসঘাতক! তোমরা আত্মদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু আবু লাহাবের কথায় কোনো কাজ হইল না। মানুষের মন পরের দুঃখ বেদনায় একবার ফুলিয়া উঠিলে, তাহার গতিরোধ সহজ কাজ নয়। হেশাম জোবের প্রভৃতি কয়েকজন কা'বা হইতে প্রতিজ্ঞা-লিপিখানি আনিতে গেলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের করিবার বিশেষ কিছুই নাই, অঙ্গীকার-পত্রের প্রায় সবটুকুই কীটের উদরস্থ হইয়াছে।

সত্যের নব-আবাস

নবীর সত্যলাভের দশম বৎসর। মেহার্‌রম মাস। হজরত স্বজনগণের সহিত গিরিসঙ্কট ছাড়িয়া মক্কায় ফিরিয়াছেন। কোরেশরা তাহাদের সামাজিক বর্জ্জন এতোদিন পরে ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে দিন কাটাইতেছে। মক্কার আকাশে বাতাসে যেন একটা শান্তির আবছায়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই আবছায়ার অন্তরালে কোরেশদের মনে অশান্তির ঝড় বহিতেছিল। বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না বলিয়াই তাহা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। একটা মাত্র লোক, হোন তিনি পরম সাধু, হোন তিনি পরম চরিত্রবান্, হোন তিনি পরম বিশ্বাসভাজন, তথাপি একটা মাত্র লোক, মোহাম্মদ, আরবের সমাজে ধর্ম্মে বিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহিলেন; অমনি সঙ্গে সঙ্গে একদল—যতোই ক্ষুদ্র দল হোক—তথাপি একদল লোক তাঁহার আনীত সত্য গ্রহণ করিলেন; কোরেশের অত্যাচার নির্য্যাতন সহিয়া তাঁহারা দেশ ছাড়িলেন, স্বজনের মায়া ছাড়িলেন, কিন্তু সত্যকে ধরিয়া রহিলেন: শুধু তাই নয়, যাহারা তাঁহার সত্য গ্রহণ করিল না, তাঁহাকে নবী মানিল না, তাহারাও—এই হাশেম ও মোত্তালেব বংশের লোকেরাও হজরতের জন্য এক দিন নয়, দু' দিন নয়—পুরা তিন তিনটা বৎসর দুঃসহ জঠরজ্বালা—শিশুর ক্রন্দন, বৃদ্ধের বিলাপ, যুবজনের হাহাকার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতায় সম্বরণ করিয়া তাঁহার ব্যথার ব্যথী হইয়া রহিলেন! কোরেশের সম্মিলিত শক্তি একা প্রাণী মোহাম্মদকে শঙ্কিত করিল না, নির্য্যাতন তাঁহার সত্যের শক্তি হরণ করিতে পারিল না! তাঁহাকে হত্যা করিবার দুর্ম্মদ পণ বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল! ক্ষোভে অপমানে

কোরেশদল একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাঁহারা আজ নিস্তব্ধ নীরব। কিন্তু এই নীরবতার নীড়ে জন্মলাভ করিতেছিল এক ভীম ভয়াল প্রভঞ্জন, যাহার নির্ম্মম প্রহারে সত্যের বাসা ভাঙিল, শিশু ইসলামকে লালন করিবার জন্য সত্য-বাহন হজরতকে নব আবাসের সন্ধান করিতে হইল।

গিরিসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া হজরত মোহাম্মদ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আপনার ব্যথা-বেদনায় কোনোদিন তাঁহার হৃদয় নুইয়া পড়ে নাই; কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও ভক্ত-শিষ্যদের দুঃখ-লাঞ্ছনা তাঁহার মর্ম্মে কাঁটা হইয়া বিঁধিতেছিল। তাই যেদিন বনু-হাশেম ও বনু-মোত্তালেব্‌দের সঙ্গে করিয়া তিনি মক্কায় ফিরিলেন, তাঁহার চিত্ত এক অপূর্ব্ব সান্ত্বনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সত্যের জন্য বেদনার মুকুট পরিয়া তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। ব্যথার কণ্টক-সিংহাসনে তিনি ছিলেন রাজা। শান্তির সান্ত্বনায় দেহ মন এলাইয়া দিবার দিন তাঁহার জীবনে ছিল না। সামাজিক শাসনের উত্তোলিত দণ্ড নামিয়া যাইবার কয়েকমাস পরেই এক দুঃসহ বিয়োগ-ব্যথা তাঁহার চিত্তে চিতার আগুন জ্বালিয়া দিল। সত্যের প্রথম আশ্রয় বিবি খদিজা প্রিয়তম স্বামী ও সহচরদের ফেলিয়া মরণের পরপারে চলিয়া গেলেন।

বিবি খদিজা হজরতের কি ছিলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। উষ্ট্রচালক মোহাম্মদের তিনি ছিলেন প্রতিপালক, বণিক মোহাম্মদের তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক, স্বামী মোহাম্মদের তিনি ছিলেন পরম পতিব্রতা পত্নী, পিতা মোহাম্মদের সন্তানদের তিনি ছিলেন স্নেহরূপিণী জননী। কিন্তু এর চেয়ে আরো বেশী কিছু তিনি ছিলেন হজরত মোহাম্মদের। সত্যের নূতন প্রকাশে যখন সাধক মোহাম্মদ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, যখন তাঁহার দেহমন ব্যাপিয়া এক অপূর্ব্ব কম্পন জাগিয়াছিল, তখন বিবি খদিজাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তারপর যখন সন্দেহ অবিশ্বাসে অখণ্ড আরব চিত্ত

তুলিয়া উঠিয়াছিল তখন বিবি খদিজাই অন্তরের অনন্ত প্রেম দিয়া, সুগভীর প্রত্যয় দিয়া তাঁহাকে সকলের আগে স্বীকার করিয়াছিলেন। আর শুধু কি তাই? নবীর সত্যলাভের পর এই দশটি বৎসর কোরেশের অত্যাচার নির্য্যাতনে তাঁহার কোমল অঙ্গ—তার চেয়ে বেশী তাঁহার কুসুমসুন্দর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; বিবি খদিজা তাঁহাকে পরম স্নেহ-যত্নে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছেন। এক কথায় যিনি ছিলেন নবীর সুখ-দুঃখে সমভাগিনী সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহমর্ম্মিণী, তিনি আজ মৃত্যু-রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন। পিছনে পড়িয়া রহিল তাঁহার ম্লানমধুর দুর্ব্বিষহ স্মৃতি। সেই স্মৃতি মানুষ-নবীর অন্তরে আগুন জ্বালিয়া দিল।

কিন্তু অদৃষ্টের আরো পরিহাস হজরতের জন্য সঞ্চিত ছিল। বিবি খদিজার সন্তানগুলিকে আগুলিয়া তিনি আকাশের অভিন্ন রহস্যের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিল বৃদ্ধ আবুতালেবের মৃত্যু-কাতর কণ্ঠস্বর। তিনি চমকিয়া চাচার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন: তাঁহার চোখেমুখে প্রেম-সহানুভূতির এক অপূর্ব্ব আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আর্ত্তকণ্ঠে নবী ডাকিলেন: চাচাজান, আমার সত্যে আপনি বিশ্বাস করুন, আল্লার মনোনীত ইসলাম কবুল করুন, পরকালে আপনার মঙ্গল হইবে। মুমূর্ষু গোত্রপতির মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার পরম স্নেহবিশ্বাসের পাত্র, সাধুসজ্জন মোহাম্মদ মৃত্যুর আগে তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছেন! তিনি কি উত্তর দিবেন! আবুলাহাব (আবুজেহেল) ভাইয়ের পাশে বসিয়াছিল। সে বার বার আবুতালেবকে বলিতে লাগিল: আপনি মোহাম্মদের কথা শুনিবেন না, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িয়া মৃত্যুকালে কলঙ্ক গ্রহণ করিবেন না।

আবুতালেব আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি মলিন হইয়া গেল, মুখে মরণের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। তারপর একটী

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বাতি নিবিয়া গেল। হজরতের মাথার উপরে রহিল আল্লা, বুকের মধ্যে রহিল সত্য, চোখের পাতায় রহিল নিঃসহায় অশ্রুজল, আর তাঁহার চারিপাশে রহিল রক্তলোলুপ শত্রুর উদ্যত অস্ত্র। এখন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে?—এই সহজ জিজ্ঞাসা হজরতকে বিচলিত করিল না। আপনার সত্যে লৌহকঠিন হইয়া তিনি ঊর্দ্ধাকাশে তাকাইলেন, নিঃসীম নীলিমার মাঝখানে জয়ের ইঙ্গিত পাঠ করিয়া তিনি নির্ভয়ে জগতের সম্মুখীন হইলেন।

আবুতালেব মারা গিয়াছেন, কোরেশদের পক্ষে খুশীর খবর। এইবার তাহারা নির্ব্বিঘ্নে মোহাম্মদের উপর নির্য্যাতনের অস্ত্র চালাইতে পারিবে। আবুলাহাব দিনরাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের মনে নূতন উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে লাগিল; সামাজিক বর্জ্জন বিফল হইবার পর কোরেশদের মধ্যে যে অবসাদ দেখা দিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল; নূতন করিয়া অত্যাচার শুরু হইল। তাহারা হজরতের গৃহে—চলার পথে কাঁটা ছড়াইয়া দিতে লাগিল; উপাসনার জন্য কা'বায় গেলে উটের নাড়ীভুঁড়ি, সদ্যপ্রসূত ছাগীর ফুল আনিয়া তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিল; পথে চলিবার সময় ধূলি-মাটী ও আবর্জ্জনা তাঁহার মাথায় ঢালিল; এমন কি একদিন ওক্‌বা গায়ের চাদর হজরতের গলায় দিয়া তাহাতে অনবরত পাক দিতে লাগিল। নবীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইল, মুখে চোখে মৃত্যুর নীলিমা ছড়াইয়া পড়িল। দৈবক্রমে আবদুল কা'বা (আবুবকর) সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ওক্‌বাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন, বলিলেন: কি সর্ব্বনাশ! এই মানুষটাকে কি তোমরা খুন করিয়া ফেলিবে? কী ইহার অপরাধ! আল্লা আমার মালিক—এই তো ইহার বাণী!

হজরত দিনের পর দিন এইরূপ নৃশংস নির্য্যাতন সহিতে লাগিলেন। একদিন পিতার অপমানে ফাতিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। হজরত মাতৃহারা

কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : কাঁদিও না মা, ভয়ের কোনো কারণ নাই, স্বয়ং আল্লা-ই তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। আল্লার অনন্ত করুণায় এই পরম নির্ভরতায় হজরত অটল রহিলেন ; সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান, মক্কার দুষ্ট লোকেরা অতি নীচ ভাষায় গালি দিতে দিতে তাঁহার পিছু লয়, কেহবা ঢিল ছুঁড়িয়া মারে। তথাপি তিনি নির্ব্বাক নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো গভীর ; আকাশচুম্বী পর্ব্বতের মতো ধীর স্থির অচঞ্চল। হজরতের এই দৃঢ়তা কোরেশদের অসহ্য হইয়া উঠিল। হত্যায় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের আশঙ্কা। তাই আপাতত সেই চরম পথ ছাড়িয়া তাহারা মৃদুতর পন্থা অবলম্বন করিল ; সকলে মিলিয়া হজরতকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিল।

হজরতের এই বিপদে তাঁহার সঙ্গী হইলেন বিবি খদিজার মুক্ত ক্রীতদাস জায়েদ। জায়েদকে লইয়া নবী চলিলেন—মক্কার ষাট মাইল পূর্ব্বে—খানিক উত্তরে তায়েফ, এই তায়েফই তাঁহার লক্ষ্য ; মরু আরবের বক্ষে তায়েক ফলশস্তে পরিপূর্ণ দেশ। মক্কাবাসীদের চোখে এদেশ অতি মনোরম, যেন স্বর্গের এক টুকরা নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকে স্থান লইয়াছে। সাকিফ ও হাতয়াজেন—এখানকার দুইটী বিখ্যাত বংশ। ইহাদের সহিত কোরেশদের সম্পর্ক ছিল—বিবাহ-শাদীর, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের। তায়েফ বাসীর চোখেও কা'বা ছিল পবিত্র ধর্ম্মমন্দির, আরবের পৌত্তলিকতা ছিল সত্যপুণ্যে জড়িত সনাতন ধর্ম্ম। মক্কার অনাত্মীয় আবহাওয়ায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া হজরত নবী এইখানে চলিলেন।

সাকিফগণের সর্দ্দার তিন ভাই। হজরত তাহাদের কাছে গিয়া সত্যের আহ্বান জানাইলেন। বলিলেন : আমি আল্লার রসুল, মানুষের মঙ্গল আমি বহিয়া আনিয়াছি। এই মঙ্গলের পথ তোমরা গ্রহণ কর। হজরতের কথা শুনিয়া দুই ভাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তৃতীয় জন চাতুরী

করিয়া বলিল : তুমি যদি নবী হও, তোমার সহিত আলাপ করা আমাদের পক্ষে বেআদবী, আর যদি ভণ্ড প্রতারক হও, কে তোমার আহ্বানে সাড়া দিবে ?

হজরত প্রত্যাখ্যান লইয়া ফিরিলেন। প্রধানদের ছাড়িয়া সাধারণ লোকদের কাছে উপস্থিত হইলেন। পথে পথে তাঁহার অমিয় বাণী বিতরিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাকিফ সর্দ্দারেরা তাঁহাকে শুধু অস্বীকার দিল না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে দিল অপমান, দিল লাঞ্ছনা, দিল নির্য্যাতন। তাহাদের ইঙ্গিতে ক্রীতদাস ও দুষ্টের দল এই কাজে লাগিয়া গেল। হজরত যেদিকে যান তাহারা হৈ হৈ রবে ছুটিতে থাকে, মুখে তাহাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গালাগালি, হাতে তাহাদের পাথরের নুড়ি। ইট-পাথরের আঘাতে হজরতের চরণ দুই'খানি ক্ষত বিক্ষত হয়, রুধির-ধারে রঙীন হইয়া ওঠে। সত্যের অপমানে চোখে তাঁহার অশ্রু ঘনাইয়া আসে, প্রস্তর-ঘায়ে জর্জ্জরিত অঙ্গ তাঁহার অবসাদে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। সাকিফ পাষণ্ডদের ইহাতেও তুষ্টি হয় না। তাহারা হজরতের হাত ধরিয়া তুলিয়া দেয় ; তিনি আল্লার নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ চলিতে থাকেন। আবার তাহার উপর পাথর বৃষ্টি হয়। আঘাতে আঘাতে তাঁহার অঙ্গরাখা রক্তে লাল হইয়া ওঠে।

একদিন তায়েফবাসীর প্রস্তরঘায়ে হজরতের জীবন যায় যায়। সঙ্গী জায়েদ তাঁহাকে বহন করিয়া আনিলেন নগরপ্রান্তে এক আঙুর বাগানে। তায়েফের উর্ব্বর ভূমি মক্কাবাসী ধনীদের দৃষ্টিকে সহজেই আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকে এখানে উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উৎবা-বেন্ রাবিয়ার ছিল এক আঙুর বাগান। প্রাচীর-ঘেরা এই বাগানে জায়েদ মুমূর্ষু হজরতকে বহিয়া আনিলেন। তাঁহার সারা অঙ্গের বসন শোণিত-রাগে রাঙিয়া উঠিয়াছে, পাদুকার মধ্যে রক্ত জমাট হইয়া পা দু'টিকে আটকাইয়া ফেলিয়াছে। জায়েদ অতি সন্তর্পণে রক্ত মুছিয়া দিলেন, পাদুকা হইতে

রাজীব চরণ দু'খানি টানিয়া বাহির করিলেন, চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়া তাঁহার চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। হজরত তখনই উঠিয়া বসিলেন। এতো নির্য্যাতন সহিয়াও আপনার সত্যে বিপুল বিশ্বাস তাঁহার এক বিন্দু টলিল না, অত্যাচারীদের উদ্দেশে একটী মাত্র অভিসম্পাত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। উঠিয়া বসিয়াই পরম প্রভু আল্লাকে তিনি ডাকিলেন, তাঁহার দেহ অন্তর মন ভেদিয়া আত্মনিবেদনের করুণ স্বর বাজিয়া উঠিল: "আল্লা, হে আমার আল্লা, তোমায় ডাকিতেছি। দুর্ব্বল আমি, উপায়হীন আমি, মানুষের কাছে তৃণাদপি তুচ্ছ আমি তোমারই কাছে আমার অন্তরের এই আকুল আকুতি! হে আল্লা, অনন্ত করুণার আধার তুমি, অশরণের শরণ তুমি, দুর্ব্বলের বল তুমি, প্রভু আমার, তুমি ছাড়া আমার তো আর কেহ নাই। কাহার হাতে আমায় তুলিয়া দিবে, প্রভু! মানুষ আমাকে অভদ্র ভাষায় সম্বোধন করিতেছে, আমার সত্য-সাধনাকে ব্যর্থ বিফল করিয়া দিতে চাহিতেছে! এমন অনাত্মীয় শত্রুর হাতে আমায় সমর্পণ করিবে? ওগো দয়াময় প্রভু, তোমার সন্তোষ আমার মাথার মণি, তোমার প্রীতি আমার অনন্ত সাধনার ধন। তাই যদি পাই প্রভু, বিপদে আমার কি ভয়, বলো! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল তোমার শুভাশীষ। হে আমার আল্লা, তোমার পুণ্য জ্যোতির প্রভায় সকল আঁধার কাটিয়া যায়, সকল জীবনে মঙ্গলের আলো নামিয়া আসে। সেই জ্যোতির শরণ মাগিতেছি, প্রভু! তোমার অসন্তোষ যেন আমার পথ না হয়, তোমার অভিশাপ যেন আমার গতি না হয়! প্রভু হে, তোমার সন্তোষ যেন লাভ করিতে পারি, আমার বেদনার্থ অন্তরের এই আবেদন! তুমিই আমার একমাত্র সম্বল, তুমিই আমার একমাত্র গতি।"

বিশ্রামের পর তাঁহারা কি ভাবে মক্কায় ফিরিবেন ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে আদ্দাস নামক একটী ক্রীতদাস এক থোলো আঙুর হজরতের জন্য আনিল। তিনি 'বিসমিল্লা' বলিয়া কয়েকটী আঙুর মুখে দিলেন। আদ্দাস কখনো

এ রীতি দেখে নাই। সে অবাক বিস্ময়ে নবীর দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল: আপনি এ কি বলিলেন? হজরত 'বিস্‌মিল্লা'র অর্থ বুঝাইয়া দিলেন: "আল্লার নামে।" তিনি আরো বুঝাইয়া বলিলেন এই মন্ত্রের মর্ম্মবাণী—মুস্‌লিমের নিবেদিত চিত্তের গূঢ় রূপ।

আদ্দাস তখনই ইসলাম কবুল করিল।

হজরতের প্রাণ লইয়া টানাটানি; কিন্তু তখনো সত্যের বাণী তাঁহার ভাষা, আল্লার পথ তাঁহার শরণ!

মক্কার দিকে তিনি ফিরিবেন; কিন্তু সেখানে তো তাঁহার উদ্দেশে ঘাতকের অস্ত্র উত্তোলিত হইয়া আছে। তথাপি মক্কা ছাড়া তাঁহার গতি নাই। সেখানে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? এতো অত্যাচার-নির্য্যাতন তিনি সহিয়াছেন; পরাজয় তাঁহার আসে নাই; এতো ষড়যন্ত্র তাঁহাকে বার বার বন্দী করিতে চাহিয়াছে, তাঁহার নির্ম্মুক্ত পবিত্র আত্মা পাপ-বন্ধনকে স্বীকার করে নাই। কে তাঁহাকে এই শক্তি দিয়াছে? হজরত মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা জানিতেন। তাই সেই জগৎকারণ নিখিলশরণ মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়াই তিনি জায়েদের সঙ্গে মক্কার দিকে চলিলেন। মহামনা মোৎয়েম-বিন্‌-আদী তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন: আপনি মক্কায় আসুন, কেহ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না। মোৎয়েম ধনী, সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠিপতি। তিনি স্বগোত্রের সৈনিকদের অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে চলিলেন। মক্কায় ঘোষণা হইল: মোৎয়েম নবীকে অভয় দিয়াছেন, সবাই সাবধান!

তায়েফ হইতে ফিরিয়া হজরত সওদাকে বিবাহ করিলেন। সওদা বৃদ্ধা —বিবাহের বয়স তাঁহার নাই। স্বামীর সঙ্গে তিনি আবিসিনিয়ায় যান। স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধার আশ্রয় আর একটীও রহিল না। মুস্‌লিম মণ্ডলীর প্রতি এই ভীষণ আক্রোশ, চারিদিককার এই দুর্নীতি—ইহার মধ্যে কে বৃদ্ধাকে রক্ষা করে? হজরত নিজের বিপদ ভুলিয়া গেলেন, এই নিঃস্ব

নিরাশ্রয় মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিপালনের ভার হইলেন।

কিন্তু ইসলাম প্রচারের চিন্তাই তাঁহার মনের সবটুকু জুড়িয়া রহিল। জেলহজ্জ্ মাস। আরবের নানা অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিয়াছে কা'বায় তীর্থ করিতে। এ মাস আরবের চক্ষে অতি পবিত্র। যুদ্ধ নাই, প্রহার নাই, নির্য্যাতন নাই, শত্রুতার বাহ্যপ্রকাশ নাই; সর্ব্বত্র শান্তি, সবখানে নিরুদ্বেগ জীবন। পবিত্র মাসে আরবের এই চিত্র। ইহার মধ্যে হজরত নবীকে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতেছে। পবিত্র মাসের অহিংসার সুযোগ লইয়া তিনি তীর্থযাত্রীদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইতে লাগিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না; তিনি তাহাদের ছাড়িয়া বিদেশীদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়া ইসলামের দাওয়াৎ পৌছাইলেন। শুধু তীর্থপথিক নয়, মেলার যাত্রীদের কাছে গিয়াও নবী আপনার অন্তরের বারতা প্রচার করিলেন। কা'বার আশে পাশে তীর্থ-মেলা, ওকাজ মজন্না প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক মেলা। হজরত সবখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষকে মঙ্গলের পথে ডাকিলেন, প্রতিমা-পূজা ছাড়িতে বলিলেন, মদাসক্তি, ব্যভিচার, দুর্নীতি ত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবনে আসিতে আহ্বান করিলেন। আরবের য়্যাস্‌রেব নগরী ধনে, জনে, কৃষি-সম্পদে বাণিজ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ। মক্কার লোকদের মতো এখানকার লোকেরা তেমন হিংস্রস্বভাব নয়। স্নিগ্ধ আবহাওয়ার পরিবেষে মানুষের মন সেখানে স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। হজরত নবী তীর্থমাসের জনসমাগমে কা'বার আশে পাশে, মেলায় মেলায় যাত্রীদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার পিছু লাগিয়া রহিল। তাহারা বলিল: মোহাম্মদ ভূতগ্রস্ত, মোহাম্মদ জ্যোতিষী, মোহাম্মদ মায়াবী, মোহাম্মদ যাদুকর; ইহাকে কেহ আমল দিও না, ইহার কাছে কেহ ঘেঁষিও

না ; ইহার মুখের বাণাতে অদ্ভুত মায়া, আশ্চর্য্য এক যাদু জড়াইয়া আছে, যে শুনিবে সে-ই মুগ্ধ মায়াচ্ছন্ন হইয়া যাইবে ; ইহার কথা কেহ শুনিও না। পবিত্র মাসে প্রহার-নির্য্যাতন নিষিদ্ধ ; তাই নবীর পিছু লাগিয়া মক্কাবাসীদের এই ঘোষণা। কিন্তু এই বাচনিক শত্রুতার ব্যূহ ভেদ করিয়া হজরতের সত্য মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, য়্যাস্‌রেব নগরীর অনেকগুলি লোক ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় লইল।

একদিন সন্ধ্যায় মক্কার অনতিদূরে আকাবা নামক স্থানে য়্যাস্‌রেববাসী ছয়টী লোক বসিয়া অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। হজরত তাহাদের দলে ভিড়িলেন, ইসলামের মর্ম্মকথা তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন। এই লোক-গুলি ছিল প্রতিমাপূজক ; কিন্তু প্রতিবেশী ইহুদীদের কাছে ইহারা নিষ্প্রতিম আল্লার উপাসনার কথা শুনিয়াছিল, আর শুনিয়াছিল বড় একটী আশার কথা—একটী ভবিষ্যদ্বাণী : বনি-ইস্‌রাইলদের দায়াদ বনি-ইস্‌মাইল বংশে একজন নবী আবির্ভূত হইবেন ; তাঁহার ভাষা হইবে অপূর্ব্ব সুন্দর ; তাঁহার বাণী হইবে মহিমান্বিত। মুসার মতো মহামানুষ হইবেন ইনি ; ইঁহার নিশান-তলে সমবেত হইবে নির্য্যাতিত ইহুদী-দল। য়্যাস্‌রেববাসীরা হজরতের মুখে শুনিল কোরেশের শুদ্ধ সুন্দর ভাষা। শুধু তাই নয়, তাঁহার মুখের ভাষা বহন করিয়া আনিয়াছে লোকাতীত অমৃত, যাহার ছোঁয়ায় মরা মানুষ বাঁচিয়া ওঠে। বিদেশীরা সেই অমৃত পাইয়া নূতন জীবন লাভ করিল। তাহারা দেখিল : পুরাতন কালের প্রতিশ্রুত সেই নবী আজ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ; তাহারা আগ্রহে আনন্দে তাঁহার পতাকাকে অভিবাদন করিল। হজরতকে তাহারা সঙ্গে পাইল না, কিন্তু তাঁহার পতাকা বহন করিয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিল। লোকগুলি খাজরাজ বংশের।

ইহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেল। য়্যাস্‌রেব নগরে ইসলামের অদ্ভুত সংক্রামক সত্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহাকে বিনষ্ট করিবার

জন্য মক্কাবাসীরা লৌহের মতো কঠিন, বজ্রের মতো ভীষণ অত্যাচার চালাইয়াছিল, সেই বীজ অন্যখানে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইতেছে দেখিল। য়্যাস্‌রেবের যে-লোকটী ইসলাম কবুল করে সে-ই দেশে ফিরিয়া প্রচারকের ব্রত অবলম্বন করে, একি বিপদের কথা! মক্কীয়েরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল; কোথায় কোন্ য়্যাস্‌রেববাসী মোহাম্মদের শরণ লইতে আসে তাহার সন্ধানে লাগিয়া রহিল।

হজরতের সত্যলাভের বারো বৎসর। বারো জন য়্যাস্‌রেব্‌বাসী সেই আকাবায় আসিয়া নবীর কাছে দীক্ষা লইলেন। তাঁহারা হজরতের হাতে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন: আমরা এক অদ্বিতীয় অমূর্ত্ত আল্লার উপাসনা করিব, কোনোভাবে পরস্ব অপহরণ করিব না, ব্যভিচারে লিপ্ত হইব না, কোনো অবস্থায় সন্তান হত্যা করিব না, কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ দিব না বা কাহারো চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিব না, কখনো কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিব না, এবং প্রত্যেক সৎকার্য্যে হজরতের অনুগত থাকিব—কোনো সঙ্গত কাজেই তাঁহার অবাধ্য হইব না।—এই প্রতিজ্ঞার নাম আকাবার প্রথম বাইয়াৎ। এই বাইয়াৎ পুণ্যের দীক্ষা, পবিত্রজীবনের দীক্ষা, মুক্তবুদ্ধির দীক্ষা। হজরতের প্রতি য়্যাস্‌রেববাসীদের আনুগত্যের একমাত্র শর্ত্ত এই যে হজরতের সৎ ও সঙ্গত কার্য্যে তাঁহারা যোগদান করিবেন। অর্থাৎ হজরতের কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিবেন, তাহার বিচার-ভার রহিল দীক্ষিতদের উপর। দীক্ষা-গুরুর আদেশ বিচারের ঊর্দ্ধে, এই অন্ধ ধারণার জ্বলন্ত প্রতিবাদ আকাবার প্রথম বাইয়াৎ। আপনার সত্যে অগ্নির মতো তেজস্বী, পর্ব্বতের মতো নিশ্চল নবী শিষ্যদের এই জ্ঞানমুক্তির ফর্‌মান দিয়া বিদায় করিলেন।

মক্কীয়দের প্ররোচনায় এবং স্থানীয় গোত্রপতিদের স্বার্থনাশের আশঙ্কায় ইসলামের এই নব আবাসেও তাঁহার প্রতি ঘোর বিরুদ্ধতা জাগিয়া উঠিল। সমাজপতি ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নবীর সত্যকে মারিবার জন্য অস্ত্র উদ্যত

করিল। কিন্তু এই উদ্যত অস্ত্রের ছায়াতলেই ইসলাম-তরু শাখা-প্রশাখা মেলিতে লাগিল। বনিজহ্‌ল, দাওস্, গেফার, আজ্‌দ্, আওস্, খাজরাজ, আকাহাল্ প্রভৃতি গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিল। আকাবার প্রথম দীক্ষিতদের সঙ্গে গিয়াছিলেন মুসা'ব। তিনি ওসায়দ, আওস্-গোত্র-পতি সা'দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কাছে কোর্‌আনের জলদ-গম্ভীর বাণী উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা সানন্দে নবসত্যের সেবক হইলেন। এই-ভাবে হইল য়্যাস্‌রেবে ইসলাম-তরুর বিস্তার।

এদিকে মক্কায় হজরতের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। বিবি খদিজার মৃত্যুর পর অনেক দিন তিনি বিবাহ করেন নাই। শেষে বৃদ্ধা সওদা পত্নীরূপে তাঁহার আশ্রয় লাভ করিলেন। তিনি হজরতের সেবার ভার নিয়াছেন। মক্কার ভক্ত শিষ্যেরা হজরতকে এই সেবার অধিক কিছু দিতে চায়। আবদুল কা'বা হজরতের প্রিয়তম ভক্তদের একজন। সত্যের জন্য তিনি সম্ভ্রম, কর্ত্তৃত্ব অনেক কিছুই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আয়শা তাঁহার অল্পবয়সী মেয়ে। আয়শা রূপসী, আয়শা বুদ্ধিমতী—যেন কোরেশের তেজ, বুদ্ধি, চাতুর্য্য, শালীনতা সবই এই মেয়েটীতে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। আবদুল কা'বা চান এই মেয়েটীকে হজরতকে দিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের বাঁধন অচ্ছেদ্য করিতে। মুস্‌লিম দল এই প্রস্তাবে খুশী হইলেন। কিন্তু আয়শার এখনো খেলার বয়স, সে কেমন করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিবে? তা না আসুক, কিন্তু বিবাহে আপত্তি কি? কোরেশের ঘোর শত্রুতার মধ্যে বৈরীদলের রক্ততৃষাতুর দৃষ্টির সম্মুখে যাঁহার পলাতক জীবন-যাপন, সুখশান্তির আশায়—বিলাস-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার ঘরে কেহ কন্যা দেয় না, কিম্বা কোনো স্ত্রীলোক তাঁহার ঘরণী হইতে আসে না। তথাপি আবুবকর আয়শাকে নবীর গৃহিণী করিতে চাহিলেন। সামান্য তাঁহার আহার, ছিন্ন তাঁহার বসন, বিনিদ্র তাঁহার রজনী! তথাপি আয়শা হজরতের জীবন-সঙ্গিনী হইলেন।

সত্যের নব-আবাস

ইহার সম সময়ে একদিন হজরতের এক আশ্চর্য্য রকমের ভাবাবেশ ঘটিল। দ্যুলোক ভূলোকে বিশ্বরাজের সৃষ্টি-মহিমার মাঝখানে তিনি আপনাকে দেখিতে পাইলেন। যিনি তাঁহার অন্তরের ধন, তাঁহাকে অন্তরতর, নিবিড়তর অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি করিয়া জ্যোতির সমুদ্রে নাহিয়া উঠিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে মহত্তর বিশালতর জীবন একটীর পর একটী দল মেলিয়া বিকশিত হইতেছে, যেন তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। এই হইল মহানবী মোহাম্মদের মে'রাজ—আরোহণ—উর্দ্ধগতি। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম্মুখে দেখিয়াও যিনি পিছু হটিয়া যান নাই, অন্তহীন নির্য্যাতনের মধ্যেও যাঁহার আত্মা এতোটুকু মলিন হয় নাই, তাঁহার আজ এই উন্নয়ন। পর্ব্বতের উচ্চতাকে জিনিয়া বাধার বিপুলতাকে তুচ্ছ করিয়া নবী-চিত্তের আজ এই বিচিত্র শিহরণ।

ওদিকে য়্যাস্‌রেবে ইসলাম-তরু শাখার পর শাখা বিস্তার করিয়া চলিল। মক্কায় হজরতের হাতে যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টায় দলপতি ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অনেকে ইসলামের সত্য স্বীকার করিলেন। তাঁহারাই আবার নবীর সত্যের প্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন। য়্যাস্‌রেবে মুস্‌লিম দল ক্রমেই পুষ্ট হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা প্রচুর শক্তি অনুভব করিলেন, তখন হজরতকে মক্কায় শত্রুর উদ্যত অস্ত্রের তলে রাখিয়া দেওয়া তাঁহাদের আর সঙ্গত মনে হইল না। য়্যাস্‌রেবের আমন্ত্রণ নবীর কাছে পৌছিল, বিপন্ন মুস্‌লিম দলের সম্মুখে আত্মরক্ষার একটী পথ উন্মুক্ত হইল।

মদীনাতুন্নবী

আবার সেই আকাবা—যেখানে য়্যাস্‌রেববাসীরা হজরত নবীর হাতে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। নবীত্বলাভের তেরো বৎসর ;—সেই তীর্থ-মাস, জেলহজ্জ—পবিত্র হজের সময়। বিদেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী মক্কায় আসিয়াছে। য়্যাস্‌রেববাসীরাও দলে দলে আসিয়া কা'বা সন্নিধানে সমবেত হইয়াছে। এই দলে মিশিয়া আছেন নবদীক্ষিত মুস্‌লিমগণ। তাঁহাদের গতিবিধি কোরেশ-চরেরা লক্ষ্য করিতেছে। মোহাম্মদ য়্যাস্‌রেবে চলিয়া গেলে সেখানে ইসলামের নবরচিত ব্যূহ অভেদ্য হইয়া দাঁড়াইবে—এই আশঙ্কায় কোরেশ বিচলিত। গৃহের শত্রুকে—জালালাত্‌ ও বেদ্‌আতের প্রচারককে, 'নব-নাস্তিকতা'র উদ্ভাবককে তাহারা হাতের মুঠার বাহিরে যাইতে দিবে না—এই তাহাদের দৃঢ়পণ, য়্যাস্‌রেববাসীরা গোপনে নবীকে লইয়া ভাগিতে পারে—এই সন্দেহে রাত্রিতে তাহাদের ঘুম নাই। চরের দল অলিতে গলিতে, গৃহের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া অনবরত খোঁজ লইতেছে—য়্যাস্‌রেবের মুস্‌লিম দল কখন্‌ কোথায় হজরতের সহিত গোপন পরামর্শে মিলিত হয়। তাহাদের সাবধানসতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি এড়াইয়া মুস্‌লিমদের চলাই দায় !

য়্যাস্‌রেববাসীরা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল : গভীর নিশীথে আকাবার প্রান্তদেশে মুস্‌লিমদের বৈঠক বসিবে। কিন্তু দল বাঁধিয়া সেখানে যাওয়া হইবে না। দুই একজন করিয়া সুযোগ সুবিধামতো

সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। হজরত সেখানে বিদেশী মুসলিমদের দেখা দিবেন।

পরামর্শ মতো কাজ হইল। য়্যাস্‌রেববাসী মুসলিমদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, কেবল তাঁহারাই আকাবায় গেলেন। কাহারও মুখে টুঁ শব্দটী নাই। সকলেই হজরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনীর অর্দ্ধেক অতীত প্রায়, এমন সময় হজরত পরদেশী ভক্ত দলের সহিত মিলিত হইলেন। একমাত্র সঙ্গী তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস; তিনিও আবার অ-মুস্‌লিম! কিন্তু মুস্‌লিম না হইলেও আব্বাস্ আবু তালেবের মতোই হজরতকে বাল্যকাল হইতে ভালোবাসিতেন এবং কোরেশদের নিগ্রহ-নির্য্যাতনের হাত এড়াইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র কোনো নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান, ইহা অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। তাই তিনি য়্যাস্‌রেববাসীদের কাছে আসিয়াছেন। তিনি জানিতে চান, কি শর্ত্তে তিনি প্রিয় মোহাম্মদকে তাঁহাদের হাতে সঁপিয়া দিবেন। মোহাম্মদের মতামত যাহাই হোক, শত্রুমিত্র সবাই তাঁহার সম্ভ্রম ও মহত্ত্বের সম্মুখে নতশির। তাঁহার প্রাণের যাহারা বৈরী, তাহারাও তাঁহার নির্ম্মল সাধু স্বভাবের সাক্ষী। এহেন আদরের, সম্ভ্রমের মোহাম্মদকে য়্যাস্‌রেববাসীরা স্বদেশে নিয়া যাইতে চান। কি তাঁহাদের পণ, কতো দৃঢ় তাঁহাদের সঙ্কল্প, কতো গভীর তাঁহাদের আন্তরিকতা—না জানিয়া আব্বাস এ প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন না।

তিনি ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন: আপনাদের প্রস্তাব অতি কঠিন। মোহাম্মদ য়্যাস্‌রেবে চলিয়া গেলে কোরেশ আপনাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, হয়তো অখণ্ড আরব আপনাদের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আপনারা কি করিবেন?

বিদেশী মুস্‌লিম নেতারা হজরতের মুখের দিকে চাহিলেন। নবী কোর্-

আন পড়িলেন, আল্লার দিকে সকলকে আহ্বান করিলেন ; তারপর বলিলেন : আমি আর বেশী কি বলিব ? আমি আপনাদের অন্তর্গত হইতে যাইতেছি, পরিবারের প্রতি আপনাদের যেরূপ ব্যবহার, আমার প্রতিও সেইটুকু করিবেন। আর যে সকল অত্যাচারিত মুস্‌লিম মক্কা ছাড়িয়া আপনাদের সহিত যাইবে, তাহাদের কেহ অন্যায় করিয়া আক্রমণ করিলে তাহাদের রক্ষা করিবেন যেমন আত্মীয়স্বজনগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সমবেত য়্যাস্‌রেববাসীরা বলিল : আমরা প্রস্তুত। কোরেশের রক্তচক্ষু, আরবের আক্রমণ—কিছুরই পরওয়া আমরা করি না। আপনি আমাদের প্রতিশ্রুতি নি'ন—আমাদের বাইয়াত্‌ গ্রহণ করুন। যুদ্ধ আমরা অনেক করিয়াছি, উহার নামে আমাদের কোনো ভয় নাই।

হজরত কর প্রসারণ করিয়া পরদেশী মুস্‌লিমদের বাইয়াত্‌ লইলেন। তাঁহারা ইসলামের সত্য লাভ করিলেন এবং এই সত্যের বিনিময়ে নবীর মারফতে আপনাদের ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, জীবন-যৌবন সবকিছু আল্লাকে সঁপিয়া দিলেন।

আব্বাস্‌ ভীত হইয়া হজরতকে বলিলেন : সাবধান, চুপে চুপে সব কাজ করিয়া ফেল। দেখিতেছ না, শত্রুর সতর্ক দৃষ্টি সকল সময়ে তোমার অনুসরণ করিতেছে ? বয়োজ্যেষ্ঠেরা প্রতিশ্রুতি দি'ন, তাহাতেই কাজ হইবে।

গহীন রাত্রির গোপনতার মধ্যে হজরতের সহিত য়্যাস্‌রেববাসীদের প্রতিজ্ঞা-বিনিময় হইয়া গেল। সত্যের বাহন আল্লার রসুল যাইবেন তাঁহাদের বাসভুমিতে, আর তাঁহারা প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবেন সত্যকে—সত্যের পতাকাবাহীদের। ত্রিযাম নিশীথে হজরত আপন আবাসে চলিয়া গেলেন ; তাঁহারা আপন আপন ডেরায় গিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন। নিদ্রিত মুস্‌লিম দল জানিল না তাহাদের প্রধানেরা কোথায় কি করিয়া

আসিলেন; কিন্তু—তাহারা না জানিলেও সেই রাত্রির মন্ত্রণায় য়্যাস্‌রেবের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—বিশ্বের ইতিহাসে তাহার জন্য একটী মহিমান্বিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

স্থির হইয়াছে: হজরত মোহাম্মদ সদলবলে মক্কা ছাড়িয়া য়্যাস্‌রেবে চলিয়া যাইবেন, কিন্তু সকলে একদিনে—এক সময়ে নহে। ইসলামকে শক্তিশালী করিবার জন্য, তাহার ভিত্তিমূল দুনিয়ার বুকে সুদৃঢ় করিবার জন্য হজরত স্বদেশ ত্যাগ করিয়া—আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া অন্যখানে চলিয়া যাইতেছেন। ইসলাম জয়যুক্ত হইলে তিনি কি আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন? য়্যাস্‌রেববাসীদের মনে এ সন্দেহ জাগিয়াছিল। হজরত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন: না, কখনই নয়। য়্যাস্‌রেবকে তিনি চিরদিনের জন্য আপনার বাসভূমি স্থির করিয়াছেন; তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু এইখানেই তিনি কাটাইয়া দিবেন, আল্লার ইচ্ছা হইলে এখানকার মাটীতেই তাঁহার সমাধি হইবে। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, জয়-পরাজয়—যাহা কিছু তাঁহার ভাগ্য সবই তিনি য়্যাস্‌রেববাসীদের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী হইয়া বরণ করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়।

বিদেশী মুস্‌লিমদল গৃহে ফিরিয়াছেন। য়্যাস্‌রেববাসীদের আনন্দ আর ধরে না। আল্লার নবী তাঁহাদের কাছে আসিতেছেন। সবখানেই এই প্রসঙ্গ—এই কথার আলোচনা। গৃহে গৃহে নবীর অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে লাগিল। মক্কার অত্যাচারিত মুসলিমগণ একে একে সবাই চলিয়া গেলেন। হজরত তাঁহাদের ফেলিয়া কখনও আগে যাইতে পারেন না। কোরেশের নির্য্যাতন এড়াইবার জন্য তিনি নিঃস্ব মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন, নিজে শত্রুর নির্ম্মম আঘাত সহিয়াছিলেন মক্কায়। এবারেও শেষ পর্য্যন্ত বৈরীদলের সম্মুখে রহিলেন হজরত স্বয়ং, প্রিয় সহচর আলী, প্রিয়তম ভক্ত শিষ্য আবদুল কা'বা—যাঁহার নাম হইয়াছে আবুবকর। তিনটী

মাত্র প্রাণী মক্কায় রহিয়া গেলেন। কোরেশদলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। সকল মুস্‌লিম মক্কা ছাড়িয়াছেন; তাহাদের শেষ শিকার মোহাম্মদও বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়!

আর বিলম্বের অবসর নাই, হজরত যে-কোনো দিন য়্যাস্‌রেবে চলিয়া যাইতে পারেন। আবুজেহেল—হজরতের জীবনের সেই নিকৃষ্টতম বৈরী—মক্কার সকল গোত্রের কাছে খবর পৌঁছাইতে লাগিল। আকাবার প্রতিজ্ঞা বিনিময়, আব্বাসের স্বজনদ্রোহিতা, মুস্‌লিমদলের প্রস্থান—সব-কিছুই দ্রুত গতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। মক্কাবাসীর মন্ত্রণা-সভা—দারুন্‌-নদ্‌ওয়ার বৈঠক বসিবে, স্থির হইল। যাহা করিতে হয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। নয়তো হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের প্রবল বাধার সম্মুখে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইতে পারে।

রাত্রিতে নদ্‌ওয়ার অধিবেশন শুরু হইয়াছে। কা'বা মন্দিরের কুঞ্জিকারক্ষক ওস্‌মান-ইব্‌নে-তাল্‌হা, মক্কীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি আবু-সুফিয়ান-ইব্‌নে-হারব, নগরের খাজাঞ্চীখানার কর্তা হারেস্‌-ইব্‌নে-কায়েস্‌ প্রভৃতি সবাই এখানে সমুপস্থিত। আবদুল ওজ্জা ইব্‌নে কোসায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, প্রবীণ। তিনিই আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। নদ্‌ওয়ার প্রধানতম রক্ষী—কায়েম্মা—খালেদ-বিন-ওলিদ আজ মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারায় নিযুক্ত। মোহাম্মদের সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইহাই আজ আলোচনার বিষয়।

আবুজেহেল জানিত: কোনো একটী গোত্রের লোক হজরতকে হত্যা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করিবে না। হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের ক্রোধকে সবাই ভয় করে। কিন্তু সকল গোষ্ঠীর লোকেরা যদি সম্মিলিত ভাবে এই কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে আর কিসের ভয়? হজরতের আত্মীয়স্বজনেরা কখনই মক্কার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে

সাহসী হইবে না। তা' ছাড়া মক্কার বিভিন্ন গোত্রগুলি পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। একের বিপদে অন্যেরা তাহার হইয়া লড়াই করিবেই, এমন নিশ্চয়তা কিছু ছিল না। কিন্তু যদি আজ সকল গোত্র একই অপরাধে অপরাধী হয়, সবাই হাশেমীয়দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং একযোগে তাহাদের সহিত লড়িতে বাধ্য হইবে। এই ভাবিয়া সুচতুর আবু জেহেল প্রস্তাব করিল : মোহাম্মদকে রক্ষা করিতে আজ আর কেহ নাই। তাহার সঙ্গী শিষ্যেরা সবাই য়্যাস্‌রেবে চলিয়া গিয়াছে, হাশেমীয়দের মধ্যে বিচক্ষণ ও শক্তিমান নেতা যিনি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এমন চমৎকার সুযোগ ছাড়া চলেনা। আজ যদি আমরা মোহাম্মদকে হত্যা না করি, সে অবিলম্বে য়্যাস্‌রেব নগরের অধিপতি হইয়া বসিবে, সুবিধা পাইলেই মক্কা আক্রমণ করিয়া তাহার অপমান-নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। এই বিপদ আমরা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিব কেন? তার চেয়ে আমরা এক কাজ করি : সকল গোত্র হইতে এক একটী সাহসী শক্তিমান যুবক বাছিয়া নেওয়া হোক; তাহারা সবাই একযোগে মোহাম্মদকে আক্রমণ করিবে, সবাই তরবারির আঘাতে তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। তখন দেখা যাইবে : হাশেম ও মোত্তালেব গোষ্ঠি মক্কার সকল গোত্রের বিরুদ্ধে কি করিয়া অস্ত্র ধারণ করে!

সকলেই আবু জেহেলের প্রস্তাব অতি সমীচীন মনে করিল। প্রধান প্রধান নেতারা তাহার বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। স্থির হইল : তিলার্দ্ধও আর বিলম্ব নয়। বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইতে পারে। এখনই—এই মুহূর্ত্তে সকল গোত্রের সশস্ত্র যুবকদল মোহাম্মদের বাড়ী ঘেরাও করিবে।

নদ্‌ওয়ার বৈঠক ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অমানিশার কৃষ্ণ বুক চিরিয়া অনেকগুলি শাণিত কৃপাণ চিকমিক করিয়া উঠিল। হজরতের গৃহের

চারিদিকে মক্কার হিংস্র রক্তপিপাসু যুবকদল সমবেত হইল। গভীর রাত্রিতে হাশেমীয়দের ঘুম ভাঙ্গাইবার দরকার নাই ; তাহাতে আসল মতলবই ফাঁসিয়া যাইতে পারে। যুবকগণ স্তব্ধ নীরবতায় ঊষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মোহাম্মদ শয্যা ছাড়িয়া নিশা-অবসানে বাহিরে আসিলেই হয়, কৃপাণের পর কৃপাণ হানিয়া তাহারা তাঁহার দেহটীকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিবে। তারপর হাশেমীয়দের সহিত যুদ্ধ? তাহার জন্য তো সকলেই প্রস্তুত, সুতরাং শঙ্কা কিসের ?

ওদিকে হজরতের য়্যাস্‌রেব-গমনের সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে, আবুবকর তাঁহার সঙ্গী। দুইটী তেজীয়ান উটের পিঠে তাঁহারা দু'জন সওয়ার হইলেন। আবুবকরের কন্যা আস্‌মা ও আয়শা কিছু আহারীয় তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহাদের সম্বল। নবীর সত্য লাভের ত্রয়োদশ বৎসর ; সফর মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ নিশা। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। ইহাকে অঙ্গরাখা করিয়া আল্লার পথের দুইটী পথিক জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলেন। মক্কার তিন মাইল দূরে সওর পর্ব্বত। এইখানে গিয়া একটী নিভৃত গুহায় তাঁহারা আশ্রয় লইলেন।

হজরত নবী আলীকে মক্কায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সত্য মক্কার লোক মানিল না, তাঁহাকে আল্লার রসুল স্বীকার করিল না, তথাপি তাঁহার সাধুতা, সত্যপ্রিয়তা ও মহত্ত্বের সম্মুখে তাহাদের শির অবনত। তাহারা অনেক অর্থ বিত্ত অলঙ্কার প্রভৃতি হজরতের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যায়। য়্যাস্‌রেব-গমনের পূর্ব্বে তিনি সে-সব ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপদের আশঙ্কা প্রচুর। তাই সমস্ত ন্যাস্ত ধন ও তাহার মালিকদের নামের তালিকা হজরত আলীর কাছে রাখিয়া হজরত আবুবকরের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। যাহার যে জিনিস আলীই হজরতের হইয়া সমস্ত ফিরাইয়া দিবেন, কথা রহিল। তিনি হজরতের চাদরে অঙ্গ আবৃত করিয়া

তাঁহারই শয্যায় শয়ন করিলেন। অমানিশির অবসানে রক্তৃষ্ণাতুর কোরেশ যুবকদল নবীর খোঁজ করিতে গিয়া দেখিল : হজরত মোহাম্মদ নাই, আলী তাঁহার স্থানে শুইয়া আছেন! শিকার ভাগিয়াছে দেখিয়া বাঘ-মানুষগুলি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আলী জিজ্ঞাসা করিলেন : কিহে, তোমরা এখানে কাহার খোঁজ করিতেছ ?

তাহারা বলিল : কাহাকে খুঁজিতেছি, তুমি জান না! বল মোহাম্মদ কোথায়, তাহাকেই আমরা চাই।

আলী মনে মনে হাসিলেন ; বাহিরে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। আবু জেহেলকে সাম্‌নে দেখিয়া তিনি বলিলেন : তোমরা তো বাপু আমাকে প্রহরী নিযুক্ত কর নাই। দরকার হয়, তোমরা নিজেরাই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর।

মোহাম্মদ চলিয়া গিয়াছেন : সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঘাতকগণের অতৃপ্ত রক্তপিপাসা অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা পথে পথে, গলিতে গলিতে, পর্ব্বতে প্রান্তরে মুক্ত তরবারি হস্তে হজরতের খোঁজে বাহির হইল। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দলপতিগণ আন্‌-নদ্‌ওয়ার পক্ষ হইতে ঘোষণা করিল : একশত উষ্ট্র পুরস্কার! মোহাম্মদ ও আবুবকরকে যে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিবে অথবা তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া হাজির করিবে তাহাকে একশত তেজী উট বখ্‌শিশ দেওয়া হইবে!

আবুবকরের সহিত হজরত গিয়াছেন, এ সংবাদ জানিতে আবুজেহেলের বাকী ছিল না। রক্তভুক্‌ কুক্কুরদের হজরত ও আবুবকরের পিছনে লেলাইয়া দিয়া সে বাড়ীতে খোঁজ করিতে আসিল। আবুবকরের বাড়ীর সদর দরজায় সজোরে করাঘাতের শব্দ হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ভিতর হইতে আস্‌মা বাহির হইয়া আসিলেন। আবুজেহেল ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল : বল্‌ কোথায় তোর বাপ! কিন্তু আবুজেহেলের রক্তচক্ষু ও ক্রোধকঠোর কণ্ঠ আস্‌মাকে শঙ্কিত করিল না ; পিতার সম্বন্ধে কোনো

খবরই তিনি আবুজেহেলকে দিলেন না। রাগে অধীর হইয়া সে তখন বালিকার মুখে ভীষণ বেগে এক চড় বসাইয়া দিল।

রক্তকামী যুবকদলের উৎসাহ পুরস্কারের লোভে দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মোহাম্মদের শির লইবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে ছুটাছুটি করিতেছে। মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, কোথায় মোহাম্মদ?—যে যেখানে—যেদিকে ছুটিল, সকলেরই মুখে ঐ এক কথা: কোথায় মোহাম্মদ? কিন্তু মোহাম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীকে কেহ পাইল না। একবার কয়েকটী যুবক সওর গিরি-গুহার অতি কাছে আসিয়া পড়িল; তাহাদের অশ্বের দ্রুত পদধ্বনি, তাহাদের ব্যস্ত কণ্ঠের আওয়াজ আবুবকর শুনিতে পাইলেন। ভক্তের হৃদয় দ্রুত তালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই তো শত্রু আসিয়া পড়িয়াছে। আর বুঝি নবীর জীবন-রক্ষা হয় না! তিনি ব্যাকুল দৃষ্টিতে হজরতের দিকে চাহিলেন, বলিলেন: হজরত, কি উপায় হইবে, আমরা মাত্র দুইজন, আর উহারা সংখ্যায় কত অধিক! নবীর কিন্তু কোনো চিন্তা-ভাবনা নাই; তিনি ধীর কণ্ঠে বলিলেন: একি বলিতেছ আবুবকর, আমরা দুইজন মাত্র নই, আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন!

তিন দিন এইভাবে কাটিল। আবুবকরের পুত্র আবদুল্লা কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া গোপনে পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। আমের-বেন-ফোহায়্রা আবুবকরের মেষপালক ভৃত্য। রাত্রির অন্ধকারে সে-ই সওর গুহায় ছাগী-দুগ্ধ পৌছাইয়া দিত। আস্‌মার তৈরী আহারীয় এবং এই দুধ খাইয়া তাঁহাদের এ কয় দিন কাটিল।

এদিকে তিন দিন বৃথা অনুসন্ধানের পর পুরস্কারলোভী যুবকদল অনেকখানি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। হয়তো মোহাম্মদ ও আবুবকর তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া য়্যাস্‌রেব চলিয়া গিয়াছেন;—কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? এতোগুলি মানুষের সতর্ক চক্ষুকে প্রবঞ্চিত করিয়া একজন লোক কিরূপে

মরুভূমি পাড়ি দিতে পারে ? নানা সন্দেহে যুবকদের মন দোলায়িত হইতেছে ; কিন্তু ভাবনায় আর ফল কি ? তিন তিনটী দিন খুঁজিয়াও যাঁহাদের সন্ধান মিলিল না, তাঁহাদের জীবন্ত দেহ বা ছিন্ন মুণ্ড নদ্‌ওয়া-গৃহে আসিবে, ভরসা হয় না। কিন্তু এতো অভরসার ভিতরেও একশত উষ্ট্র-পুরস্কারের লোভ কতকগুলি হিংস্র আরবকে দূরপথের সন্ধানী করিয়া রাখিল।

তৃতীয় রজনীর প্রভাতে হজরত মোহাম্মদ ও আবুবকর সওর গুহা ছাড়িয়া আগেকার সেই দ্রুতগামী উট দুইটীতে সওয়ার হইলেন। সকলের চলা পথে য়্যাস্‌রেব-যাত্রা তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই তাঁহারা অজানা অচেনা পথ ধরিয়া চলিলেন। ঘুর মরুপথে প্রদর্শক ছাড়া বেশী দূর চলা সম্ভব নয়। আবুবকর পূর্ব্বেই এজন্য আবদুল্লা-বেন্‌-ওরায়্‌কাত-কে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই আবদুল্লা ও ভৃত্য আমের তাঁহাদের সঙ্গী হইল। নবী বার বার অশ্রুসিক্ত চোখে জন্মভূমি মক্কার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে তাঁহার শৈশবের, বাল্যের, যৌবনের কতো শত স্মৃতি আসিয়া ভিড় জমাইল। আদর, স্নেহ, প্রেম, অত্যাচার, নির্য্যাতন—সব-কিছু মিলিয়া মক্কার মাটীতে এক অপূর্ব্ব মায়া রচনা করিয়াছিল ; এইখানেই তাঁহার মন স্বতঃই মূল বিস্তার করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু তাহা হইল না। তাই ছিন্নমূল অন্তর তাঁহার আর্ত্তবেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল। তথাপি বিধাতার নির্দ্দেশ তিনি মানিয়া লইলেন! সত্যের পতাকা বহন করিয়া তিনি দূর প্রবাসে আপনার নীড় রচনা করিতে চলিলেন। লোহিত সাগরের উপকূল বাহিয়া য়্যাস্‌রেবের দীর্ঘ পথ প্রসারিত। এই পথ ধরিয়া নবীর উট, সঙ্গী আবুবকরের উট দ্রুত পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু আরবের রক্তপিপাসা তখনো তাঁহাদের পিছু ছাড়ে নাই। হজরত ও আবুবকর য়্যাস্‌রেব অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এ সংবাদ কোরেশেরা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছে। পথিপার্শ্বের সমস্ত গোত্রের মধ্যে তাহারা ঘোষণা

করিয়াছে সেই শত উষ্ট্র পুরস্কারের কথা। যে মোহাম্মদের জীবন্ত দেহ কিম্বা ছিন্ন মুণ্ড আনিবে, বীরত্বের যশ তাহার, এক শত উট বখ্‌শীশ তাহার। প্রতিমার শত্রু মোহাম্মদকে হত্যা করিতে হইবে, ইহা তো অতি সঙ্গত কার্য্য; ইহার উপর একশত উট পুরস্কার। সকলেই পথের দিকে চাহিয়া রহিল। সোরাকা সংবাদ পাইল দূরে মক্কার পলাতক যাত্রীদের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আর কথা কি! কাহারো অপেক্ষা না করিয়া—কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া সে একাই বাহির হইয়া পড়িল। মোহাম্মদকে হত্যা করিবার গৌরব—সঙ্গে সঙ্গে একশত উষ্ট্র সে একাকী অর্জ্জন করিবে!

বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সোরাকা ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। প্রস্তরাকীর্ণ বালুকাময় মরুপথ। সাবধানে না চলিলে এ-পথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। উৎসাহে উত্তেজনায় সোরাকার সে কথা স্মরণ নাই। অশ্ব তাহার দ্রুত গতিতে ছুটিয়াছে। হঠাৎ একখানি পাথরের ঘা খাইয়া সে পড়িয়া গেল। কুসংস্কারপীড়িত মন তাহার হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় বেশ খানিক দমিয়া গেলো। কেন এমন হইল? শঙ্কা-সন্দেহে তাহার চিত্ত দুলিয়া উঠিল। কিন্তু বীরত্বের গৌরব, পুরস্কারের প্রত্যাশা তখনো একেবারে নিবে নাই। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সোরাকা পুনর্ব্বার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; ঐ মোহাম্মদ চলিয়াছেন, ঐখানে গিয়াই তাঁহার শির লইতে হইবে! নবজাগ্রত আশা-বিশ্বাসে সোরাকার চক্ষু আবার জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার লেখা! কিছুদূর যাইতেই ঘোড়ার পিছনের দুই পা গভীর বালিতে পুতিয়া গেলো, তাহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। ভয়ে সোরাকার বুক কাঁপিয়া উঠিল। না, না, মোহাম্মদকে হত্যা করা হইবে না। তাহার জয় অনিবার্য্য! সোরাকা আর বিলম্ব করিল না; সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ছাড়িয়া হজরতের কাছে আসিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া আবুবকর বলিলেন: হজরত, আর রক্ষা নাই, ঐ

দেখুন সশস্ত্র শত্রু আমাদের ধরিয়া ফেলিল! নবীর মুখে উদ্বেগ আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। মুখে তাঁহার কোর্‌আনের ভাষা, বুকে তাঁহার অন্তহীন আশা, অন্তরে তাঁহার অপরিমেয় বিশ্বাস। তিনি বলিলেনঃ ভয় নাই আবুবকর, আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন!

সোরাকা হজরতের কাছে আসিলে তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; বলিলেনঃ কে, সোরাকা নাকি!

সোরাকা নবীকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল; তারপর তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া ইসলামের সত্য গ্রহণ করিল।

হজরত বলিলেনঃ সোরাকা, আজ হইতে তুমি আমার ভাই, এমন এক দিন আসিবে যেদিন পারস্যরাজ খসরুর গলহার তোমারই গলায় শোভা পাইবে।

সোরাকার মতো আরো একটী লোক য়্যাস্‌রেবের পথে হজরতের খোঁজে ফিরিতেছিল। আস্‌লম্ গোত্রের অধিনেতা বারিদা, সত্তর জন দুর্দ্ধর্ষ আরব তাহার সঙ্গী। মোহাম্মদের শির লইতে হইবে, তাহার কাছে ইহা তো এমন কিছু কঠিন কথা নয়। দূর হইতে পলাতক পথিকদের দেখিয়া তাহারা মার্‌ মার্‌ শব্দে ছুটিয়া আসিল। পশুপ্রকৃতি দস্যু আরবের চোখে লক্‌লক্ আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এইবার আর রক্ষা নাই! একদিকে নিরস্ত্র নিঃসহায় দুইটী পথিক—অন্যদিকে একাত্তর জন সশস্ত্র ঘাতক! আবুবকর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু হজরতের মুখে এই ভীষণ বিপদের মধ্যেও বিন্দু-মাত্র উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল না। তিনি প্রশান্তবদনে কোর্‌আনের আয়াত পাঠ করিতে লাগিলেন। কোর্‌আনের অপূর্ব্ব সুন্দর বাণী তাঁহার মধুস্রাবী কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আকাশ বাতাস মধুময় করিয়া তুলিল। দস্যু দলপতি বারিদা যতোই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততোই হজরতের আবেগমগ্ন কণ্ঠরব আশ্চর্য্য মধুরিমায় কাণের ভিতর দিয়া তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিল।

তাহার চরণদ্বয় ভারাক্রান্ত, বাহু-যুগল শিথিল হইয়া আসিল। অবশেষে বারিদা যখন হজরতের কাছে পৌছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রেমে পুণ্যে উদ্ভাসিত, অতলস্পর্শ বিশ্বাসের তেজে প্রদীপ্ত নবীর বদনমণ্ডল! দেখিয়া দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিল না। হজরতের হাতে হাত রাখিয়া সে তখনই ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহার সত্তর জন সঙ্গীও দীক্ষিত হইল। যাহারা আসিয়াছিল নবীর প্রাণ নিতে, তাহারাই তাঁহার সত্যে আত্মসমর্পণ করিল। বারিদা মাথার পাগড়ী বর্শাফলকে গাঁথিয়া উড়াইয়া দিল। সত্তরখানি নাঙ্গা তলোয়ার, সত্তরটী তূণীরমুক্ত তীর ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইল। ইসলামের জয়-পতাকা পত্‌পত্‌ শব্দে উড়িতে লাগিল। নিশানবরদার বারিদার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল সত্তরজন রক্ষী সৈনিক! হজরতের আগমন-সংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য বারিদা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল: বিশ্ববাসী, আনন্দ-সংবাদ শ্রবণ কর, শান্তির বার্ত্তাবহ আসিতেছেন, মুক্তির অধিনায়ক আসিতেছেন, সন্ধির স্থাপয়িতা আসিতেছেন, ন্যায়ে বিচারে ইনি দুনিয়ায় স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন!

মক্কা ত্যাগের পর তিন দিন গুহায় কাটিয়াছে; পথ চলিতে আরো পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে হজরত কোবা পল্লীতে পৌছিলেন। এটা য়্যাস্‌রেবের শহরতলী। নবীর আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। শত শত ভক্ত মুস্‌লিম আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। হজরত হাসিমুখে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি সঙ্গীদের লইয়া বনি আমের গোত্রের কুলসুম্‌-বিন্‌-হেদ্‌মের গৃহে অতিথি হইলেন।

ইতিমধ্যে আলী আসিয়া হজরতের সহিত মিলিত হইলেন। হজরতের মক্কা ত্যাগের পর কোরেশেরা তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালাইয়াছিল,

কিন্তু মূল শিকার হাত ছাড়া হইয়াছে দেখিয়া শেষে তাহারা আলীকে ছাড়িয়া দেয়!

চৌদ্দ দিন হজরত কোবায় রহিয়া গেলেন। এখানেই ইসলামের প্রথম উপাসনা-গৃহ—মস্‌জিদ—নির্ম্মিত হইল। ভক্ত মুস্‌লিমেরা পাথর বহিয়া আনিলেন; হজরতও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পাথর বহিলেন—সামান্য কুলি মজুরের মতো। ইসলামে মানুষে মানুষে ভেদ নাই, গুরু শিষ্যে তফাৎ নাই। তাই যিনি হইলেন আল্লার রসুল,—সত্যের বাহন পয়গম্বর, তিনি মসজিদ রচনার শ্রম স্বয়ং স্বীকার করিলেন। আশপাশের দূর দূরান্তরের লোকেরা মক্কার নবীকে—য়্যাস্‌রেবের নবাগত শাসনকর্ত্তাকে দেখিতে আসিল। আসিয়া তাহারা দেখিল: কে নবী, কে ভক্ত শিষ্য, চিনিবার উপায় নাই। সকলেই মানুষ, সকলেই সমান। মানুষের মঙ্গল করিতে যিনি আসিলেন, বিশ্বের পাপান্ধকার দূ'র করিবার গুরুভার লইয়া যিনি আবির্ভূত হইলেন, তিনি—সেই সত্যবাহন মাহামানুস্র প্রস্তর বহন করিতেছেন। যে দেখিল সেই বিস্ময় মানিল; ভক্তির বন্যায় দর্শকের অন্তর প্লাবিত হইয়া গেলো।

চৌদ্দ দিনের পর হজরত য়্যাস্‌রেব যাত্রা করিলেন। নগরের অধিবাসীরা তলোয়ার ঝুলাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইল। দীর্ঘ দিনের পর নবী মোহাম্মদ য়্যাস্‌রেবে আসিতেছেন। বাসিন্দারা আনন্দে উৎসাহে আজ আত্মহারা। নরনারী, বালকবৃদ্ধ, কেহ আজ ঘরে বসিয়া নাই। দেখিতে দেখিতে হজরত বনি-সালেম গোত্রের পল্লীতে আসিয়া পড়িলেন। সেদিন শুক্রবার—মুস্‌লিমের জুমা' নামাজের দিন। এখানেই হজরত শিষ্যদের সঙ্গে প্রথম জুমা'র নামাজ পড়িলেন।

নামাজের পর হজরত নগরাভিমুখে চলিলেন। শত শত মুসলিম দক্ষিণে বামে, অগ্রে পশ্চাতে কাতার বাঁধিয়া চলিয়াছেন। নগরের ছাদগুলি নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে! স্থানে স্থানে লাঠি খেলার ধূম

লাগিয়াছে। আরবীয় ঢোলক—দফের বাজনায় চারিদিকে পুলক শিহরণ জাগিয়াছে। পুর-মহিলারা গান ধরিয়াছেন: চাঁদ উঠিয়াছে, অস্ত-গিরির ফাঁকে ফাঁকে ঐ যে সে চাঁদ! ধন্য হে আল্লা, প্রশংসা তোমার অনন্ত! স্বাগত হে মহামানুষ, তুমি আজ অনুরক্ত ভক্তদের মাঝে আসিয়াছ! স্বাগত, স্বাগত!

হজরতের উট—কাস্‌ওয়া—বনু নজ্জার বংশের পল্লীতে আসিয়া শুইয়া পড়িল। বনু-নজ্জার আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বংশ। হজরত উট হইতে নামিয়া আবু-আইউবের গৃহে আশ্রয় নিলেন। আবু-আইউব নবীকে পাইয়া আপনার মনে ধন্য মানিলেন।

আজ হইতে য়্যাসরেব হইল মদীনাতুন্নবী—নবীর মদীনা—নবীর শহর—সংক্ষেপে মদীনা। মদীনার মুসলিম দল নবীর কাজে আপনাদের বিলাইয়া দিলেন। প্রেম পুণ্যে—ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে তাঁহাদের চিত্ত অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা সত্যের সেবায় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চিরপ্রবাস বরণ করিলেন, সেই মোহাজিরিন দল হইলেন মদীনার লোকের আত্মীয়ের অধিক ভাই। প্রাণ দিয়া, ধন সম্পত্তি দিয়া তাঁহারা মোহাজিরিনদের করিলেন বন্ধুর অধিক বন্ধু। তাই মদীনাবাসীর আখ্যা হইল আন্‌সার্—সাহায্যকারী। আনসার ও মোহাজিরিন মিলিয়া হইল মদীনার মুস্‌লিম সমাজ। এই সমাজের বন্ধু, উপদেষ্টা ও অধিনেতা হইলেন হজরত মোহাম্মদ। তিনি আজ আর নিঃসহায়, নির্য্যাতিত, নবী মাত্র নন—তিনি সংস্কারক, তিনি বিচারক, তিনি ব্যবস্থাদাতা, তিনি সেনাপতি, তিনি অধিনায়ক, তিনি রাজা। শত শত সশস্ত্র সৈনিক আজ তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র

মক্কা হইতে হজরত মোহাম্মদের য়্যাস্‌রেব গমনের ব্যাপারটীকে ইস্‌লামের ইতিহাসে হিজরত্ বলা হয়। হিজরতের সময় হইতে আরবীয় প্রথা অনুসারে চান্দ্র মাসের হিসাবে হিজরী সাল গণনা শুরু হইল। হিজরীর প্রথম বৎসরেই নবীনগর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণ-কেন্দ্র রচিত হইয়া গেল। যাঁহারা মক্কা ত্যাগ করিয়া হজরতের সহিত চিরপ্রবাস বরণ করিলেন, তাঁহারা হইলেন মোহাজিরিন বা মোহাজের দল; মদীনার বাসিন্দা মুস্‌লিমেরা --যাঁহারা মোহাজেরদের আশ্রয় দিলেন, তাঁহারা আনসার বা সাহায্যকারী। হজরতের প্রথম প্রচেষ্টা হইল মদীনায় একটি মসজিদ রচনা—যে সত্যের জন্য তিনি স্বদেশ স্বজন ত্যাগ করিয়া পরকে ভাই মানিলেন তাহার উপাসনার জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। এই কার্য্যের পর মোহাজের ও আনসারদের সম্বন্ধে একটী সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। এতোদিন মোহাজের দল ছিলেন আনসারগণের অতিথি। কিন্তু চিরদিন এইভাবে চলে না। তাই হজরত তাঁহাদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের মতোই গভীর ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কোর্‌আন বলিল: এক মুস্‌লিম অপর মুস্‌লিমের ভাই। হজরত বলিলেন: মোহাজের ও আন্‌সার আজ হইতে পরস্পরের ভাই—সহোদরের অধিক ভাই। মদীনাবাসী আনসারগণ আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-দুয়ার, পশু-পক্ষী সমস্তের অর্দ্ধেক ভাগ মোহাজেরদের দিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, মদীনার লোকেরা কৃষি-জীবী, শিল্পী; তাঁহারা আনসারদের কৃষিকর্ম্মের, শিল্প-দ্রব্য তৈরীর ভার লইলেন। মক্কার মোহাজের দল নিপুণ ব্যবসায়ী; তাঁহারা মদীনাবাসীর

ক্রয় বিক্রয়ের কাজে—ক্ষুদ্র বৃহৎ বাণিজ্যের ব্যাপারে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া জীবিকা সংগ্রহে মন দিলেন। এইভাবে মদীনায় বিশ্বব্যাপী মুস্‌লিম সমাজের প্রথম সূচনা হইল। মদীনার বাসিন্দা ও প্রবাসী মুস্‌লিম দল মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। কে ক্ষুদ্র কে মহৎ, কে ইতর কে অভিজাত, সে চিন্তা চিরদিনের জন্য সকলে বিস্মৃত হইলেন। সবাই একই আল্লার সৃষ্ট, সকলেই এক রব্বুল্ আ'লামিনের দাসানুদাস, সমস্ত মানুষ সমানভাবে তাঁহারই ইচ্ছার বুদ্বুদ—এই কথাই আজ মুস্‌লিমের অন্তর প্লাবিত করিল।

মদীনায় মসজিদ নির্মিত হইবার পর সেইখানেই নামাজ শুরু হইয়া গেল। দিন রাত্রির মধ্যে পাঁচবার নামাজ; কি ভাবে মুস্‌লিম দলকে সময় মতো মসজিদে আহ্বান করা হইবে, ইহাই হজরত ভাবিতে লাগিলেন। খৃষ্টানেরা ঘণ্টা বাজায়, ইহুদীরা শৃঙ্গধ্বনি করে, মাজুস্‌গণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে,—ইহার কোনোটাই হজরতের পছন্দ হইল না। তিনি বেলালকে বলিলেন মস্‌জিদে দাঁড়াইয়া অমূর্ত্ত আল্লার মহিমা, পবিত্রতা ও একত্ব ঘোষণা করিতে। নবীর আদেশে বেলালের মধুর কণ্ঠ দিনে রাতে পাঁচবার ধ্বনিত হইতে লাগিল: আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর—আল্লা বড়, আল্লা মহান্। আল্লার মহত্ত্ব ঘোষণা শুনিয়া মানুষ দুনিয়ার কাজ ছাড়িয়া মসজিদে সমবেত হয়, হজরতের সঙ্গে মিলিয়া বিশ্বপ্রভুর নামে শির অবনত করে। সম্মিলিত উপাসনার দৃশ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

এইভাবে সমাজের আভ্যন্তরীণ অনেক ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া গেল। হজরত এইবার মক্কায় পরিত্যক্ত পরিজনের কথা স্মরণ করিলেন। মসজিদের পাশে নবীর জন্য কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মিত হইল। বিবি সওদা, বিবি আয়েশা, অবিবাহিতা কন্যা ফাতেমা সবাই মদীনায় চলিয়া আসিলেন। ওমর, আবুবকর প্রভৃতি শিষ্য সহচরেরাও সপরিবারে মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গেলেন।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র

অতঃপর অমুসলিমদের দিকে হজরতের নজর পড়িল। মদীনায় অনেক ইহুদীর বাস। তাহারাও মুস্‌লিম দলের সঙ্গে মিলিয়া হজরতকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চিরসন্দিগ্ধ মন হজরতকে বরণ করিতে পারিল না। যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস: একজন নবী আসিয়া তাহাদের এই অপমানের ব্যথা দূর করিবেন; সম্মান-গৌরবে আবার তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে। মক্কার নবী মোহাম্মদ মদীনায় আসিতে চাহিলেন। তাহাদের পণ্ডিতেরা বলিলেন: ইনিই সেই নবী—সেই 'মেসিয়া' হইবেন! আশা আনন্দে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মদীনায় মুস্‌লিমদের সঙ্গে মিলিয়া হজরতকে তাহারা অভিবাদন করিল। কিন্তু তিনি এখানে আসিয়া সমাজের যে কাঠামো তৈরী করিলেন, মানুষে মানুষে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন, তাহা ইহুদীদের মনঃপুত হইল না। তাহাবা বংশ-গৌরবের পূজারী, সাম্যে তাহাদের সন্তুষ্টি হইল না। এই অসন্তোষ ক্রমে সন্দেহে, সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত হইল। তাহাদের ধর্ম্ম ও সমাজের পার্শ্বে এই যে নূতন ইসলাম-শক্তি লালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে ইহাতে তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু হজরত তাহাদের ডাকিয়া অভয় দিলেন। বলিলেন: তোমাদের কোনো আশঙ্কা নাই, তোমাদের ধর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। শুধু মুখের কথা মাত্র নয়, হজরত ইহুদী ও মুস্‌লিমদের সম্পর্ক নির্ণয় করিবেন একটী চার্টারে—একখানি সনন্দ-পত্রে। ইহুদী ছাড়া স্থানীয় পৌত্তলিকেরাও এই সনন্দের অন্তর্ভুক্ত হইল। হজরত মুস্‌লিম, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া নবসূচিত ইস্‌লামী রাষ্ট্রের ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিলেন। সকল সম্প্রদায়কে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তিময় জীবন-যাপনের অধিকার দিয়া তিনি তার পরিবর্ত্তে চাহিলেন শুধু মদীনার এই ইস্‌লামী সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য এবং তাহাদের আন্তরিক সদিচ্ছা।

হজরতের প্রদত্ত এই সনন্দ-পত্রখানি তাঁহার মহত্ব ও দূরদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইহার প্রধান প্রধান কথাগুলি এই :—

"বিস্‌মিল্লাহের্-রহ্‌মানের-রহিম"

"নবী মোহাম্মদ এই সনন্দ কোরেশ-বংশীয় ও য়্যাস্‌রেব-বাসী বিশ্বাসীদের (মুসলিমদের) এবং অন্যান্য যাহারা তাহাদের সহিত একতাবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের, দিলেন।"

"মুসলিম দল ও আর আর সবাই একই জাতির অন্তর্গত। শান্তি ও সংগ্রামে সকলে সমান অংশ গ্রহণ করিবেন। এই রাষ্ট্রের যাহারা শত্রু, ইস্‌লামের যাহারা বৈরী, কেহ তাহাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি বা সংগ্রাম করিতে পারিবে না, কিম্বা কোনোপ্রকারে তাহাদের সহায়তা দান করিবে না। মদীনা আক্রান্ত হইলে সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মীয় অধিকার পালন করিতে পারিবে, কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। কেহ অপরাধ করিলে সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সে-ই দায়ী হইবে (অর্থাৎ সেজন্য তাহার গোত্র বা সম্প্রদায়কে দায়ী করা হইবে না।) মুস্‌লিম ও আর আর সম্প্রদায়ের মিত্রজাতিরা সকলের মিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। মদীনায় রক্তপাত বা নরহত্যা নিষিদ্ধ হইল। শোণিত-পণ পূর্ব্বের ন্যায় বহাল রহিল। মোহাম্মদ রসুলুল্লা (আল্লার রসুল) এই যুক্ত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। ভবিষ্যতে যতো কিছু বিবাদ-বিসম্বাদ সমস্তই তিনি মীমাংসা করিবেন।"

এই সনন্দের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা খৃষ্টান ও জোরোস্ত্রীয়দেরও দান করা হইল। "নজরীন (নগ্রিন) ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের খৃষ্টানদের ধর্ম্ম, জীবন ও ধনসম্পত্তি আল্লার সংরক্ষণ ও রসুলুল্লার শান্তি-শপথের অন্তর্গত করা হইল। কেহ

তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তাক্ষেপ করিবে না। তাহাদের স্বত্ব বা অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। তাহাদের প্রতিমা বা ক্রস্ কেহ ধ্বংস করিবে না। তাহারা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না, তাহাদের প্রতিও কেহ কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না। অজ্ঞতার যুগে (অর্থাৎ ইসলাম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে) রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণের যে প্রথা ছিল, তাহা রহিত করা হইল।"

অগ্নি-পূজারীদের প্রধান পুরোহিতকে হজরত লিখিলেন: "ফারুরুখ্-ইবনে শাক্সান, তাঁহার পরিবারবর্গ এবং অমুস্লিম মুসলিম নির্ব্বিশেষে তাঁহার ভাবী বংশধরদের প্রতি মোহাম্মদ রসুলুল্লার এই পত্র:—তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি আল্লার রক্ষণাধীন। তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার বা উৎপীড়ন করা হইবে না। যে সকল মুস্লিম আমার এই পত্র পাঠ করিবে, নিশ্চয় তাহাদের রক্ষা করিবে। অগ্নিমন্দির ও তাহার সংস্পৃষ্ট সম্পত্তিতে তাহাদের অবাধ অধিকার রহিল। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে তাহাদের চক্ষে যাহা পবিত্র, তাহার ভোগ-অধিকার কেহ ক্ষুণ্ণ করিবে না।"

হজরতের এই উদার নীতির তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। পরমত-সহিষ্ণুতা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ। "প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বিধান, স্বতন্ত্র পথ।.........যদি আল্লার ইচ্ছা হইত, তিনি সকল মানুষকে এক জাতির অন্তর্গত করিয়া সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ।" কোর্-আনের এই উক্তি। এই বাণীর বাহন রসুলুল্লা। তিনি কেমন করিয়া অন্যের অধিকার কাড়িয়া লইবেন, পরধর্ম্মীর উপর উৎপীড়ন সমর্থন করিবেন? তিনি আসিয়াছেন বিশ্বের ত্রাণরূপে; মানুষের প্রতি আল্লার নিঃসীম করুণার প্রতীক রহমতুল্-লিল্-আ'লামিন্‌রূপে। তিনি কিরূপে মানুষের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার অনুমোদন করিবেন? "ধর্ম্মীর ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নাই।"—ধর্ম্ম স্বাধীনতার এই মনোহর বিধি

কোর্‌আনের। হজরতের মুখ দিয়া মানুষের মুক্তির এই বিধান বার বার উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম ইস্‌লাম তরবারির বলে প্রচারিত হয় নাই, আপনার উদার সৌন্দর্য্যে সে মানুষের মনকে মুগ্ধ করিয়াছে। হজরত ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করিতে গিয়া তাই মানুষকে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান ও বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, তাহার বদলে শুধু চাহিলেন নবরচিত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, মানুষের প্রতি মানুষের হিংস্র ব্যবহারের বিলোপ সাধন।

এইরূপ উদার ভিত্তির উপর হজরত ইস্‌লামী রাষ্ট্র-গঠনের শুভ সূচনা করিলেন। ইহার সমাজ-ব্যবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সুরাপান, জুয়াখেলা, শূকরমাংসভক্ষণ, কুসীদজীবীর পরগ্রাসী জীবন সমস্তই নিষিদ্ধ হইয়া গেলো। মানুষে মানুষে সদয় ব্যবহার, সত্যরক্ষা, বাণিজ্যে সাধুতা, প্রতিবেশী-ধর্ম্ম, যৌনপবিত্রতা প্রভৃতি লালনের জন্যে সমাজের বুকে স্থান রচনা করা হইল। হজরত বুঝাইয়া দিলেন: সৎ ও মহৎ, সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন মুস্‌লিমের একমাত্র লক্ষ্য। ইস্‌লাম মানুষকে কর্ত্তব্যে কঠোর হইতে বলে; প্রেমে পুণ্যে মহান্ হইতে বলে; সত্যসাধনায় অজেয় হইতে বলে। মুস্‌লিম যখন উচ্চারণ করে: লা-এলাহা ইল্লাল্লা; তাহার নবধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র যখন তাহার মুখ দিয়া বাহির হয়; জগতের যতো-কিছু শঙ্কা-ভীতি, মায়া-প্রলোভন সমস্তই তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। ভয়ের ভ্রূকুটী, স্বার্থনাশের আশঙ্কা, মায়ার আকর্ষণ, আপাত-সুন্দর ছলনা মানুষকে ঊর্দ্ধ হইতে টানিয়া আনে, পথের ধূলার সঙ্গে তাহাকে অবহেলে মিশাইয়া দেয়। কিন্তু মুস্‌লিম্ একমাত্র সত্য ছাড়া আর কিছুকেই গ্রাহ্য করে না, আর কিছুকেই আপনার অন্তরের আনুগত্য দান করে না। তাই সে অকুতোভয়ে উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া বলে: অনন্ত সত্যের উৎস আল্লা ছাড়া আমার উপাস্য কেহ নাই; শুধু তাঁহারই কাছে শির অবনত করি, বিনত দেহে প্রণতি

জানাই। আল্লার যাহা সৃষ্টি, বিশ্বের যাহা পরিচয়, সকলের আমি রাজা। আমারই ভোগের জন্য স্রষ্টার এই অন্তহীন রচনা। বিশ্বের অণু-পরমাণু মানুষের দৃষ্টির ভিখারী, তাহার জ্ঞানের অভিসারী। আপনার অন্তরের মধু নিঙাড়িয়া মানুষকে উপহার দিয়াই তাহার সার্থকতা। তাই মুস্‌লিম্ ভোগী; বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে তাহার নয়। মানুষের বাসনা-কামনা, মানুষের ভোগ-লালসা, মানুষের সহজ প্রাণী-বৃত্তি—এগুলিকে হত্যা করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। তাই ইস্‌লাম এ সবের নিবৃত্তি কামনা করে না, শুধু সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। জগতে সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ—শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই সংযত ভোগ-বাসনার সৃষ্টি। মুস্‌লিম জাতি বিশ্বের বুকে একদিন যে অপূর্ব্ব সভ্যতার জন্ম দিয়াছিল, সে ইসলামের এই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পুণ্যফলে। হজরতের শিক্ষা-সাহচর্য্যে মুসলিমের এই দৃষ্টি খুলিয়া গেলো; মানুষের ভবিষ্যৎ এক শুভ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপেক্ষিত, অবহেলিত নারীকে তিনি অধিকার দিলেন। যাহারা ছিল নরের কামনার সামগ্রী, তাহাদের হাত ধরিয়া তিনি মানুষের আসনে বসাইলেন। স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার দিলেন। স্বামীর ঘরে—পিতার গৃহে তাহার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেন। নারীর চরিত্রের কেহ অযথা দোষারোপ করিলে তাহার গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। কন্যাহত্যা, নরহত্যা, মাতাপিতৃহীনকে প্রবঞ্চনা, অধমর্ণকে উৎপীড়ন, উত্তমর্ণকে প্রতারণা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। আহার্য্য বিচার করিয়া তিনি রক্ত, শূকর-মাংস প্রভৃতিকে মুস্‌লিমের অখাদ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যৌন-ব্যভিচার মানুষের ঘৃণ্য করিয়া তুলিলেন। রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে যাহাতে সে পুণ্যপবিত্র শান্তিময় কিন্তু নির্ভীক স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারে, কপটতা ও মিথ্যাচরণ হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়া

কুটিলতার কণ্টক-বনে সহজ সরল স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারে, হজরত মোহাম্মদ তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার নব গঠিত রাষ্ট্রের প্রভাব যাহাতে মদীনার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ওদ্দান, বোওয়াত, জুল্‌ওশায়রা প্রভৃতি নানাস্থানে বেড়াইয়া আসিলেন। যেদিকে যতগুলি জাতি বা বংশ দেখিতে পাইলেন, মদীনার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিলেন।

মোটের উপর, হজরত চাহিলেন অশান্তি যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার, অনাচার দেশ হইতে তুলিয়া দিয়া উন্নত মানুষেব এক সম্মিলিত সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে। কিন্তু মদীনায় আসিয়াও সুখভোগ তাহার অদৃষ্টে ছিল না। মদিনার মোনাফেক বা কপটগণের কুটিলতা, ইহুদীদের হীন ষড়যন্ত্র মক্কার কোরেশদিগেব হিংসাবিদ্বেষ ও প্ররোচনায় শক্তিমান হইয়া শিশু-রাষ্ট্রকে শীঘ্রই বিপন্ন করিয়া তুলিল।

মক্কার কোরেশদল হজরত ও তাহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। মদীনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হজরত এই অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, এই আশঙ্কা তাহাদের মনে অবিরত কার্য্য করিতে লাগিল। মক্কার বণিকেরা সিরিয়ায় বাণিজ্য করিয়া থাকে, সেখানকার ফল শস্যই তাহাদের জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু মক্কা হইতে সিরিয়ার পথে—মদীনায়—ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। মক্কীয়দের বাণিজ্য ও খাদ্যসংগ্রহের পথ রুদ্ধ করা হজরতের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং মদীনার শিশু-রাষ্ট্রকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করাই কোরেশদের স্বার্থ-রক্ষার—আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু হজরত তাঁহার নব-আবাসে যে সংঘ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বাঁধন শিথিল করিতে না পারিলে কোরেশদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। তাই তাহারা মদীনার ও

শহরতলীর পৌত্তলিকদের পত্র দিয়া,—দূত পাঠাইয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল।

ইহুদীদের কুটিলতা ও অবিশ্বস্ততা কোরেশদের পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইল। মদীনার রসুল-রাজা যখন মক্কা হইতে প্রথম আসিলেন, ইহুদীরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কিন্তু এক বছরের ভিতরেই তাহারা বুঝিতে পারিল: মোহাম্মদ ইহুদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আরবভূমে জুডীয় ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইবেন না। তাহারা ইহাও দেখিল যে, হজরত আভিজাত্য ও কৌলিন্যের ভিত্তিমূল ছিন্ন করিয়া মানুষকে সাম্য ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দান করিতেছেন। আভিজাত্যের উপাসক ইহুদীদের ইহা অসহ্য। কিন্তু এর চেয়েও অসহনীয় বোধ হইল নবীর আর একটী কার্য্য। মদীনায় ইহুদী বাসিন্দারাই ধনেমানে, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে ছিল সেখানকার সমাজ-জীবনের শীর্ষস্থানে। ইহার দুইটী কারণ: প্রথমতঃ ইহুদীরা ছিল কুসীদজীবী; অতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করিয়া তাহারা প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছিল, মদীনার অধিকাংশ লোকই ছিল তাহাদের খাতক। দ্বিতীয়তঃ, ইহুদীরাই ছিল মদীনীয় সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়। সুতরাং তাহারাই সমাজের স্বাভাবিক নেতা। এই নেতৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার পক্ষে একটী চমৎকার সুযোগও তাহাদের মিলিয়া গিয়াছিল। মদীনার দুইটী প্রধান বংশ—আওস্ ও খজ্রজ্। ইহাদের মধ্যে সারাটী বছর কলহ, বিবাদ, রক্তপাত একরূপ লাগিয়াই ছিল। ইহুদীরা দুই বংশের একটাকে অপরের পশ্চাতে লেলাইয়া দিত। উভয়ের এইরূপ অনৈক্য ও দুর্ব্বলতার অবসরে ইহুদীদের সম্মানিত আসন উঁচুই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হজরত রসুলুল্লা মদীনায় সুদের আদান প্রদান নিষেধ করিলেন, সাধারণকে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন, মানুষে মানুষে বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া একে অপরের ভাই করিয়া তুলিলেন। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন কাঁপিয়া উঠিল। স্বভাবতঃ শঠ,

ক্রূর ও হিংসাপরায়ণ ইহুদী হজরতের উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য বন্ধু খুঁজিতে লাগিল।

মদীনায় একদল পৌত্তলিক হজরতের শুভাগমনের পর নানারূপ স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হজরতের স্বচ্ছ সাধুতার সম্মুখে তাহাদের লাভ-লালসা পথ হারাইয়া ফেলিল। আবদুল্লা-বেন-উবাই পৌত্তলিকদের প্রধান—চতুর, কৌশলী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। হজরতের অসাধারণ চরিত্র ও প্রতিপত্তির সুযোগ লইয়া সে মদীনায় রাজা হইয়া বসিবে, এই ছিল তাহার অন্তরের গোপন আশা। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তির রাজত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং হজরতও তাহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। আবদুল্লা চটিয়া গেলো, তাহার দল-বল মনে মনে রুখিয়া দাঁড়াইল। এইরূপ আরো অনেক কপট মুসলিম মদীনার রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইহারাই হইল মোনাফেক দল।

মোনাফেক ও ইহুদীদের কাছে মক্কার কোরেশগণ অবিরত দূত পাঠাইতে লাগিল। শিশু-রাষ্ট্রকে হত্যা করিবার জন্য চারিদিকে অস্ত্র শাণিত হইল। হজরত কোরেশদের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; মোনাফেক ও ইহুদীদের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধির প্রতিও তাহার সাবধান সতর্ক দৃষ্টি জাগিয়া ছিল। মদীনার ইহুদী ও মোনাফেক দল বিদ্রোহ করিবে, পার্শ্ববর্ত্তী গোত্রগুলি বাহির হইতে মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাইবে, আর ভিতর বাহিরের এই চূড়ান্ত বিপদ-মুহূর্ত্তে কোরেশ-বাহিনী মোহাম্মদের নবলব্ধ শক্তিকে বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিবে—ইহাই ছিল মক্কীয়দের মনের মতলব। কিন্তু রসুলুল্লার রাজনৈতিক প্রতিভা কোরেশদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি মক্কীয় কোরেশদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাইয়া দিলেন। মক্কা-মদীনার মধ্যবর্ত্তী জনপদগুলির কয়েকটী শক্তিমান গোত্রের সহিত সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুই

তিনটী দূত-সংঘ (ডেপুটেশন) প্রেরণ করিলেন। আদ্দানের বনু-জোমরা, জুল্-ওশায়্রার বনি-মুদ্লেজ এবং বোওয়াতের অন্য একটী গোত্রের সহিত মদীনার সন্ধি স্থাপিত হইল। কথা হইল: এক পক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ করিবে না, একে অপরের শত্রুকে কোনো রকমে সাহায্য করিবে না। এতো সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও হজরত কোরেশদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। হিজরতের মোটামুটী এক বৎসর পরে মক্কার একজন দলপতি—কুর্জ্-বেন্-জাবের—বহু সৈন্য লইয়া মদীনার মাঠে হাম্লা করিল; জমির ফসল নষ্ট করিয়া দিল এবং শত শত উট, দুম্বা, বক্রী অপহরণ করিয়া চলিয়া গেলো। সংবাদ মদীনায় পৌছিতেই হজরত রসুলুল্লা একদল মুসলিম সঙ্গে লইয়া শত্রুর পিছু লইলেন; কিন্তু কুর্জ্ তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, মুস্‌লিম প্রহরীরা অনেক খোঁজাখুজি করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না।

এই ব্যাপারে হজরত আরো সতর্ক হইয়া পড়িলেন। শিশু-রাষ্ট্রের ভিতরে বাহিরে শত্রু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; কোরেশদের ষড়যন্ত্রে সেই ধূমায়িত বিদ্রোহের আগুন যে-কোনো মুহূর্ত্তে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিতে পারে। ইতিমধ্যে মক্কা হইতে সংবাদ আসিল: কোরেশেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। খবর শুনিয়াই হজরত আবদুল্লা-বেন্-জাহ্শকে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। নয়জন মাত্র মুস্‌লিম তাঁহার সঙ্গী। মক্কা ও তায়েফের মধ্যে নাখলা নামক স্থান, মক্কারি খুব কাছাকাছি। এইখানে গিয়া গোপনে কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভার তাঁহাদের উপর। হিংসাপাগল রক্তলোলুপ কোরেশদের আড্ডার এতো কাছে গিয়া গুপ্ত সন্ধানীর কাজ বড়ো সহজ নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজে মুস্‌লিম প্রাণের মায়া করে না, ইস্‌লামকে রক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যুর ভয়ে সে পিছাইয়া আসে না। তাই মদীনায় প্রবাসী হইয়াও আবদুল্লা জীবনের মায়া ছাড়িয়া দুশ্‌মনের দেশে চলিলেন।

একদিন হঠাৎ এই গুপ্ত সন্ধানীদলের সহিত একটী ক্ষুদ্র কোরেশ ক্যারাভান বা কাফেলার দেখা হইয়া গেলো। আম্‌র্‌-বেন্‌-হাজ্‌রামী, হাকাম-বেন-কাইসান ওস্‌মান-বেন্‌-আবদুল্লা প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিরা এই বণিকদলের সহযাত্রী। তাহারা সহসা মুসলিম গুপ্তচরদের দেখা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মুস্‌লিম দলও হঠাৎ শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একজন মুস্‌লিম—ওয়াকেদ-বেন-আবদুল্লা—আম্‌র্‌-বেন হাজরামীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন, হাজরামীর প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল ; মক্কীয় বণিকেরা সংখ্যায় সাত জনের কম নয় ; মুস্‌লিম পক্ষে মাত্র ছয় জন—বাকী চার জন অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারা ইচ্ছা করিলে মদীনার গুপ্ত সন্ধানীদের উপর বেশ এক হাত লইতে পারিত। কিন্তু মুস্‌লিম গুপ্তচরেরা মক্কার এতো কাছে পাহারা দিতে আসিয়াছে, এ বড়ো বিষম দুঃসাহস। তাহাদের এই ভীষণ সাহস ও ব্যাপারটীর আকস্মিকতা মক্কীয়দের হতবুদ্ধি ও নিশ্চেষ্ট করিয়া দিল। আবদুল্লা-বেন্‌-জাহ্‌শ্‌ ও তাহার সঙ্গীরা দুইজন কোরেশকে বন্দী করিয়া আনিল। বাকী কোরেশগুলি বাণিজ্যসম্ভার ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

গুপ্তসন্ধানী আবদুল্লা ও তাহার সঙ্গীরা উত্তেজনার মুখে একজন কোরেশকে হত্যা, দুইজনকে বন্দী করিয়াছেন, কোরেশদের পরিত্যক্ত বাণিজ্য-দ্রব্য মদীনায় আনিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচরেরা ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতো সব কাণ্ড করিবার ভার নিশ্চয়ই আবদুল্লাকে দেওয়া হয় নাই। হজরত তাঁহাকে এজন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

ইতিমধ্যে মক্কীয়েরা বন্দীদের মুক্তির জন্য দূত পাঠাইয়া দিল। ওস্‌মান মুক্তি পাইয়া চলিয়া গেলেন। হাকাম হজরতের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম কবুল করিলেন ; তিনি আর মক্কায় ফিরিলেন না।

রাষ্ট্রপতি ও যুদ্ধনায়ক

কোরেশগণ মদীনায় হজরত মোহাম্মদের রাষ্ট্র-রচনার সংবাদে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান পাঠাইয়া মুস্‌লিমদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করিলে তাঁহারা জব্দ হইবেন না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। চাই যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ—এমন যুদ্ধ যাহার প্রবলতায়, দুর্দ্ধর্ষতায় মুস্‌লিমদল শুধু পরাজিত নয়, একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। মক্কার অন্যতম প্রধান দলপতি আবুজেহেল মক্কীগদের ক্রমাগত উত্তেজনা দিতে লাগিল। কবিরা গাথা গাহিয়া সমস্ত নরনারীকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিল। হাজ্‌রমীকে মুস্‌লিমেরা হত্যা করিয়াছে; ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। মোহাম্মদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মক্কার অধিবাসীদের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইতে আসিবে; তাহার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিতে হইবে। মক্কায় কি প্রাণ নাই, তেজ নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই যে, মোহাম্মদকে ধ্বংস না করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে? কখনই নয়, কখনই নয়। মদীনার কপট মুস্‌লিমেরা তাহাদের সহায়; ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাহাদের পৃষ্ঠগামী; পার্শ্ববর্ত্তী গোত্রগুলি তাহাদের বন্ধু। এমন সুযোগ হেলায় হারানো চলে না। ইস্‌লামের শিশুরাষ্ট্রের কণ্ঠরোধ করিবার এই উপযুক্ত অবসর। উঠ, জাগো মক্কার নরনারী, নবনাস্তিকতার প্রচারক মোহাম্মদকে সদল বলে আমরা হত্যা করিব, তাহাদের তপ্ত শোণিতে বসন রাঙাইয়া আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়াইব! আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্মের অবমাননার এই যোগ্য প্রতিশোধ!

চারিদিকে উত্তেজনার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা

চাই, হাতিয়ার চাই, অস্ত্র-শস্ত্র চাই, রসদপত্র চাই। সিরিয়া হইতে এসব এখনই আনিতে হইবে। কিন্তু এজন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। একাকী কে এতো অর্থ ব্যয় করিবে? চারিদিক হইতে চাঁদা আসিতে লাগিল। যে যতো পারিল, অর্থ দান করিল। নারীরা দেহের অলঙ্কার খুলিয়া দিল। রতি মাষা পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য যাহার কাছে যাহা ছিল, সমস্তই যুদ্ধ-তহবিলে আসিয়া জমিল। আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা এক হাজার উট লইয়া সিরিয়া যাত্রা করিল। তাহাদের সঙ্গে রহিল পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। এই অর্থ দিয়া যুদ্ধের মাল-মসলা সংগ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

হজরত যথা সময়ে এ সংবাদ জানিতে পারিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি আবু-সুফিয়ানের কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য সন্ধানীদল পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যে খবর লইয়া ফিরিলেন, তাহাতে মদীনার অনেক মুস্‌লিমের মুখ শুকাইয়া গেলো! আবু-সুফিয়ান এক হাজার উটের বোঝাই যুদ্ধ-সম্ভার লইয়া মক্কায় ফিরিতেছে। ওদিকে আবিসিনিয়ার দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা—হাব্‌শীরাও অর্থের বিনিময়ে মুসলিমদের সঙ্গে লড়িতে আসিতেছে। অতএব সাবধান, মদীনাবাসী, সাবধান!

হজরত রসুল এতোদিন এই সন্দেহ করিতেছিলেন। মক্কার পৌত্তলিক-দল ইসলামকে ধ্বংস্ করিবার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা তাহার অজানা ছিল না। কিন্তু ঠিক কবে তাহারা আক্রমণ করিবে, তাহারই সন্ধানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আজ আর কোনো ভাবনা নাই। যতো শক্তি লইয়াই মক্কীয়েরা অগ্রসর হোক, তাহাদের সম্মুখীন হইয়া আল্লার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি সকল মুস্‌লিমকে আল্লার পথে লড়িবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে কেহ সাড়া দিল, কেহ বা দিল না। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিরাট মক্কীয় বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া নিশ্চিত মরণ বরণ করিবার সাহস সকলের হইল না!

রাষ্ট্রপতি ও যুদ্ধনায়ক

ইহুদী-খৃষ্টানেরাও সন্ধির শর্ত ভাঙ্গিয়া বসিল! মদীনার শত্রুকে তাহারা শত্রু ভাবিয়া লড়িবে—এই ছিল তাহাদের প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা এই বিপদ-মুহূর্তে তাহারা ভুলিয়া গেলো। কিন্তু হজরত নবী অটল অচল। মক্কার বাহিনী যতো অস্ত্রশস্ত্র, যতো সৈন্য-শক্তি নিয়াই আসুক, যুদ্ধ অনিবার্য্য। নিপুণ সেনাপতির মতো তিনি শত্রুপক্ষের অগ্রগতিতে বাধা দিতে চলিলেন। মদীনায় কোনো কোনো লোক বলিয়াছিলেন: আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুঠিয়া লওয়া হোক! কোঁরেশেরা মুসলিমদের সঙ্গে যে শত্রু-সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, তাহাতে রণ-সম্ভার লুঠিয়া নিলে এমন-যে কিছু অন্যায় হইত, তাহা নয়। কিন্তু হজরত তাহাতে রাজী হইলেন না। মদীনার কতকগুলি লোক ভাবিল: হজরত কোরেশদের পঙ্গু করিবার সহজ পথ ছাড়িয়া যুদ্ধের ভীষণতার ও সুনিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে তাঁহাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাই তাঁহারা যুদ্ধে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হজরত মানুষের মনকে জানিতেন, তিনি ভীরুদের যোদ্ধদলে আহ্বান করিলেন না। ইস্‌লামের জন্য যাহারা স্বেচ্ছায় জীবন দান করিতে প্রস্তুত, এমন তিনশত তেরো জন মাত্র বিশ্বস্ত সহচরকে লইয়া তিনি শত্রুর সহিত লড়াই করিতে চলিলেন।

শত্রুদল মক্কা হইতে বাহির হইয়াছে। বিশ্রামের একটুও অবসর নাই। বন্ধুহীন বন্ধুর পথে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী দিন রাত্রি শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত গতিতে চলিবার পর তাঁহারা কতকগুলি কূয়ার কাছে আসিয়া থামিলেন। জলহীন মরুর দেশে কূয়া যাহাদের অধিকারে, তাহাদের সুবিধা বড়ো অল্প নয়। তাই হজরত কূপগুলি দখল করিয়া বসিলেন। মক্কার প্রধান সেনাপতি আবু-জেহেল একশত অশ্বসাদী সৈন্য—নয় শত সুসজ্জিত পদাতিক লইয়া আসিল। কিন্তু একি ব্যাপার! কূপগুলি মুসলিম দল দখল করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তো

সুবিধার কথা নয়। আবু-সুফিয়ান, ওলিদ প্রভৃতি সামরিক নেতারা হাসিয়া বলিল ঃ ও আর কি এমন গুরুতর কথা! দেখিতেছ না মুস্‌লিম দলে কতো অল্প সৈন্য, উহারা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে কতোক্ষণ টিকিয়া থাকিবে?

মক্কীয় নেতাদের কথা কিছু অসঙ্গত নয়। একদিকে মাত্র তিনশত তেরোজন মুস্‌লিম সেবক; তাঁহাদের মধ্যে একটীমাত্র অশ্বারোহী সৈন্য। পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়া তাঁহারা লড়াই করিতে আসিয়াছেন! কিন্তু অন্যদিকে এক সহস্র সৈন্য; নবতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। আল্লার আলো নিবাইয়া দিবার জন্য তাহারা ভীষণ পণ করিয়া আসিয়াছে। এ যুদ্ধের ফলাফল বিচার কঠিন কাজ নয়। কোরেশ দল হাসিয়া বলিল ঃ নিতান্তই ইহারা প্রাণ দিতে আসিয়াছে!

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর। রমজানের ১৭ই তারিখ শুক্রবার। উষার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মুস্‌লিম কণ্ঠে আজানের প্রাণশিহরণ আহ্বান-বাণী ধ্বনিত হইল। নামাজের পর হজরত শিষ্যদের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিয়া ব্যূহরচনা করিলেন। সকলকে বলিলেন ঃ সাবধান, কেহ আগে আক্রমণ করিও না। শত্রুদের আস্ফালন বা আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া কেহ সহসা লড়াই শুরু করিও না।

ওদিকে সহস্র কোরেশ সৈন্যের হুঙ্কার, সুনিশ্চিত জয়-সম্ভাবনার বিকট আনন্দ-ধ্বনি গগন-পবন মথিত করিতেছে। আবু জেহেল দুর্ভেদ্য ব্যূহ গঠন করিয়া মুষ্টিমেয় মুসলিম দলকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য অবিরত উত্তেজনা দিতেছে। তাহাদের আর বিলম্ব সহে না। দেখিতে দেখিতে পর পর দুইটী তীর আসিয়া দুইটী মুসলিম সৈন্যের বক্ষ ভেদ করিল। তাঁহারা আল্লার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। বাকী তিনশত এগারো জন মুসলিম বীর সেবক নির্ব্বাক নিস্পন্দ! তাঁহাদের চোখের সম্মুখে দুই দুই জন মুস্‌লিম শহীদ হইলেন, কিন্তু হজরতের

রাষ্ট্রপতি ও যুদ্ধনায়ক

আদেশ : উত্তেজনার বশে হঠাৎ কেহ কিছু করিও না। সেনাপতির এই আজ্ঞায় তাঁহারা অটল হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে কোরেশদল হইতে তিনজন বীর—ওৎবা, শায়বা ও ওলিদ—আরবীয় প্রথানুসারে, ময়দানে আসিয়া যুদ্ধার্থ তিনজন মুসলিম বীরকে আহ্বান করিতে লাগিল। উত্তেজিত মুসলিম সৈন্যদের এ চ্যালেঞ্জ সহ্য হইল না, তিন জন আনসার সৈন্য তৎক্ষণাৎ দল ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহাদের ডাকিয়া ফিরাইলেন। তাঁহাদের বদলে তিনজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম বীর—আলী, হামজা ও ওবায়দাকে পাঠাইয়া দিলেন। ওলিদের সহিত আলীর, শায়বার সহিত হামজার, ওৎবার সহিত ওবায়দার যুদ্ধ বাধিয়া গেলো। বিশ্বাসের তেজে তখন এক একটী মুসলিম এক শত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে শায়বা ও ওলিদের শির ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। ওবায়দা বয়সের ধর্ম্মে কিছু শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও ওৎবাকে ধরাশায়ী করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও ভয়ানক জখম হইলেন। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর কালো আঁধার তাঁহার চক্ষে ঘনাইয়া আসিল। পরম প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া কোরেশ সৈন্যদল স্তম্ভিত হইয়া গেল। কোথায় তাহাদের সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য দেখিয়া মুসলিম দল পিছু হটিয়া যাইবে। তাহার বদলে কিনা তাহাদের এতো বিক্রম! ওলিদ, শায়বা ও ওৎবার মতো কোরেশ বীর এতো অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের হাতে প্রাণ হারাইল! ক্রোধে অভিমানে তাহারা জ্বলিয়া উঠিল। একযোগে মার্ মার্ শব্দে তাহারা ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিল। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেলো।

দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। অস্ত্রের ঝনঝনা ও সৈন্যদের

রণহুঙ্কার একসাথে মিশিয়া বদর প্রান্তরে ঘোর বিভীষিকার সৃষ্টি করিল ; অদ্ভুত এই যুদ্ধ, আশ্চর্য্য এই সংগ্রাম ! একদিকে তিন শতের উপর অল্প কয়েকজন মাত্র মুস্‌লিম—পুরাতন হাতিয়ার হাতে যুদ্ধার্থী ; অপরদিকে সহস্র কোরেশ সৈন্য নবতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ! এই অসম সংগ্রামে মুস্‌লিমের পরাজয় সুনিশ্চিত ! হজরত এই বিপদে নিখিল শরণ বিপদ-বারণ আল্লার দরবারে হাত উঠাইয়া আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন : হে আল্লা, ইসলামের সত্য-সেবক এই দলটীকে আজ যদি ধ্বংস হইতে দাও, পৃথিবীতে তোমার পূজা হইবে না। হে প্রভু, আমাকে জয়ী করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে, আজ তাহা পূর্ণ কর। হজরত তন্ময় তদ্‌গতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন ; এক গভীর গম্ভীর ভাবাবেশে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এদিকে রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। মুসলিম সৈন্যদল 'আল্লাহো আকবর' রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া শত্রু-নিধনে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কী অদ্ভুত তাহাদের তেজ ! মুস্‌লিমের এক একখানি বাহুতে যেন শত বাহুর শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যার ন্যূনতাকে অতিক্রম করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের প্রদীপ্ত বিশ্বাসের তেজ, তাঁহাদের জ্বলন্ত প্রাণের শিখা। তাহার সম্মুখে শত্রুরা তিষ্টিবে কেমন করিয়া ?

ইতিমধ্যে দুইটী মুস্‌লিম যুবক, মাআজ ও মোআউজ, কোরেশ সেনাপতি আবু জেহেলকে হত্যা করিতে ছুটিয়া আসিল। আবুজেহেল দুর্ভেদ্য ব্যূহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালনা করিতেছে। সে-ব্যূহ ভেদ করা সহজ নয়। কিন্তু এই প্রাণ-মাতাল যুবক দুইটির কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আবু জেহেল, আবু জেহেল ! কোথায় সেই পাষণ্ড আবু জেহেল ! দুইটী ক্রুদ্ধ সিংহের মতো তাহারা লাফাইয়া পড়িল শত্রু-সৈন্যের উপর। আবু জেহেলের বুঝি এইবার আর রক্ষা নাই ! মার্ মার্ শব্দে কোরেশ-সৈন্য সেনাপতিকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিল। যুবক দুইটী দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে

তরবারি চালাইয়া নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া চলিল। অবিশ্রান্ত তলোয়ার চালাইয়া তাহারা উপস্থিত হইল একেবারে আবু জেহেলের সম্মুখে! সেনাপতির দেহরক্ষীরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। আবু জেহেলের পুত্র একরামা ছুটিয়া আসিয়া মাআজের বাম বাহুতে আঘাত করিল। বাহুটী ছিন্নপ্রায় হইল; কিন্তু একেবারে ছিঁড়িয়া পড়িল না, ঝুলিতে লাগিল। মাআজ দেখিল: তাহার বাহুটীই তাহার সঙ্কল্পে বাধা জন্মাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ পায়ের তলে চাপিয়া সেখানি নিজেই ছিঁড়িয়া ফেলিল! আর বাধা নাই! মাআজ-মোআউ-জের প্রচণ্ড আঘাতে আবুজেহেল মুহূর্ত্তের মধ্যে ধরাশায়ী হইল। মক্কীয় সৈন্যদলের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িল।

মুসলিম বীর সৈন্যদলের বিস্ময়কর বিক্রমে সত্তর জন কোরেশ সৈন্য নিহত হইল। চৌদ্দজন প্রধানতম কোরেশ নেতার মধ্যে এগারো জন মারা পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া মক্কীয় সৈন্যদের ত্রাস ও আতঙ্কের অবধি রহিল না। সবখানেই ব্যূহ ভঙ্গ হইয়া গেলো; তাহারা যে যে-দিকে পারিল, পলাইতে শুরু করিল। এই অবস্থায় মুসলিম সৈন্যেরা ইচ্ছা করিলে বহু শত্রুকে হতাহত করিতে পারিতেন। কিন্তু হজরত আদেশ করিলেন: অনেক লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহাদের কেহ আঘাত করিও না।

হজরতের এই অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া বহু মুসলিম সৈন্য অবাক হইয়া গেলো। এমন সুযোগও ছাড়িতে হয়! তবে সত্তরজন কোরেশকে তাঁহারা বন্দী করিলেন! মক্কীয়দের পরিত্যক্ত বহু রসদ ও রণসম্ভার তাঁহাদের হস্তগত হইল। হজরত বলিলেন: বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। মুসলিমেরা নিজেরা খেজুর খাইয়া দিন কাটাইতেন, কিন্তু বন্দীদের রুটি তৈরী করিয়া দিতেন। মক্কাবাসীরা মুসলিমদের উপর যে দুঃসহ নির্য্যাতন চালাইয়াছিল, এই তাহার প্রতিশোধ!

কোরেশ পক্ষে ৭০ জন নিহত, ৭০ জন বন্দী। হজরতের চাচা আব্বাস, হজরতের কন্যা জয়নাবের স্বামী আবুল-আস্ বন্দীদের দলে। মুসলিম পক্ষে চৌদ্দজন মাত্র নিহত। হজরত সঙ্গীদের সহিত মদীনায় ফিরিলেন। বন্দীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহার ভার শিষ্যমণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ওমর বলিলেন: ইহাদের সবাইকে হত্যা করা হোক্! আবুবকর বলিলেন: মুক্তিপণ লইয়া ইহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হোক! হজরত বলিলেন: যাহারা মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ, বিনাপণে তাহাদের মুক্তি। মক্কা-বাসীরা মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এই তাহার প্রতিশোধ!

বদর-যুদ্ধে জয়লাভ ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা। এই ব্যাপারের পর মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধবাদীরা বেশ বুঝিতে পারিল: ইসলাম আরবে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মোনাফেকগণ হতাশ হইয়া পড়িল; ইহুদীরা ক্ষুব্ধ অপমানে ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল, মক্কার লোকেরা বদরের অপমান মুছিয়া ফেলিবার জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

ওমায়র মক্কার একটী দুর্দ্দান্ত লোক। অর্থ দিয়া এই লোকটীকে বশীভূত করা হইল। স্থির হইল: ওমায়র একখানি বিষাক্ত তরবারি লইয়া একাকী মদীনায় যাইবে এবং সুযোগ মতো মোহাম্মদকে আঘাত করিবে। যদি এক আঘাতে মোহাম্মদের মস্তক দেহচ্যুত হয়, ভালো, তাহা না হইলেও তীব্র বিষের ক্রিয়া হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য যাদুকরী শক্তি ইস্লামের সত্যের,—মোহাম্মদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের। মক্কায় ওমরের বেলায় যাহা হইয়াছিল, মদীনার পথে সোরাকা ও বারিদার বেলায় যাহা ঘটিয়াছিল, ওমায়রে বেলায়ও ঠিক তাই হইল। সে প্রাণ নিতে গিয়া প্রাণ দিয়া আসিল; সত্যের বাহনকে হত্যা করিতে

গিয়া আপনার ঘৃণিত পশুজীবনকে হত্যা করিয়া বসিল। এখন হইতে সে হইল ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, সত্যকার সত্যসাধক মুস্‌লিম।

বদরের জয়লাভ একটা অসামান্য ব্যাপার হইলেও হজরত মোহাম্মদ কিন্তু ইহাতে আল্লার মঙ্গল ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; অহঙ্কারের ছায়ামাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। লড়াইয়ের ময়দানে মুস্‌লিম সৈন্যসংখ্যার তিন গুণেরও অধিক সুসজ্জিত শত্রুসেনার সম্মুখে তাঁহাকে বজ্রের মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো অটল দেখা গিয়াছিল। কিন্তু জয়ের মুহূর্ত্তে তাঁহার কুসুম কোমল অন্তর আবার অপূর্ব্ব সুষমায় জাগিয়া উঠিল। বন্দীদের প্রতি আত্মীয়ের চেয়েও মৃদুতর—মধুরতর ব্যবহার দিয়া তিনি সকলকে বিস্মিত করিলেন। বলিলেন: আল্লা আমাদের বিজয়ী করিবেন—প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের তাহাতে অহঙ্কার কি?

ইতিমধ্যে হজরতের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া সওদা ও কিশোরা আয়শার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এতো দিন আয়শা পিতৃগৃহে ছিলেন। এখানে তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অপরূপ দেহ-সৌন্দর্য্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন। যৌবন-সীমায় পৌঁছিয়া তিনি হজরতের ঘরে আসিলেন। বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তাঁহার বুঝিতে বাকী নাই; ধর্ম্মনায়ক ও রাষ্ট্রপতির পত্নীরূপে তাঁহার নারীজীবনের মূল্য জানিতে তাঁহার বিলম্ব নাই। আয়শা রূপে, গুণে বুদ্ধিতে শীঘ্রই নবী-গৃহের প্রধানা হইয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রপতির ঘরণী তিনি, আবুবকরের কন্যা তিনি—তাঁহার মনে ধীরে ধীরে এই বোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন তিনি হজরতকে বলিলেন: রসুলুল্লা, আমি কি আপনার প্রিয় সহধর্ম্মিণী বৃদ্ধা খদিজার চেয়ে বেশী মনোরম নই?

আয়শার কথা শুনিয়া হজরতের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি

বলিলেন: যখন আমি বন্ধুবিহীন একাকী ছিলাম, সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল; যখন সবাই আমাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেছিল, সে-ই আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল।

যেদিন হজরত প্রথম মদীনায় প্রবেশ করেন, যেদিন অগণিত নরনারী তাঁহার দর্শন-আশায় জমা হইয়াছিল: নারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হাফ্‌সা—হজরত ওমরের কন্যা। পিতার পার্শ্বে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। হজরত তাঁহাকে আদর করিয়া কোর্‌আন সমেত একটী জুজ্‌দান উপহার দেন। হাফসার চেহারা পিতার মতো; মেজাজও ছিল একটু ঝাঁঝালো—পিতারই মতো। একটী বর্দ্ধিষ্ণু মুসলিম যুবকের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুবকটী বদর যুদ্ধে নিহত হইলেন। হাফসার পুষ্পিত যৌবনের দুয়ারে বসন্ত তখনো জাগ্রত, এমনি সময়ে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। ওমর বিধবা কন্যাকে কাহার হাতে সঁপিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি আবুবকরকে সাধিলেন, ওসমানকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রশান্ত সাগর-বক্ষে যাত্রী; দুইজনের মধ্যে কেহই হাফসাকে গ্রহণ করিলেন না। ওমর বড়ো ফাঁপরে পড়িলেন, অবশেষে হজরতই প্রিয় সহচরের দুঃখ নিবারণ করিলেন। হাফসা তাঁহারই গৃহে সওদা ও আয়শার সঙ্গিনী হইলেন।

জায়দ বিবি খদিজার ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি হজরতের সেবায় তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। হজরত তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন। কিন্তু জায়দ প্রভু মোহাম্মদের প্রেম-পাশে চিরবন্দী হইয়া রহিলেন। হজরত তাঁহার সহিত নিজের ফুফাতো বোন জয়নাবের বিবাহ দিলেন। জয়নাবের ইচ্ছা ছিল: রসুলুল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু হজরতের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। জায়দ ক্রীতদাস; জয়নাব অভিজাত কোরেশ বংশের কন্যা। দুইজনকে পরিণয়-সূত্রে বাঁধিয়া নবীজী বংশ-গৌরবের

অসারতা দেখাইলেন, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর হজরতের কন্যা ফাতেমার সহিত আলীর বিবাহ হইল। বালিকা ফাতেমার মধ্যে হজরত যেন বিবি খদিজাকে দেখিতে পাইতেন। পিতা হজরত নবী, মাতা বিবি খদিজা—দু'জনের মধুর চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়াছিল বিবি ফাতেমায়। তাই তিনি পিতার অসীম স্নেহের দুলালী হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ফাতেমা যৌবনের তোরণ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমনি সময়ে তিনি সিংহ-বিক্রম—শেরে-খোদা আলীর সহিত সংযুক্ত হইলেন।

হজরতের কন্যা রোকেয়া ছিলেন ওসমানের সহধর্মিণী। স্বামীর সহিত প্রবাসের দুঃখ বরণ করিয়া তিনি আবিসিনিয়ায় গিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরেই তিনি মারা যান। হজরত ওসমানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দেখিয়া বড়ো বেদনা পাইলেন। রোকেয়ার ছোটো তাঁহার আর একটী কন্যার সহিত ওসমানের বিবাহ হইল।

কাসেম মারা যাওয়ার পর হজরতের আর কোনো পুত্র সন্তান হয় নাই। জায়দ, আলী খাঁটী সোনা ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আপনার দেহজাত পুত্রের স্থান কে অধিকার করিতে পারে? তাই প্রিয়তম সহচর ও ভক্ত শিষ্যদের মনে একটী বেদনার কাঁটা ফুটিয়া রহিল। মোহাম্মদ নবী, রসুল, তথাপি সকলের আগে তিনি মানুষ, মাটীর পৃথিবীতেই তাঁহার অধিবাস।

সেনাপতি মোহাম্মদ

বদরের বন্দীরা মক্কায় ফিরিয়া গেলো : কেহ অর্থ দিয়া মুক্তি কিনিল ; কেহ মুক্তিপণের পরিবর্তে মদীনার বালক-বালিকাদের আরবী অক্ষর ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিল ; কেহ বা বিনা পণেই মুক্তি পাইল। মুস্‌লিমেরা সকলের সঙ্গে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করিলেন। বন্দীরা গৃহে ফিরিয়া মুসলিমদের সদ্ব্যবহারের কথা বলিল। কিন্তু তাহাতে কোরেশদের মন ভিজিল না। বদরের অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাহাদের শান্তি নাই। যুদ্ধে জয়ী হইয়া মুস্‌লিম রাষ্ট্রের সম্ভ্রম মর্য্যাদা যতোখানি বাড়িয়া গিয়াছে, পরাজিত হইয়া কোরেশদের সম্মান ঠিক ততোখানি নষ্ট হইয়াছে। কি করিয়া এই নষ্ট সম্মান ফিরিয়া পাওয়া যায়, এই চিন্তাই তাহাদের মনে আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল। আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাহার পিতা ওকবার হত্যাকারীদের রক্ত-লালসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে মদীনার ইহুদীদের কোনো কোনো কবি মক্কায় আসিল। তাহারা ইসলাম ও মোহাম্মদের তীব্র নিন্দাসূচক গাথা গাহিয়া জনসাধারণকে মদীনার মুস্‌লিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আবু-সুফিয়ানের আর বিলম্ব সহিল না ; তাড়াতাড়ি দুইশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদীনার পথ ধরিল। মদীনার কাছে আসিয়া সঙ্গীদের একটী গোপন স্থানে লুকাইয়া থাকিতে বলিল ; নিজে চলিল রাত্রির অন্ধকারে একটী ইহুদী দলপতির সহিত ষড়যন্ত্র পাকাইতে। বনি-নাজির গোত্রের নায়ক সাল্লাম ; গোত্রের যুদ্ধ-তহবিলের সে-ই কোষাধ্যক্ষ। তাহার সহিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোট পাকাইয়া আবু-সুফিয়ান সৈন্যদলে ফিরিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে মুস্লিম দল মক্কীয়দের খবর পাইয়া তাঁহাদের খোঁজে বাহির হইলেন। বদর-ক্ষেত্রে এক হাজার মক্কীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে তিনশত মুসলিম সৈন্যের বিক্রম আবু-সুফিয়ান বিস্মৃত হয় নাই। হজরতের সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াই সে কিছু হটিতে শুরু করিল। যাইবার সময় মদীনার দুইজন চাষীকে মাঠের মধ্যে হত্যা করিয়া গেলো। মক্কীয়েরা সঙ্গে অনেক সাবিক্ বা ছাতু আনিয়াছিল। তাড়াতাড়ি পালাইবার সময় এই খাদ্য তাহারা ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুসলিম সৈন্যদল ছাতুর বস্তাগুলি মদীনায় লইয়া আসেন। এইজন্য এই ব্যাপারটাকে সাবিক অভিযান বলা হয়।

ইহুদীরা মক্কীয়দের সঙ্গে মুস্লিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল শুরু হইতেই। হজরত মোহাম্মদকে তাহারা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ-রক্ষার কাজে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করিতে পারিবে, তাহাদের এই ছিল আশা। সে আশা পূর্ণ হইল না; বরং ইস্লামের রীতি-নীতি তাহাদের স্বার্থ-সাধনের পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল। সুতরাং ইসলামকে ধ্বংস করাই তাহাদের ব্রত। এই দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা গুপ্ত ষড়যন্ত্রকেই পন্থা মনে করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্রে কাজ হইতে অনেক সময় লাগিবে ভাবিয়া দুই একটা ইহুদী গোত্র বদর যুদ্ধের সময়েই প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। বানি-কইনোকা গোত্র যুদ্ধনিপুণ; অর্থশক্তিও তাহাদের বড়ো অল্প নয়। বদর-সমরে মুসলিমদলের অস্তিত্ব রক্ষা যখন নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, সেই সময় এই গোত্রের লোকেরা মদীনার মধ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিল। তাহারা একটা মুসলিম মহিলাকে পথিমধ্যে অপমান করিল, তাহার সম্মান রক্ষার জন্য একটা মুসলিম যুবক অগ্রসর হইলে দুরাত্মারা তাহাকে মারিয়া ফেলিল! মদীনায় দুই দলে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। যুদ্ধ বাধে আর কি? ইতিমধ্যে হজরত

মদীনায় ফিরিয়া বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু ইহুদীদের শঠতা ও ও কপটতা শান্তির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

ইহুদী কবি কা'ব মক্কীয়দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হজরতকে মারিবার জন্য এক ফাঁদ পাতিল। সে একদিন রসুলুল্লাকে তাহার বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে হজরতকে খুন করিবে—এই তাহার মতলব। কিন্তু হজরত কা'বের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সে এবং আর আর কবিরা হজরত ও ইসলামের কুৎসাজনক নানারূপ কবিতা লিখিয়া মদীনার সবখানে প্রচার করিল।

এই ভাবে এবং আরো নানা উপায়ে ইহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধতা করিতে লাগিল। বদর হইতে ফিরিয়া হজরত তাহাদের সহিত আবার একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তখন যুদ্ধ নিশ্চিত ভাবিয়া ইহুদীরা একটী দুর্গে আশ্রয় লইল। শঠ প্রবঞ্চক কাপুরুষ মদীনার ইহুদীরা—সিংহবিক্রম মুসলিমদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার সাহস তাহাদের নাই। দুর্গের মধ্যে তাহারা পর্য্যাপ্ত রণ-সম্ভার ও খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত করিয়াছে। মক্কার লোকেরা মদীনা আক্রমণ না করা পর্য্যন্ত তাহারা এই সব লইয়া দুর্গের ভিতর আরামে দিন কাটাইবে—এই তাহাদের অভিপ্রায়। হজরত ব্যাপার দেখিয়া ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করিলেন।

মক্কা হইতে ইহুদীরা যে-অভিযানের আশা করিয়াছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত কাজে গড়াইল না, মক্কার কোনো সৈন্যবাহিনী আসিয়া পৌঁছিল না। নিরুপায় হইয়া তাহারা অবরোধকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। দয়ার নবী মোহাম্মদ তাহাদের প্রতি কোন রকম দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন না। তাহারা নিজেরাই বলিল : আমরা অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র—সব কিছু ফেলিয়া মদীনা ত্যাগ করিতেছি, আমাদের আপনি যাইতে দি'ন !

হজরত তাহাদের প্রস্তাবে রাজী হইলেন। ইহুদীরা শহরের সন্নিকট ছাড়িয়া চলিয়া গেলো। দুষ্টমনা কা'ব কিন্তু গোপনে মদীনায় ফিরিয়া আসিল। কয়েকজন চঞ্চলমতি গোত্রপতিকে ভাঙাইয়া ইহুদীদের দলে ভিড়াইবে—এই ছিল তাহার মতলব। কিন্তু সে মুস্লিম প্রহরীদের হাতে ধরা পড়িয়া গেলো। এবারে সে আর মুক্তি পাইল না; তাহার প্রতি চরম দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু কা'বের প্রাণদণ্ড হইলেও সে যাহা চাহিতেছিল, তাহা শীঘ্রই পূর্ণ হইল। মদীনার ইহুদী ও মোনাফেকগণ কোরেশদের সাহায্য করিবে, গুপ্ত চিঠিপত্র ও চরদের মারফতে ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। এখন আবু-সুফিয়ান আরবের অন্যান্য গোত্রগুলিকে মদীনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য আবুল আজ্জা ও মোসাফ নামক দুইজন কবিকে লাগাইয়া দিল। বদরের অপমানের দাহনে উন্মত্ত হইয়া তাহারা কোরেশদের পক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই—আরবের তিন সহস্র যোদ্ধা সমবেত হইল। আবু-জেহেলের পুত্র একরামা, ওলিদের পুত্র খালেদ প্রভৃতি তরুণ সেনানীদের মনে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ-কামনা আগুন হইয়া জ্বলিতেছিল। তাহারাও এই সৈন্যদলের অধিনায়ক আবু-সুফিয়ানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপূর্ব্ব সজ্জা এই আরব-বাহিনীর। সম্মুখে কোরেশের জয়-নিশান পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে। পশ্চাতে চতুর্দ্দোলায় হোবলের বিকটদর্শন প্রতিমা। হোবলকে সম্মুখে করিয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠে যুদ্ধসঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে সুন্দরী নারীর দল। তাহাদের পশ্চাতে খালেদের নেতৃত্বে দুই শত দুর্দ্ধর্ষ অশ্বসাদী সৈন্য। তাহার পর উষ্ট্রারোহী সাতশত সৈন্য—লৌহবর্ম্মে সজ্জিত। ইহাদের সম্মুখে করিয়া পদাতিক সৈন্যদল—নবতম অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান।

হজরতের চাচা আব্বাস এই বিপুল বাহিনীর সংবাদ গোপনে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। খবর পাইয়াই হজরত দুইজন লোককে ব্যাপার কি জানিয়া আসিতে বলিলেন। রসুলুল্লার মুখে চিরদিনের সেই সুগভীর বিশ্বাসের বাণী: আমাদের সঙ্গে আল্লা আছেন, তিনিই আমাদের আশ্রয়, একা তিনিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার প্রত্যয়দীপ্ত মুখমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সকলকে ডাকিয়া তিনি পরামর্শ করিতে বসিলেন। মোনাফেক নেতা আবদুল্লা-বেন-ওবাইকেও ডাকা হইল। প্রবীণেরা বলিলেন: মদীনার ভিতরেই যখন এতো ষড়যন্ত্র, তখন নগর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তার চেয়ে আমরা এইখানেই প্রস্তুত হইয়া থাকি; শত্রু শহর-সীমা আক্রমণ করিলে আমরা তাহাদের সম্মুখীন হইব।

হজরতও এইমতে সায় দিলেন। কিন্তু নব্য যুবকেরা ইহার প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন: আমরা আক্রমণের অপেক্ষায় শহরে বসিয়া থাকিলে শত্রুর সাহস ও সুবিধা অনেক বাড়িয়া যাইবে। আমরা কাপুরুষ নই, ইহা আমরা শত্রুদের দেখাইতে চাই। হজরতের চাচা হামজা—আমীর হামজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

হজরত দেখিলেন: নবীন দলের মতামতই বেশীরভাগ লোকের পছন্দসই। তখনই তিনি নিজের মত পরিবর্তন করিলেন; সকলকে যুদ্ধের জন্য সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। যাহার কাছে যে অস্ত্র ছিল, তাতে করিয়া সকলে বাহির হইলেন। রসুলুল্লা নিজেও রণসাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। লৌহবর্ম্মে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত হইল। বর্ম্মের উপরে দৃঢ় কটিবন্ধ, পার্শ্বে দোদুল্যমান তরবারি—'জুলফাকার', শীর্ষে সেনাপতির উষ্ণীষ—আমামা, হজরত রণবেশে বাহিরে আসিলেন। দুইজন মাত্র অশ্বারোহী, পঞ্চাশজন মাত্র ধানুকী—তীরন্দাজ, সত্তরজন মাত্র বর্ম্মধারী। এক

হাজার সৈন্যের বাকী সমস্তই পদাতিক। ইহাদের সঙ্গে লইয়া তিনি মদীনার বাহিরে যাত্রা করিলেন। খানিক দূর আসিয়াই মোনাফেক নেতা বলিল: আমাদের মত না মানিয়া মদীনার বাহিরে যাওয়া হইতেছে, এ যুদ্ধে আমরা যোগ দিব না। নেতার আদেশে তিন শত কপট সৈন্য মদীনায় ফিরিয়া গেলো। হজরত তাহাদের নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাও করিলেন না; তিন হাজার শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র সাত শত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

ওদিকে মক্কীয় বাহিনী মদীনা হইতে এক ঘণ্টার পথ ওহোদ পর্ব্বতের পার্শ্বে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। তিন সহস্র সৈন্যের বাহিনী,—নিশ্চিত জয়সম্ভাবনার আরামে তাহাদের রাত কাটিয়াছে। প্রতিপক্ষে সাতশত মদীনার সৈন্য। জুমা'র নামাজের পর শত্রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সারা রাত তাঁহাদের মন্ত্রি পরামর্শ চলিয়াছে। মোনাফেক আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলিম সৈন্য সংকল্পে আরো দৃঢ়, আরো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালক-বৃদ্ধ সবাই আল্লার পথে অসি উত্তোলন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক বৃদ্ধ বলিলেন: হজরত, আমি বুড়া মানুষ, গোরের পারে ব'সে আছি; আমায় অনুমতি দি'ন, আল্লার রাহে দু'টা বার তলোয়ার হানিয়া শহীদ হই। বালকেরা আসিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইল। হজরত হাসিমুখে তাহাদের বাড়ীতে ফেরত পাঠাইলেন। কিন্তু একটী বালক কোনো মতেই ফিরিতে চাহে না। হজরত তাহার দেহের দৈর্ঘ্য দেখিলেন, বালকটী পায়ের আঙুলে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইল। হজরত ব্যাপার দেখিয়া হাসিলেন; তাহাকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন। আর একটী বালক বলিল: যদি উহাকে অনুমতি দেন, আমাকেও কেন দিবেন না। আমি উহাকে কুস্তি লড়িয়া হারাইতে পারি। তাহাকে সৈনিক দলে ভর্ত্তি করা হইল। সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য আল্লার পথে লড়িয়া তাঁহার নামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য

মুস্‌লিম্‌ দলে এইরূপ উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অন্যদিকে নারী-কণ্ঠের রণসঙ্গীতে তিন সহস্র সৈন্য যুদ্ধোন্মাদনায় নাচিয়া উঠিতেছে। এক পক্ষে সাত শত বিশ্বাস-বলী সৈনিক, অন্যপক্ষে ইহার চারিগুণেরও অধিক রণমত্ত যোদ্ধা। কে জানে কাহার ভাগ্যে বিধাতা জয় লিখিয়াছেন ?

বদর যুদ্ধের সময় হজরত সৈন্য পরিচালনা করেন নাই। কিন্তু এবারে তিনি স্বয়ং সেনাপতি। আমামার উপরে একখানি লাল রুমাল জড়াইয়া তিনি সৈন্যদলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় কি ভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইবে, বুঝাইয়া দিলেন। এই অসম যুদ্ধে শৌর্য্য, সাহস ও বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া প্রাণপণ না করিলে জয়লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প—ইহাও তিনি জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন : মুস্‌লিম যোদ্ধদলের পশ্চাতে ওহোদ পাহাড়। সুতরাং তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। কিন্তু একটী ফাটল রহিয়াছে পাহাড়ের গায়ে। দরকার হইলে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু সুযোগ বুঝিয়া এই ছিদ্র-পথে মুস্‌লিম বাহিনীর উপর পিছন হইতে চড়াও করিতে পারে। হজরত ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে এই পথ আগ্‌লাইতে আদেশ করিলেন। আবদুল্লা-বেন্‌-জোবেরকে ধানুকী দলের নেতৃত্ব দিয়া তিনি বলিলেন : যুদ্ধে হার-জিতের পরোয়া না করিয়া তোমারা এই ছিদ্রপথ রক্ষা করিবে। শত্রু এই পথে ধাওয়া করিলে তাহাদের উপর তীরবর্ষণ করিবে। আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। সাবধান !

হজরত ধানুকী সৈন্য দলের স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যে যুগ্ম-যুদ্ধ শুরু হইয়া গেলো। তাল্‌হা ময়দানে আসিয়া আস্ফালন জুড়িয়া দিল। আলী আসিলেন তাহার সহিত বাহুবল বিনিময় করিতে। আল্লার সিংহ আলীর এক আঘাতেই শত্রুর শির ভূলুণ্ঠিত হইল। তাল্‌হার পুত্র ওস্‌মান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে আসিল। আমীর হাম্‌জা বাঘের

মধ্যে লাফ দিয়া তাহার উপরে পড়িলেন। মুহূর্ত্তে ওস্‌মান পিতার সঙ্গ লাভ করিল।

পর পর দুইজন নায়ক নিহত হইল দেখিয়া মক্কীয় সৈন্যদল আর যুগ্ম-যুদ্ধের উপর ভরসা করিল না; এক যোগে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিল। মক্কার রণচণ্ডীরা গান ধরিল্‌ঃ প্রভাতীতারার দুহিতা আমরা;—বিলাস-শয্যায় আমাদের চটুল চরণভঙ্গি যেন খঞ্জনের নৃত্যগতি। কস্তুরী-সৌরভে আমোদিত আমাদের কেশ-দাম, মোতির মালায় নয়ন-রঞ্জন আমাদের কম কণ্ঠ। বীরদল, অগ্রসর হও; আমরা তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিব। আর যদি পশ্চাৎপদ হও, আমরা তোমাদের ছায়া মাড়াইব না,‌ অন্তরে পুষিয়া রাখিব তোমাদের জন্য অন্তহীন অবজ্ঞা।

রূপসী রমণীর বিকচ বক্ষের ভোগ-লালসা হিংসাতুর আরব বাহিনীকে যেন রক্ত-পাগল করিয়া তুলিল। তাহারা ভীম বিক্রমে সংখ্যা-ক্ষীণ মুসলিম বাহিনীর উপর অর্দ্ধচন্দ্রকারে ঝাপাইয়া পড়িল, যেন ক্ষুব্ধ ফেনায়িত জলধির উত্তাল উর্ম্মিমালা ছুটিয়া আসিয়া একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত করিতে চাহিল। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও মুসলিম বাহিনী পর্ব্বতের মতোই দৃঢ় হইয়া রহিল। আরব বাহিনী দক্ষিণে বামে সম্মুখে আক্রমণ করিয়া বার বার প্রতিহত হইতে লাগিল। আরব দলের দক্ষিণে বামে নেতৃত্বের ভার পড়িয়াছে একরামা ও খালেদের উপর; মুসলিম দলের কেন্দ্র রক্ষা করিতেছেন হাম্‌জা, তাহার পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং শেরে-খোদা—আলী। মক্কীয় বাহিনীর প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত হইলে আলী, হামজা, আবু দোজনা, তাল্‌হা প্রভৃতি মুসলিম বীরগণ সিংহবিক্রমে শত্রুদের আক্রমণ করিলেন। অবিশ্রান্ত তরবারি চালনায় অশ্বের ধার ভাঙিল, কিন্তু চালকদের উৎসাহ টুটিল না, তাহাদের বলিষ্ঠ বাহুতে এতোটুকু ক্লান্তি আসিল না। একখানি ভাঙিলে আর একখানি তলোয়ার লইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থানে নিশান-বর্দার্ উড়াইয়া রাখিয়াছিল কো.রেশ পতাকা। মুসলিম বীরগণ সেইদিকেই আক্রমণের গতি চালাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কোরেশ পতাকা মাটীতে পড়িয়া গেলো। আর একজন পতাকাবাহী তখনই ছুটিয়া আসিল, নিশান তুলিয়া কোরেশের জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু সে-ও মুহূর্ত্ত-মধ্যে ধূলায় লুটাইল। এইভাবে বারো জন পতাকাবাহী মুসলিম বীরসৈনিকদের হাতে নিহত হইল। একা আলীই আটজনকে হত্যা করিলেন।

এদিকে আমীর-হাম্জা দু'হাতে দুই তলোয়ার লইয়া শত্রুসৈন্যের মাঝখানে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণে বামে সম্মুখে তিনি মূর্ত্তিমান মৃত্যুর মতো আরব সৈন্যের উপর অবিরাম তরবারি চালাইতেছেন। ব্যাপার দেখিয়া শত্রু আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে; বহু সৈন্য একযোগে হাম্জাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে। আমীরের সেদিকে দৃকপাত নাই; সত্যের শত্রু এই অমানুষগুলিকে তলোয়ারের মুখে শেষ করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। শঙ্কাহীন দুঃসাহসে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রচণ্ড বেগে অরাতিকুল ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাধা দেয়? কে এমন মৃত্যুকামী যে তাঁহার তরবারির দুর্ব্বার গতি রোধ করিতে যায়? অজেয় আমীর রক্ত-পাগল হইয়া চলিয়াছেন। সহসা একটী হাবশী—ওহ্শী—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। সে-তীর উদর ভেদ করিয়া পিঠের দিক হইতে বাহির হইয়া গেলো। হামজা তখনো তরবারির নেশায় উন্মত্ত। কিন্তু তিনি আর বেশী সময় লড়িতে পারিলেন না; আল্লার নামের জয়ধ্বনি করিয়া তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না।

আমীর হামজা শহীদ হইলেন। কিন্তু আলীর সিংহ-বিক্রমের সম্মুখে মক্কায় সৈন্যদল অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। আবু-দোজানা হজরতের হাতের এক-

খানি তরবারি পাইয়া অরাতি নিপাত করিয়া চলিয়াছেন। হজরতের স্পর্শপূত তলোয়ার হাতে তাঁহার স্বাভাবিক তেজোবীর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে! তাঁহার সম্মুখে পড়িলে কাহারো আর নিস্তার নাই। একবার আবু দোজানা তরবারি উত্তোলন করিয়াছেন, দেখিলেন: তাঁহার উদ্যত আঘাতের নিম্নে আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা! তখনই মুসলিম বীর আপনাকে সামলাইয়া নিলেন। মুসলিম যোদ্ধার হাতে স্ত্রীহত্যা, এ-ও কি সম্ভব? পাশ কাটাইয়া তিনি অন্যদিকে চলিলেন। আঘাতে তলোয়ার ধারশূন্য হইয়া গেলো; আবুদোজানা কর্তব্য সমাধা করিয়া হজরতের দেওয়া অস্ত্র আবার তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মুসলিম বাহিনীর ধর্মোন্মত্ত আক্রমণের বেগ মক্কীয় বাহিনী সহ্য করিতে পারিল না। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল মদীনার সৈন্যদলের উপর। তাহারাই এখন আহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। তাহাদের রচিত ব্যূহ বহুস্থানে ভঙ্গ হইয়া গেলো। দিক্‌হারার মতো, শার্দুলতাড়িত মেষপালের মতো, তাহারা ইতস্ততঃ ছুটিতে শুরু করিল। সম্মুখে জয় দেখিয়া মুসলিমগণ রণ-প্রান্তর কাঁপাইয়া ধ্বনি করিলেন: আল্লাহো আকবর! জয়নিনাদ শুনিয়া সমস্ত মুসলিম সৈন্য নব-উদ্দীপনায় একযোগে শত্রুর পশ্চাতে ছুটিলেন। জয়, জয়, মুসলিমের জয়! ওহোদ ক্ষেত্রে বদর-যুদ্ধের পুনরভিনয়!

জয়-উল্লাসে মুসলিম বাহিনী অধীর হইয়া উঠিলেন। হজরত ধানুকীদলের প্রতি যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা ভুলিয়া গেলেন। পাহাড়ের ছিদ্র-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পলায়নপর শত্রুসৈন্যের পিছু লইলেন।

মক্কার দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা খালেদ এই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। পিতা ওলিদের হত্যাকারী মুসলিম দলকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার যৌবন-তপ্ত শোণিত শিরায় শিরায় অগ্নি-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া-

ছিল। তাই সে দুর্ম্মদ রণোন্মাদনায় কয়েকবার পর্ব্বতের সুরক্ষিত পথ ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মুসলিম ধানুকীদের অব্যর্থ শরসন্ধান সহিতে না পারিয়া বার বার তাহার সৈন্যদল পিছু হটিয়াছে। এইবার সেই সুউচ্চ গিরিপথ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সে অশ্বারোহীদের ছুটাইয়া দিল। মুসলিম দল জয়ের আনন্দে উল্লসিত হইয়া দুশ্‌মন দলন করিতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎদিক হইতে খালেদের নেতৃত্বে দুইশত অশ্বসাদী তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

সৈন্যদলের তুচ্ছতম ত্রুটি, সামান্যতম অবহেলার জন্য রণক্ষেত্রের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। জয় মুসলিমের মুঠার মধ্যে আসিয়াছিল, মুসলিম তীরন্দাজদের ভুলে তাহা হাতের বাহিরে চলিয়া গেলো। খালেদের সঙ্গে মক্কার তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যও কিছু-সংখ্যক আসিয়া জুটিল। মুসলিমেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পলায়নপর শত্রুর পিছু পিছু ছুটিতেছিলেন, তাহাদের পরিত্যক্ত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইতে-ছিলেন; খালেদের আকস্মিক আক্রমণে তাঁহারা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কোরেশের জয়-পতাকা ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এক কোরেশ বীরনারী—আম্‌রা এই সুযোগে আবার তাহা তুলিয়া ধরিল। মক্কায় বাহিনী আবার নবোৎসাহে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মুস্‌লিমদের বিপদের অবধি রহিল না। হজরত ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরেরা সৈন্যদের সমবেত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ। ইহার মধ্যে যোদ্ধ-দলকে সম্মিলিত করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। কিন্তু একত্র হইতে না পারিলেও মুস্‌লিম সৈনিকবৃন্দ আপনাদের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের যিনি যেখানে ছিলেন, সেইখান হইতেই শত্রু-সৈন্যের সহিত লড়িতে লাগিলেন। এইরূপ বিচ্ছিন্ন যুদ্ধে তাঁহাদের বিস্তর লোকক্ষয় হইল।

সেনাপতি মোহাম্মদ

শত্রুদের ভীষণতম আক্রোশ হজরতের উপর। তাঁহার জন্যই তো এতো-সব অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা হজরতকে হত্যা করিবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অধ্যাপক মোস্‌আব দেখিতে কিছুটা রসুলুল্লার মতো ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে ইসলামের পতাকা তিনিই বহন করিতেছিলেন। মক্কীয়দের দৃষ্টি পড়িল তাঁহার উপর। চারিদিক হইতে তিনি আক্রান্ত হইলেন। একটী দুর্দ্ধর্ষ কোরেশ তাঁহার ডান হাতে তরবারির আঘাত করিল। হাতখানি ছিন্ন হইয়া গেলো। বীরবর মোস্‌আব তখন বাম হাতে পতাকা ধারণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটী তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। পণ্ডিত মোস্‌আব ধরাশায়ী হইলেন। ইস্‌লামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হইল দেখিয়া আলী আসিয়া পতাকা উত্তোলন করিলেন।

কিন্তু পতাকা উচ্চ রহিলেও মুস্‌লিম দলের জয়-লাভের আর কোনো সম্ভাবনাই রহিল না। মোস্‌আব নিহত হইয়াছেন। শত্রুপক্ষ রটাইয়া দিল: মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন মুস্‌লিম দলের মেরুদণ্ড যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। পিছু হটিয়া যাওয়াই এখন শ্রেয়স্কর। কিন্তু শত্রুসৈন্যের আক্রমণ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। তাহারা হজরতের মাথায় লাল রুমাল দেখিয়া তাঁহার উপরেই চড়াও করিয়াছে। তীর, তরবারি, লোষ্ট্র যে যাহা দিয়া পারিতেছে, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আলী, অবুবকর, ওমর, জাফর, সাআদ, আবু-তলহা, আবু-দোজানা প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার চারিপাশে প্রাণপণে শত্রুর সহিত যুঝিতেছেন।

মদীনার মুসলিম মহিলারা আহতদের শুশ্রূষা করিতে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বীরাঙ্গনা ওম্মে-আমারা হজরতের প্রাণরক্ষার জন্য তীর ও তরবারি লইয়া শত্রুদের সম্মুখীন হইলেন। জিয়াদ শত্রুদলনে মাতিয়া

হজরতের চরণে মাথা রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। নবীর আশ-পাশ দিয়া তীর ছুটিয়া চলিয়াছে। পাথরের উপর পাথর চলিয়া যাইতেছে। মোস্‌-আবের হত্যাকারী তলোয়ার হাতে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। লোষ্ট্রের আঘাতে হজরত আহত হইয়াছেন, তাঁহার কয়টী দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত বদনে বিন্দুমাত্র বেদনার চিহ্ন নাই। তিনি রক্ত-রঞ্জিত মুখে ভক্তদের অভয়বাণী দান করিতেছেন। ইতিমধ্যে তরবারির আঘাত তাঁহার শিরে নামিয়া আসিল প্রচণ্ড বেগে। সে-আঘাতে তাঁহার লৌহ শিরস্ত্রাণ কাটিয়া গেল; উহার দুইটী টুকরা কপালে ঢুকিয়া পড়িল। হজরতের বদনমণ্ডল বাহিয়া রক্তধারা ছুটিয়া চলিল। এই চরম বিপদের মুহূর্ত্তেও হজরত বিচলিত হইলেন না; আপনার জীবন-মৃত্যুর চিন্তা তাঁহাকে এতোটুকুও বিব্রত করিল না। সেনাপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার সত্যসেবক দলটী ধ্বংস হইয়া যাইবে, আল্লার পবিত্র নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে এ জগতে আর কেহই থাকিবে না—এই একটী মাত্র ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আল্লার আজ্ঞাবহ রসুল তিনি, যুদ্ধনায়ক সৈন্যাধ্যক্ষ তিনি, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মুসলিমেরা সত্যকে বিপন্ন করিয়াছে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিয়াছে। এই অপরাধে হয়তো আল্লা তাহাদের উপর নারাজ হইয়াছে, হয়তো সেই পরম প্রভুর অসন্তোষ এই বিপদের রূপ ধরিয়া তাহাদের শিরে নামিয়া আসিয়াছে! তাই মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও হজরতের কণ্ঠে আকুল প্রার্থনার বাণী ধ্বনিয়া উঠিল; ইহাদের জ্ঞান নাই প্রভু, ইহাদের তুমি ক্ষমা করো! না জানিয়া ইহারা অন্যায় করিয়াছে, ইহাদের অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর! পাপী মানুষের প্রতি অনন্ত প্রেম-করুণায় বেদনাহত নবীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা তাঁহার নিষেধ-বাণীকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহাদের অপরাধ ক্ষমার জন্য তিনি সকল জয়-পরাজয়ের

মালিক আল্লার দরবারে বার বার ব্যাকুল বিনয়ে শির অবনত করিতেছেন। ও দিকে শত্রুরা তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া ভক্ত অনুচরেরা প্রাণপণে শত্রুর নবরচিত ব্যূহভেদ করিয়া চলিলেন। অস্ত্রের আঘাতে দেহ তাঁহাদের জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। রক্তরঞ্জিতদেহে তাঁহারা পাহাড়ের গায়ে—একটী উচ্চস্থানে হজরতকে লইয়া আসিলেন! মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যাঁহাদের চলিবার শক্তি ছিল, সকলে এইখানে আসিয়া জমা হইলেন। শত্রুরা এখানেও আক্রমণ আশায় ছুটিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মুসলিম দল প্রস্তর-ঘায়ে ঘায়েল করিয়া তাহাদেব তাড়াইয়া দিলেন।

এদিকে হজরত মারা গিয়াছেন শুনিয়া মদীনার নরনারী পাগল হইয়া উঠিল। তাহারা দলে দলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে ছুটিতে লাগিল। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মুসলিম সৈনিক হজরতের মৃত্যু-সংবাদে ভাঙামন লইয়া মদীনায় ফিরিতেছিলেন। নারীরা তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেনঃ ইসলামের ইজ্জত লুটাইয়া দিয়া প্রাণ লইয়া তোমরা গৃহে ফিরিতেছ! ছি, ছি, কাপুরুষেব দল! এই লও, তোমরা নারীর বসন, তোমাদের হাতের অস্ত্র আমাদের দাও, আমরাই শত্রুদের নিধন করি! সৈনিক দল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে খবর আসিল হজরত বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদ মিথ্যা। সকলে আশ্বস্ত হইয়া হজরতের দর্শন আশায় ছুটিলেন। রসুলুল্লাকে আহত দেখিয়া নয়নাসারে তাঁহাদের বক্ষ ভাসিয়া গেলো। হজরত সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

মুসলিম সৈন্যদল পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন। শত্রুরা তাঁহাদের নাগাল না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে আবুসুফিয়ান আগাইয়া আসিল। চীৎকার করিয়া বলিলঃ মোহাম্মদ তোমাদের সঙ্গে আছেন? আবুবকব? ওমর?—মুসলিম দল কোনো উত্তর দিলেন না।

তখন আবুসুফিয়ান বলিতে লাগিল : যা'ক, সব ক'টাই শেষ হইয়াছে। ওমর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন : ওরে আল্লার শত্রু, তোর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য আল্লা ইঁহাদের সবাইকে জীবিত রাখিয়াছেন! ইহা শুনিয়া আবুসুফিয়ান বলিল : আগামী বৎসরে বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সহিত মোকাবেলা। মুসলিম দল বলিলেন : আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম, তাহাই হইবে।

যুদ্ধশেষে মুসলিম নারীরা আহতদের শুশ্রূষা করিতেছেন। ওদিকে মক্কার নারীরা অস্ত্র হাতে রণক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়াছে। শুষ্ককণ্ঠ আহত মুসলিম সৈন্যদের বুকে অস্ত্র বসাইয়া তাঁহাদের পিপাসার চিরশান্তি ঘটাইতেছে। মুমূর্ষু ও নিহত মুসলিমদের নাক কান কাটিয়া মালা গাথিয়া গলায় পরিতেছে। মুখে তাহাদের পিশাচীর অট্টহাস, কণ্ঠে তাহাদের বীভৎস চীৎকার, চরণে তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য। আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী—হেন্দা—খল্‌খল্ হাসি হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্মুখে পড়িল আমীর হামজার মৃতদেহ। সে তাহার নাক কান কাটিল; বুক চিরিয়া, তাহার হৃৎপিণ্ড টানিয়া বাহির করিল। ইহাতেও তাহার তৃপ্তি হইল না, সে সেই হৃৎপিণ্ডটা কাঁচা চিবাইয়া খাইতে লাগিল।

যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হইলেন। হজরত তাঁহাদের লাশ সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি সদলবলে মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। কোরেশ সৈন্যদল দৃশ্যতঃ জয়ী হইয়াও মদীনায় গিয়া মুসলিমদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিল না, নবগঠিত রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়া বসিল না। মুসলিম শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিবার যে আশা লইয়া তাহারা আসিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না। সাতশত মুসলিম সৈনিকের হাতে তিন সহস্র আরব বীরকে এতোখানি নাকাল হইতে হইল, তাহাদের কতো লোক সমরক্ষেত্রে চিরশয়ান রহিল—এই আপসোসে তাহারা

একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এখন মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

মক্কার পথ ধরিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু পথেই তাহাদের হিংসানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিল: ফিরিয়া যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়; এত আয়োজন, এত ত্যাগস্বীকারের পর মুসলিমদের একেবারে খতম্ না করিয়া যাওয়া হইবে না। যে কথা, সেই কাজ। অবসন্ন কোরেশ-বাহিনী ক্লান্তি দূর করিয়া আবার মদীনার পথে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

বনি-খোজাআ গোত্রের দলপতি মা'বাদ ইসলাম-সেবক না হইলেও মুসলিম দলের বন্ধু। তিনি দ্রুতপদে মদীনায় গিয়া কোরেশদলের নব-অভিযানের সংবাদ দিলেন। হজরত কালবিলম্ব না করিয়া আহত, শ্রান্ত, ক্লান্ত মুসলিম বাহিনী লইয়া আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মা'বাদের মুখেই আবু-সুফিয়ান জানিতে পারিলেন: মুসলিম সৈনিকদল নবোৎসাহে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা শুনিয়াই আবু-সুফিয়ান আপনার সৈন্যগণকে আবার মক্কার দিকে চালাইয়া দিল। হজরত সসৈন্যে হাম্‌রাউল্-আসাদ্ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। দুই দিন অপেক্ষা করিয়াও শত্রুর কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। তখন তিনি আবার মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

শত্রু-সমবায়

ওহোদে কোনো পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না। জয় মুসলিম দলের মুঠার মধ্যে আসিয়াও তীরন্দাজ সৈনিকদের অবাধ্যতার ফলে তাহা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলো। মক্কার সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় মুসলিম বাহিনীর চারগুণেরও অধিক, শেষ পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণের সুযোগও মিলিয়াছিল প্রচুর। তথাপি আবু-সুফিয়ান জয়ের গৌরব নিয়া গৃহে ফিরিতে পারিল না। অবসাদ, ক্রোধ, ক্ষোভ উভয় দলেই দেখা দিল। সকলেরই বিশ্বাস, তাহাদের জয়ী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কেন হওয়া গেলো না? মুসলিম্ ধানুকীরা দোষ করিয়াছিল, জয়ের মালা তাহারাই নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে—একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু মক্কীরেরা কেন জয়লাভের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলো?

মক্কায় অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। তাহাদের ব্যর্থতার কলঙ্ক-টীকা আরব জাতি শিরে ধারণ করিয়া রহিবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। নূতন করিয়া মুসলিম-ধ্বংসের আয়োজন করিতে হইবে, সমগ্র আরবে প্রচারক পাঠাইয়া এক বিরাট মিত্র-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে, অখণ্ড দেশের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে ইসলামকে নির্মূল করিতে হইবে, উহার চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে—এই হইল কোরেশের কঠিন পণ। এই লক্ষ্যেই তাহারা—তাহাদের প্রধানতম দলপতিরা মাতিয়া উঠিল। আবু সুফিয়ান যুদ্ধশেষে মুসলিমদের শাসাইয়া আসিয়াছিল, সেটা একেবারে ভুয়া ব্যাপার নয়। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সে

আরবের বিভিন্ন গোত্রের শক্তিকে একত্র করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দিকে দিকে দূত গেলো, প্রচারক গেলো, জ্বলন্ত ভাষায় জনসাধারণকে তাতাইয়া তুলিবার জন্য কবিরা প্রস্থান করিল।

এদিকে মদীনায়ও ওহোদ যুদ্ধের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসলিমদের চোখে হজরত আগেকার সেই হজরতই রহিয়া গেলেন; তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তাহার উপদেশের গুরুত্ব, তাঁহার বিধি-নিষেধের সঙ্গতি আগের মতোই প্রবল হইয়া রহিল। কিন্তু মোনাফেকদের অন্তরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস বাড়িয়া গেলো। ইহুদী ও পৌত্তলিক গোত্রগুলি ইসলামের ক্রমপুষ্ট শক্তি দেখিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে শুরু করিল। পূর্ব্বে যেরূপ বিপদ-সম্ভাবনার মধ্যে মুসলিমদের দিন কাটিতেছিল, এখন তাহা বাড়া বই একটুও কমিল না। হজরতকে অবিরত চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইল।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেলো: দুমাতল্‌জান্দল্‌-এর বাসিন্দারা লুটেড়া হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা বাণিজ্য পথে লুট-তারাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয়, তাহারা মদীনার বিরুদ্ধে উত্থান করিবারও উদ্যোগ করিতেছে। হজরত কয়েকশত সৈন্য দুই এক দিন তাহাদের আবাসস্থলে প্যারেড করাইয়া আনিলেন। উদ্দেশ্য: তাহারা দেখুক মুসলিম দল সব সময়েই প্রস্তুত, গোলমাল ঘটাইলে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে না।

হিজরীর পাঁচ সাল, শাবান মাস। খবর আসিল বনি-মুস্তালিক গোত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছে। ইহাদেরও শায়েস্তা করিবার জন্য হজরত সসৈন্যে চলিলেন। এবার আর প্যারেড নয়। বনু-মুস্তালিকেরা মুসলিম দলকে দস্তুরমতো আক্রমণ করিয়া বসিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইল। তাহাদের দুই হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল ও ভেড়া মুসলিমদের হাতে

আসিয়া পড়িল ; বহু নরনারী বন্দী হইল। দলপতি হারেসের কন্যা, জোয়ায়রিয়া, ইসলাম কবুল করিয়া হজরতের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। জোয়ায়রিয়ার পিতা তাহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল ; কিন্তু জোয়ায়রিয়া গেলেন না। তিনি হজরতের শরণ মাগিলেন। হারেসের সম্মতি লইয়া রসুলল্লাহ্ তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বন্দিনী জোয়ায়রিয়া হইলেন রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী।

হজরতের পত্নীরা—উম্মুল মু'মিনিন্, বিশ্বাসীদের—ইসলামপন্থীদের মাতৃগণ। তাই তাঁহারা বনি-মুস্তালিকদের সঙ্গে মাতুল গোষ্ঠির মতো কোমল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা ফাঁসি ও কারাবাসের বদলে পাইল মিষ্ট ব্যবহার। ক্রমেই তাহারা ইসলামের সত্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অবশেষে হজরতের সত্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া মুসলিম দলে মিশিয়া গেলো।

ওদিকে মক্কীদের বিরাট মিত্র-বাহিনী গঠনের আয়োজন ক্রমেই সফলতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিজরীর চার সালের দুইটী ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশজন মুসলিম মক্কার পথে গুপ্ত সন্ধানীর কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচারও করিবেন কথা ছিল। আল্-কাদা তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল। এইখানেই তাঁহারা ইস্লামের সত্যে মানুষকে দাওৎ দিবেন। পথে—বাজী প্রান্তরে—হোজেল বংশের দুই শত লোক তাঁহাদের ঘেরাও করিল। দশটী মাত্র মুস্লিম ; তথাপি তাহারা শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন না। যুদ্ধ করিয়া আটজন নিহত হইলেন, বাকী দুইজনকে তাহারা আহত অবস্থায় বন্দী করিল। হোজেল বংশের কয়েকজন লোক কোরেশ-কারাগারে বন্দী ছিল। তাহাদের মুক্তিপণ হইলেন—এই দুইজন বন্দী মুসলিম, জায়দ ও খোবায়ের। কোরেশেরা জায়দকে তরবারির আঘাতে হত্যা

করিল। খোবায়েবকে সমারোহের সহিত বধ্যভূমিতে নিয়া ক্রসবিদ্ধ করা হইল।

ইতিমধ্যে আমের ও সোলেম গোত্রের দলপতি আবুবারা হজরতের কাছে আসিয়া একদল প্রচারক নজ্দ্ অঞ্চলে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিল। ইসলামের সত্য দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য রসুলুল্লার অন্তরে যে ব্যগ্র ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অনুক্ষণ জাগিয়া ছিল, তাহারই প্রেরণায় তিনি দলপতির আহ্বানে সত্তর জন মুসলিমকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এখানেও প্রচারক দল বিপন্ন হইলেন। তাহারা বীরমাউনায় পৌছিলে আবু-বাবার আদেশে নজ্দীরা নিরীহ মুসলিম প্রচারকদের আক্রমণ করিল। তাহারা নিরস্ত্র মদীনীয়দের অস্ত্রাঘাতে একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল! একটী মাত্র মুসলিম—কা'ব বিন্-জায়দ্ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও কোনোরূপে প্রাণ লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন।

এদিকে মক্কার নেতাদের ষড়যন্ত্র ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে। মদীনার কপট মুসলিম্—মোনাফেকেরা ভীরু, কাপুরুষ; তাহাদের মৌখিক আস্ফালন কোরেশদের কাজে লাগিল না, তখন তাহারা ধূর্ত্ত ইহুদীদের সহিত ষড়যন্ত্র শুরু করিল। বনু-কোরেজা গোত্রের ইহুদীরা মুসলিমদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে ঃ তাহারা শত্রুপক্ষের সহিত কোনোপ্রকার ষড়যন্ত্রে যোগ দিবে না। এইরূপ সন্ধি করিবার জন্য হজরত বনু-নাজির গোত্রকেও আহ্বান করিলেন। তাহারা বাহিরে বাহিরে রাজি হইল; কিন্তু গোপনে হজরতকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা বলিল ঃ আপনার সহিত আমাদের মতভেদ যা-কিছু ধর্ম্মীয় ব্যাপারে। আপনি দুইজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসুন। আমাদেরও তিনটী মাত্র লোক আপনাদের সহিত তর্ক করিবেন। যদি তাঁহারা হারিয়া যান,

আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করিব। হজরত এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বস্তসূত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহারা বনি-নাজির পল্লীতে আসিলেই তাহাদের হত্যা করা হইবে। সংবাদ শুনিয়া রসুলুল্লাহ্ সাবধান হইলেন; বনু-নাজিরকে সন্ধির জন্য বার বার আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহার প্রস্তাব এড়াইয়া চলিতে লাগিল এবং মদীনার কপট বন্ধু ও মক্কার শত্রুদের সহিত বিদ্রোহের পরামর্শ স্থির করিল। হজরত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াই সসৈন্যে তাহাদের পল্লী অবরোধ করিলেন। নাজির গোত্রের লোকেরা ভাবিয়াছিল: মোনাফেকরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করিবে, মক্কার মিত্র-সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই মদীনা আক্রমণ করিবে। কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। যতোই দিন যাইতে লাগিল, ততোই অবরুদ্ধ ইহুদীদের মধ্যে নিরাশা ও অবসাদ ঘনাইয়া আসিল। অবশেষে তাহারা দূতের মুখে বলিয়া পাঠাইল: আমরা অনুমতি পাইলে মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

আধুনিক শাসননীতি মানিয়াও এইরূপ বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহী গোত্রকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিতে পারে। ওমর ও আলীর মতও ছিল তাই। তাঁহারা হজরতকে বলিলেন: ইহাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া যা'ক। কিন্তু রসুলুল্লার রক্তপিপাসা ছিল না। তিনি বলিলেন: তাহাতে কাজ নাই, উহারা কিছু অর্থ দণ্ড দিয়া এমনিই চলিয়া যা'ক।

শুধু অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িতে হইল, আর সব-কিছু—এমন কি গৃহের জানালা-কপাটগুলি পর্যন্ত লইয়া বনু-নাজির মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলো।

বনু-কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের বাস মদীনার উপকণ্ঠে। তাহারাও বনু-নাজির গোত্রের ন্যায় কপটতা শুরু করিয়া দিল। হজরত তাহাদের মদীনার রাষ্ট্র-শাসন মানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু বনু-কাইনুকা তখন শত্রুদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা হজরতের কথায় সোজা জবাব দিয়া বসিল। বলিল: কোরেশদের হারাণো যতো সহজ, আমাদের সঙ্গে লড়াই করা ঠিক ততোখানি সহজ কাজ নয়। আমাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া দেখ, জয় জিনিসটা অতো সহজলভ্য নয়। এই বলিয়া তাহারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সম্ভবতঃ ইহারাও মদীনার অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রত্যাশা করিয়াই ঐরূপ দম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু হজরত যখন সসৈন্যে তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন, তাহারা শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিল। মদীনার রাষ্ট্রনায়ক ইহাদের সঙ্গেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু বনু-কাইনুকা যখন আত্মসমর্পণ করিল, হজরত তাহাদের প্রাণে মারিবার আদেশ দিলেন না। তাহারা আপনাদের বাসভূমি ছাড়িয়া অন্যখানে চলিয়া গেলো, মুসলিম সৈন্যদল মদীনায় ফিরিয়া আসিল।

পৌত্তলিক ইহুদী ও মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র বরাবর চলিয়া আসিতেছে। হজরত মোহাম্মদ মোনাফেক ও ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মতিগতির দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহাদের বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন দেখিতেছেন, তাহাদের শাসনদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া দূরে খেদাইয়া দিতেছেন। নিকটবর্ত্তী শত্রুকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া তিনি বহিঃশত্রুর দলপুষ্টি করিতেছেন! কে জানে এই মহত্বের পরিণাম কি হইবে! নির্ম্মম শাসক হইলে তিনি বিদ্রোহী গোত্রগুলির অন্যরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু হজরত ক্ষমা-করুণার প্রতিমূর্ত্তি। কঠোরতা তাঁহার চরিত্রের উপকরণ নয়। তাই তিনি বিদ্রোহীদের দয়া করিলেন। কিন্তু তাহারা হজরতের দয়ার প্রতিদান দিল শত্রুদলে মিশিয়া। ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ্ বনি-কোরেজার সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বনু-নাজির দলপতির প্ররোচনায় তাহারা সে-সন্ধিপত্র টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। মক্কার দলপতিদের

প্রাণপণ চেষ্টায়—ইহুদীদের ও মোনাফেকদের দুঃসাধ্য সাধনায় সমগ্র হেজাজ মদীনার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সমবেত হইল।

যেখানে যতো গোত্র ছিল, বাছা বাছা যোদ্ধাদের মক্কায় পাঠাইয়া দিল। যাহাদের যতো ক্ষমতা ছিল, অর্থ সাহায্য করিল। যাহার ঘরে যতো অস্ত্র ছিল, সমস্ত লইয়া আসিল। এইভাবে হেজাজ প্রদেশের মিত্র-বাহিনী গঠিত হইল। ইহার সৈন্য-সংখ্যা হইল দশ হাজার।

আবু-সুফিয়ান ও অন্যান্য গোত্রপতিদের অধিনায়কতায় এই বিপুল সম্মিলিত মিত্র-বাহিনী ইসলাম ও হজরত রসুলের নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মদীনার দিকে যাত্রা করিল। হজরত শত্রুর গতিবিধির সংবাদ ভালো করিয়াই রাখিতেন। বিরাট মিত্র-সৈন্যদলের কুচ-কাওয়াজের খবর যথাসময়ে তাহার কাছে পৌঁছিল। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; কি করিয়া বর্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মদীনায় অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা অনুক্ষণ লাগিয়া আছে, মোনাফেক দল এবার সুবিধা পাইলেই অভ্যুত্থান করিবে। এ অবস্থায় মদীনা ত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। সহচরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হজরত স্থির করিলেন: এবার আর নগর ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। সালমান ইরান দেশীয় মুসলিম। তিনি বলিলেন: মদীনা রক্ষার জন্য ইহার চারিদিকে পরিখা খনন করা হোক। এই মত হজরতের বড়ো পছন্দ হইল। শহরের পিছনে পর্বত। সামনের তিনদিকে খন্দক খুঁড়িলেই কাজ চলিবে।

বিলম্বের সময় নাই। মদীনার সমস্ত মুসলিম পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। হজরত স্বয়ং সামান্য কুলিমজুরের মতো তাহাদের কাজের সঙ্গী হইলেন। তিন হাজার আত্মরক্ষাব্রতী মানুষের অক্লান্ত চেষ্টায় মোটামুটী ছয় হাজার হাত দীর্ঘ—দশ হাত গভীর—পরিখা তৈরী হইয়া গেলো। নগরের

আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভার পাঁচ শত বাছাইকরা বীরসৈনিকের উপর অর্পণ করা হইল। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দিনরাত্রি শহরের মহল্লায় টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হাতে তাঁহাদের তীরবল্লম বর্শা-তরবারি, মুখে তাঁহাদের প্রাণশিহরণ আল্লাহো-আকবর ধ্বনি। সে ধ্বনি শুনিয়া শত্রু আতঙ্কিত হইল; বিদ্রোহে অসীম বিপদ জানিয়া শান্ত হইয়া রহিল। এদিকে হজরত মদীনায় সমস্ত মুসলিম নারী ও শিশুদের একটী দুর্গ বাটিকায় স্থানান্তরিত করিলেন। তিন হাজারের মধ্যে পাঁচ শত গেলেন নগর-পরিক্রমণের কার্য্যে। বাকী আড়াই হাজার মুসলিম সৈনিক দশ হাজার শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিখা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। শত্রুরা কতো দিন নগর অবরোধ করিয়া থাকিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এজন্য পূর্ব্ব হইতে খাদ্য-সামগ্রী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছিল। হজরত এ বিষয়ে এতোই সাবধান হইলেন যে মুসলিম সৈনিকেরা অনাহারে—পেটে পাথর বাঁধিয়া—খন্দক তৈরী করিলেন, তথাপি সঞ্চিত খাদ্যে—শত্রুর আক্রমণের পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করা হইল না।

ইতিমধ্যে বনি-কোরেজা গোত্রের ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা হজরত জানিতে পারিলেন। সংবাদ আসিল তাহারা সন্ধির শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া আরব সৈন্যবাহিনীর আনুকূল্য করিতেছে। হজরত এতোটুকু বিচলিত না হইয়া দুটি লোককে বনি-কোরেজা পল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা দলপতিকে নানারূপ হিত-কথা শুনাইয়া সন্ধির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বনি-কোরেজাদের মগজ তখন বিদ্রোহের উত্তেজনায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। তাহারা মুসলিম দূতদের কথা কানেই তুলিল না। বলিল: মোহাম্মদ কে? আমরা তাহাকে চিনিনা।

মিত্র-বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য যথা সময়ে মদীনার উপকণ্ঠে পৌছিল। তাহাদের রণ-হুঙ্কারে আকাশ বাতাস ঘনঘন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু এ কি

ব্যাপার! নগরের একদিকে পর্ব্বত, আর তিনদিকে গভীর গড়খাই। এমন কাণ্ড তো আরব সৈন্য কখনো দেখে নাই! পরিখা রচনা করিয়া যুদ্ধ—আরবের নীতি নয়। আরব জানে খোলা ময়দানে হাতিয়ার হাতে জীবন-মৃত্যু খেলা খেলিতে; তাহারা তো খন্দক খুঁড়িয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে জানে না। মিত্র-বাহিনীর পরিচালকগণ মহা ফাঁপরে পড়িল। রাগের মুখে তাহারা যা তা বকিতে শুরু করিল। সম্মুখে গভীর খাদ, তাহার ওপারে মাটীর স্তূপ—পার হইয়া নগর আক্রমণ সহজ ব্যাপার নয়। মক্কার দলপতিদের রাগ হইবারই কথা। এতো প্রচার, এতো আন্দোলন, এতো সাধ্য-সাধনায় এই বিপুল সৈন্য সংগ্রহ—এ-সব মোহাম্মদের এক চা'ল বাজিতেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এ কি সহ্য হয়! মিলিত বাহিনীর সেনানায়কেরা নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রোধ যতোই ভীষণ হোক পরিখা অতিক্রম করিয়া মদীনার উপরে চড়াও করা মিত্র-সৈন্যদলের পক্ষে সম্ভব হইল না। নগরের প্রবেশ-দ্বারে বাছা বাছা ধানুকীর দল। তাহাদের তীরন্দাজির সাম্‌নে তিষ্টিতে পারা যে সে ব্যাপার নয়। এদিকেও তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন তাহারা অগত্যা মদীনার চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল। নগর অবরুদ্ধ হইল।

ইহাতে কিন্তু মিত্র-বাহিনীর যারপর নাই দুর্দ্দশা ঘটিল। ফেব্রুয়ারী মাস; প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। মদীনায় খোলামাঠে সৈন্যদের তিষ্টানো দায় হইয়া উঠিল। নগরের ভিতরে মুসলিম সৈন্যগণের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু শীতের দুঃসহ ক্লেশ নাই। তাহারা বাহিরের শত্রুসৈন্যের চেয়ে ঢের আরামে গৃহে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ওদিকে আবার মিত্র-বাহিনীর রসদের পরিমাণও ক্রমে কমিতে লাগিল। আরবের ইতিহাসে এতো বড়ো সৈন্যবাহিনী এই প্রথম। মদীনার মুসলিম-শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে তাহাদের বেশী দিন লাগিবার কথা নয়। কাজেই খুব বেশী পরিমাণ রসদ তাহারা সঙ্গে

আনে নাই। কিন্তু মুস্‌লিম দল আত্মরক্ষার যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, ইহাতে শক্তিপরীক্ষার ব্যাপারটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবার নয়। মুস্‌লিম দলকে পরিখার বাহিরে আনিবার জন্য অনেক রকমে চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। শেষে মিত্রবাহিনী বাহির হইতে তীর-বৃষ্টি শুরু করিল। ইহাতেও মুস্‌লিম দল কাবু হইল না।

আম্‌র্ আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। একাই এক হাজার লোকের মহড়া দিতে পারিত। তাহারই নেতৃত্বে একদল মিত্র-সৈন্য অবশেষে একদিন পরিখার একটী অপরিসর স্থান পার হইয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া মুসলিম সৈন্যগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। আম্‌রের আস্ফালনে আকাশ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু তাহার সহিত মুকাবিলা করিতে কোনো মুসলিম আগাইল না। ইতিমধ্যে আলী উলঙ্গ তরবারি হস্তে বাহির হইলেন। শেরে-খোদার এই দুঃসাহসে হজরত চমকিয়া উঠিলেন। দুর্মদ শত্রুর তীক্ষ্ণ তরবারির উদ্যত আঘাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আল্লার দরবারে আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একদিকে আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর—অস্ত্রব্যবহারে সিদ্ধহস্ত রণদক্ষ আম্‌র্, অন্যদিকে বিশ্বাসবলী তরুণ যুবক আলী। দুই যোদ্ধার পায়ের ধুলা উড়িয়া স্থানটীকে সমাবৃত করিয়া ফেলিল। সহস্র উৎসুক নেত্রের দৃষ্টির সম্মুখে ধূলিনির্ম্মিত পর্দ্দার অন্তরালে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাহারও জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। দর্শকগণ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল। সহসা আলীর উদ্দীপ্ত কণ্ঠ শোনা গেলো: আল্লাহো আকবর। তিন সহস্র মুস্‌লিম কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিল: আল্লাহো আকবর। ধূলির পর্দ্দা সরিয়া গেলো। আলী রক্তরাঙা তলোয়ার হাতে চলিয়া আসিলেন, আম্‌রের ছিন্ন মুণ্ড মাটীতে পড়িয়া রহিল। সকলে ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলো। নবীন উৎসাহে মুসলিম সৈন্যদল মাতিয়া উঠিল।

এদিকে বীরবর খালেদ-বিন-ওলিদের অধিনেতৃত্বে বাছা বাছা সৈন্যদের একটী দল হজরত যেখানে ছিলেন, সেই স্থানটী আক্রমণ করিল। অবিরাম, ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হজরতের নামাজ পড়িবারও সময় রহিল না। অবিশ্রান্ত লড়াইয়ের মাঝখানে মানুষ রক্ত-মাতাল হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষ পর্যান্ত খালেদের শৌর্য্যবীর্য্য রণকৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইল। মদীনার মুস্‌লিম শক্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া রহিল।

এক মাস অবরোধের পরও মদীনার পতন হইল না। খোলা ময়দানে দুঃসহ শীতের প্রকোপ সহিয়া মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ আর কতোদিন অটুট থাকিতে পারে! ইহার উপর রসদপত্রের অভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ইসলামের শক্তিমূল ছিন্ন করিবার যে দুর্জ্জয় পণ লইয়া মিত্র-বাহিনী মদীনা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইবার আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। এদিকে বনি-কোরেজা গোত্রের ইহুদীরা ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখিয়া মিত্র-পক্ষ পরিত্যাগ করিল। চারিদিক হইতে যেন নৈরাশ্য ও অবসাদ শত্রু-সৈন্যকে ঘিরিয়া ধরিল। ক্রমে বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে মতভেদ ও মনোবাদ দেখা দিল। ইহার উপর তাহাদের শিরে নামিয়া আসিল আস্‌মানী গজব। একদিন কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে উঠিল ঝড়। সন্ধ্যার পর ঝঞ্ঝামাতাল প্রকৃতি যেন সৃষ্টি ধ্বংস করিতে চাহিল। বাতাস, বৃষ্টি, তুষার—তিনে মিলিয়া মিত্রবাহিনীর রণতৃষ্ণা মিটাইয়া দিল। প্রভাতে মদীনাবাসীরা দেখিল: বিপুল আরববাহিনী কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া মক্কার দিকে প্রস্থান করিতেছে।

শত্রু সৈন্যদল ব্যর্থতা লইয়া গৃহে ফিরিল। কোরেশ-শক্তি ইসলামকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, একথা আজ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেলো। তাই মদীনায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেকটী মুসলিম নরনারী যেন এক অজানা বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনো শিশু

শত্রু-সমবায়

মুসলিম রাষ্ট্রের বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। এবারে কোরেশ, ইহুদী ও মোনাফেকদের চেষ্টায় যে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি হইয়াছিল, আরবের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব। ইসলামের শত্রুরা এমন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইয়া ও 'পরিখা-যুদ্ধে' হার মানিয়া চলিয়া গেলো—ইহাতে আশার—আনন্দের সত্যই যথেষ্ট কারণ ছিল ; কিন্তু অন্তর্বিপ্লব, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা যে কোনো সময়ে মুসলিম-শক্তিকে অন্ততঃ বিপন্ন করিতে পারে। বনু-কোরেজা গোত্র মুসলিমদের সঙ্গে বার বার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াও খন্দক যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। আল্লার অভিপ্রায় অন্যরূপ না হইলে এই বিশ্বাসঘাতকতাই ইসলামের মূলোৎপাটনের একটা কারণ হইয়া দাঁড়াইত। তাই আহজাব বা মিত্রশক্তিদের সম্মিলিত বাহিনীর বিপুল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরই মুসলিম নেতারা বিদ্রোহী—বিশ্বাসহন্তা কোরেজাদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। স্বয়ং হজরত তাঁহাদের অধিনায়ক। অবিলম্বে বনু-কোরেজাদের দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। কোরেজারা আপনাদের গুরু অপরাধের কথা ভালো করিয়াই জানিত। লঘু দণ্ডে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না—এই আশঙ্কায় তাহারা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া দুর্গে আশ্রয় লইল। তাহারা হজরত ও তাঁহার সহধর্মিণীদের সম্বন্ধে নানা অকথ্য কথা বলিয়া গালি শুরু করিল খায়বর অঞ্চলের ইহুদী সম্প্রদায় তাহাদের সাহায্যার্থ আসিবে, কোরেশরা চলিয়া গেলেও তাহাদেরই সম্মিলিত শক্তিতে মুসলিম দল বিধ্বস্ত হইবে, তখন মদীনা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জনপদগুলিতে ইহুদীদের অবিসম্বাদিত রাজ্য গড়িয়া উঠিবে—এই ধরনের নানারূপ আশা-বিশ্বাসে কোরেজা গোত্র সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার সীমা ছাড়াইয়া গেলো। হজরত তাহাদের আত্মসমর্পণ করিতে বার বার বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু মুসলিম নেতার করুণার্দ্র চিত্তের আশ্রয় তাহারা গ্রহণ করিল না। শেষে যখন খায়বরের ইহুদীদের সাহায্যের আশা

মিথ্যা হইয়া গেলো, গোত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মন নিরাশায় একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল, বর্ত্তমান বিপৎপাতের জন্য এ উহাকে দায়ী করিতে শুরু করিল, আর কোনো উপায় না দেখিয়া বনু-কোরেজা বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু হার মানিয়াও হৃদয় তাহাদের সন্দেহ-অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। হজরতের উপর ভরসা না করিয়া তাহারা সাআদ-বিন্ মুয়াজকে মধ্যস্থ মানিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

সাআদ-বিন-মুয়াজ্ আন্সার দলপতি। তিনি নিষ্ঠাবান্ মুস্লিম; কিন্তু বনু-কোরেজা প্রভৃতি ইহুদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব। ইহুদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে; তাহাকে সালিশ মানিলে বনু-কোরেজার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে না, ইহাই তাহাদের ধারণা। এই ধারণার বশেই তাহারা সাআদকে মধ্যস্থ মানিল। সাআদ মুস্লিমদেরও গভীর বিশ্বাসের পাত্র; হজরতের তিনি ভক্ত বিশ্বস্ত অনুগামী। হজরত ও মুস্লিমগণ অসঙ্কোচে বনু-কোরেজার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল: সাআদের বিচারই উভয় পক্ষ মানিয়া লইবেন।

এদিকে পরিখা যুদ্ধে মিত্র সৈন্যের শরাঘাতে সাআদ সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন। তাহার বাঁচিবার কোনো আশাই নাই। তাঁহার দৃঢ় ধারণা: ইহুদী ও মোনাফেকদল বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ-চেষ্টা না করিলে মিত্র সৈন্যবাহিনী মদীনা আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না, এবং তাহা হইলে হয়তো অকালে শত্রুর শরে তাঁহারও প্রাণ যাইত না। বনু-কোরেজার বিচার করিবার ভার তাঁহার উপরেই পড়িয়াছে—এ সংবাদ যখন তাহাকে দেওয়া হইল, তখন আর তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই। সকলে ধরাধরি করিয়া সাআদকে সভাস্থলে আনিলেন! বনু-কোরেজার প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া অনেক অনুনয় করিল: যেন তাহাদের প্রতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। সাআদ ধীরভাবে তাহাদের বক্তব্য শুনিলেন। একটু পরেই

তিনি তাঁহার রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন : ইহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ —যদি শত্রুদের হাতের মুঠার মধ্যে পাও, পুরুষদের তরবারির ঘায়ে হত্যা করিবে ; নারী, শিশু, গৃহপালিত পশু এবং তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিজেদের জন্য গ্রহণ করিবে। ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থের এই বিধান ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী বনু-কোরেজার উপর বর্ত্তিবে। তাহাদের যোদ্ধপুরুষরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে ; অন্যান্য পুরুষ নারী ও শিশুর দল মুসলিমদের হাতে কয়েদ হইবে ; তাহাদের পশুপাল ও অন্যান্য যাবতীয় ধনসম্পত্তি মদীনার রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই আদেশ দিবার পর সাআদ আবার আপন গৃহে নীত হইলেন। সেখানেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেলো। শহীদের গৌরব লাভ করিয়া তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

বনু-কোরেজার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। সাআদের বন্ধুত্বকে নিরাপদ ভাবিয়া তাহারা তাঁহার উপরেই নিজেদের বিচারভার অর্পণ করিয়াছিল। তাঁহারই আদেশে নিজেদের শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে—তাহাদের গোত্রের সাত শত পুরুষের প্রাণ গেলো। নারী ও শিশুরা বন্দী হইল। তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিমগণ দখল করিল।

হিজরীর পাঁচ সালে জিলকাদ মাসে খন্দক-যুদ্ধ হয়। এই সালের শেষভাগে হজরত বিবি জয়নাবকে বিবাহ করেন। জয়নাব আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্রী—হজরতের ফুফুতো বোন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রসুলুল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু হজরত জায়দের সহিত জয়নাবের বিবাহ দেন। জায়দ ছিলেন বিবি খদিজার ক্রীতদাস। হজরতের সেবার জন্য বিবি খদিজা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। রসুলুল্লাহ্ তাহার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে গৃহে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলেও জায়দ হজরতের সেবার অধিকার ত্যাগ করিতে রাজি হন নাই। সেই জায়দের হাতে আরবের

শ্রেষ্ঠ বংশ কোরেশের কন্যা—তাহাও আবার কোরেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরিবারের কন্যা, জয়নাবকে তিনি সমর্পণ করিলেন। হজরত মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য ঘুচাইয়া সকলকে সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা ও সমান সুযোগের সম অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন, সকল মুস্‌লিমকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া সম-উচ্চ মানবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি জয়নাবকে স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া জায়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সেই হইতে জয়নাব ছিলেন জায়দের ঘরণী। কিন্তু জয়নাবের মন হজরতের ব্যবস্থায় কোনো দিনই খুশী হয় নাই। অসামান্য রূপবতী তিনি, শ্রেষ্ঠ গোত্রের শ্রেষ্ঠ পরিবারের কন্যা তিনি, বুদ্ধি-বিচারে গরীয়সী তিনি, তিনি কেন সামান্য একটা ভৃত্যের গৃহিণী হইবেন? হোন জায়দ হজরতের পোষ্য পুত্র, হোন তিনি রসুলুল্লার শ্রেষ্ঠ সেবক, তাই বলিয়া কি তিনি জয়নাবের যোগ্য? হজরত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান করুন, কিন্তু জয়নাবকে কি তাহার নবতন্ত্রের বলি না করিলে চলিত না? এই সব প্রশ্ন তরুণীর মনকে একেবারে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। জায়দের গৃহে তিনি আসিলেন; একত্র দুইজনের জীবন কাটিতে লাগিল; কিন্তু দাম্পত্য মিলন তাহাদের হইল না। জয়নাবের মেজাজ খর হইতে খরতর হইয়া দাঁড়াইল। জায়দ বিরক্ত হইয়া রসুলুল্লার হুজরে আসিয়া সুন্দরী জয়নাবের ভার বহনে অক্ষমতা জানাইলেন। হজরত তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু জয়নাব ক্রমেই অজেয়া হইয়া উঠিলেন; জায়দের জীবন তিক্ততায় ভরিয়া গেল। অবশেষে তিনি স্ত্রীকে একদিন তালাক দিয়া বসিলেন।

এই জয়নাব হজরতকে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। তাহার তরুণ হৃদয়ের বাসনা এতোদিনে পূর্ণ হইল। এই ব্যাপার হইতে একটি সামাজিক আদর্শও গড়িয়া উঠিল। পোষ্য পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় এই নিয়ম মদীনায় প্রবর্ত্তিত হইল।

শত্রু-সমবায়

ইতিপূর্ব্বে হজরতের পারিবারিক জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া যায়। নিয়ম ছিল: যুদ্ধে হজরতের এক একজন সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। বনু-মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে যখন অভিযান হয়, বিবি আয়শা ছিলেন হজরতের সহচরী। ফিরিবার পথে আয়শা হারাইয়া যান। কোন প্রয়োজনে তিনি উট হইতে নামিয়া একটু আড়ালে গিয়াছিলেন। উট-চালক ইহা জানিত না। বিবি আয়শা ঠিকই আছেন ভাবিয়া সে উট চালাইয়া দেয়। প্রায় এক দিনের পথ চলিবার পর তাহার ভুল ধরা পড়ে। এদিকে বিবি আয়শা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন: তাঁহাকে ফেলিয়া সবাই চলিয়া গিয়াছে,—দূরে যতোদূর দৃষ্টি চলে জনমানবের চিহ্ন নাই। এমন বিপদে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ইতিমধ্যে পশ্চাদ্গামী মুস্লিম সৈন্যদলের একজন নায়ক—সাফ্ওয়ান্ ইব্নে-মুয়াত্তাল্—তাঁহার সাক্ষাৎ পান এবং নিজের উটে চড়াইয়া তাঁহাকে হজরতের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। এই ব্যাপারটা সহজেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেলো। আয়শা সুন্দরী তরুণী, সাফ্ওয়ান সুদর্শন যুবক। পথে তাঁহাদের একটী রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। কুৎসার এমন সুন্দর উপকরণ সামনে পাইয়া কতকগুলি লোকের জিভ্ চুলকাইতে লাগিল। মোনাফেক নেতা আবদুল্লা-বিন্-উবাই বড়ো খুশী হইয়া মনের সাধে বদনাম রটাইতে শুরু করিল। বিবি আয়শা ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মাতা, পিতা, স্বামী—সবাই তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেলো। কোর্আনের একটী আয়াতে বিবি আয়শার সম্বন্ধে ইঙ্গিত আসিল। আয়শা আবার আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সত্যের প্রতিষ্ঠা

আহ্‌জাব বা খন্দক যুদ্ধে একথা প্রমাণিত হইয়া গেলো যে কোরেশ ও মিত্রদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখেও ইসলাম অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই ঘটনার পর হইতে আরবের বিভিন্ন গোত্রের চক্ষে হজরতের মর্য্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেলো। দলে দলে লোক এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখিতে আসিল। সন্ন্যাসীর মতো নির্ব্বিলাস, নিরহঙ্কার, কঠোরব্রতী জীবন তাঁহার। রাস্তার সাধারণ একটী মানুষের মতোই সামান্য তাহার অভাব, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবী ঈসার মতোই কোমল তাঁহার অন্তর। তথাপি যুদ্ধ চালনায় আলেকজাণ্ডারের মতো অকুতোভয় কৌশল তাঁহার; বাগ্মিতায়—বাক্‌-নৈপুণ্যে সিসেরোর মতো চিত্তজয়ী প্রতিভা তাঁহার; রাজমহিমায়—রাষ্ট্র-পতির সম্মান-মর্য্যাদায় সিজারের মতো সমুচ্চ সিংহাসন তাঁহার। শত্রুর সহিত সমরে তিনি নির্ভীক; সৈন্যচালনায় তিনি অশেষ কৌশলী; রাজ্য-শাসনে তিনি আলোকপন্থী; বিচারে তিনি ন্যায়ের প্রতীক হইয়াও করুণার-প্রতিমূর্ত্তি। এমন স্বচ্ছ-সুন্দর জীবন সহসা চোখে পড়ে না। তাঁহার ধর্ম্ম সাধারণ মানুষের; তাঁহার উপদেশ-বাণী। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরই ব্যাখ্যা; তাঁহার উপাস্য আল্লা অনন্ত প্রেম-করুণার আধার। নেতৃত্বের গোপন অন্তরালে এতোটুকুও তাঁহার জীবন নয়, ক্ষুদ্রতম গুপ্ত অভিসন্ধিও তাঁহার অন্তরের বাসিন্দা নয়। তিনি পরামর্শ করেন অনুচর সহচরদের সঙ্গে; তাহারাই তাঁহার মন্ত্রী, সহকর্ম্মী, বন্ধু। যখন যে কাজই তিনি করিতে চান, শুধু অন্যের প্রতি আদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন না। সকল কর্ম্মে, সকল সাধনায় তিনি নেতা—তিনি অগ্রগামী। শত্রু-সমরে, এমন কি সামান্য কুলি

মজুরের কাজে—রাষ্ট্রপতি হইয়াও তিনি সকলের সহকর্মী! ভুল মানুষের হইতে পারে; হজরতেরও কোনো ব্যাপারে ভুল হইয়াছে এবং সেজন্য তিনি কোর্‌আনের দুই এক স্থানে মৃদু তিরস্কারও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সহজভাবে নিজেরই প্রতি তিরস্কারবাণী তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি উপাসনা করেন, দান-খয়রাত করেন, দুর্গতের দুঃখ দূর করেন, ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করেন, দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, নিজের মাথায় করিয়া পাথর বহিয়া আনেন। এমনই মোহাম্মদ—নবী, রাষ্ট্রপতি, যুদ্ধবিজেতা হজরত মোহাম্মদ! মানুষের তিনি আদর্শ, কোর্‌আনের ভাষায় ওস্‌ওয়াতুন-হাসানা—মঙ্গল আদর্শ। এই আদর্শ মানুষটীর আদর্শ চরিত্র কোরেশের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা রটনার আবরণ ভেদ করিয়া আরব গোত্র-গুলির চোখে ধরা পড়িতে লাগিল। ইসলাম ও ইসলামের বাহন—হজরতের প্রতি তাহাদের মনে বিরুদ্ধতার বদলে সহানুভূতির প্রথম আভাষ জাগিয়া উঠিল। ইহাই হইল ইসলামের মহাবিজয়ের সূচনা—কোর্‌আনে যাহাকে বলা হইয়াছে 'ফত্‌হুম্‌ মুবীন্‌'।

মিত্র-বাহিনার পরাজয়ের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রগুলিকে দমন অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। হিজরী ছয় সালে ইব্‌নে-সালামির নেতৃত্বে একদল অশ্বসাদী সৈন্য পাঠানো হইল একটি বিরুদ্ধ গোত্রকে শায়েস্তা করিতে। ইব্‌নে সালামি দিনে বিশ্রাম করেন, রাত্রিতে পথ চলেন। মরুপথের উত্তাপ হইতে বাঁচিবার এ এক চমৎকার উপায়। হঠাৎ তিনি গিয়া শত্রুর উপর পড়িলেন। মুস্‌লিমের অতর্কিত আক্রমণে তাহারা দিশাহারা হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। কয়েক দিনের মধ্যেই ইব্‌নে-সালামি পঞ্চাশটি উট, তিন হাজার দুম্বা-মেষ লইয়া মদীনায় ফিরিলেন। গোত্রপতি বৃদ্ধ সামামাকে বন্দীদশায় হজরতের দরবারে আনা হইল। বৃদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর করুণায় গলিয়া গেলো। তিনি বন্দী দলপতির যোগ্য সম্মান দিলেন, বিনয়

সৌজন্যে তুষ্ট করিলেন। সামামা ভাবিয়াছিলেন : তাঁহার প্রতি শত্রুরই মতো কঠোর ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু নবীর দরবারে আসিয়া তিনি একি দেখিলেন! ইস্‌লামের উদারতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন; ইস্‌লামের সত্য স্বীকার করিয়া ধন্য হইলেন। রসুলুল্লাহ্‌ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন; আপন বংশের সর্দ্দারী দিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ফেরত পাঠাইলেন। তাঁহার মুখে নবধর্ম্মের মহিমার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে যে-ভাবে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া, সমস্ত গোত্রটাই মুস্‌লিম হইয়া গেলো।

এতোদিন ছিলেন তাঁহারা মদীনার শত্রু; এখন হইতে হইলেন কোরেশের জানী দুশ্‌মন্‌। উত্তর অঞ্চল হইতে মক্কার বাণিজ্যপথে তাঁহাদের বসতি। এই পথ তাঁহারা বন্ধ করিলেন। মক্কীয়দের ব্যবসায় বন্ধ হইল, খাদ্যাভাব ঘটিতে লাগিল। তথাপি সামামা পথ ছাড়িলেন না। অবশেষে মক্কার লোকদের দুরবস্থা চরমে উঠিল। নিরুপায় হইয়া তাহারা হজরতের দরবারে আবেদন করিল। স্বজাতির দুঃখে নবীর চিত্ত দুলিয়া উঠিল। তাঁহাকে—তাঁহার সত্যকে নিহত, নির্ম্মূল, নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য কোরেশ কতো অত্যাচার চালাইয়াছে, কতো ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কতোবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, মুস্‌লিমদের সহিত তাহাদের ব্যবহার কতো ভীষণ নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত হইয়াছে,—সমস্তই তিনি ভুলিয়া গেলেন। মক্কার মানুষ বুভুক্ষায় কাঁদিতেছে, বৃদ্ধ নারী শিশুর দল ক্ষুধার জ্বালায় ছট ফট করিতেছে—এই দৃশ্য মানস-চক্ষে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখনই তিনি সামামাকে লিখিয়া দিলেন : আমার স্বদেশবাসীকে রক্ষা কর; তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।

হজরতের এই ধরণের নম্র মধুর করুণ ব্যবহারে তাঁহার আশপাশের মানুষ মুগ্ধ হইয়া গেলো। শত্রুর উদ্যত তরবারির তলে দাঁড়াইয়া যে-ব্যক্তি আপনার সত্যে বজ্রকঠিন হইয়া থাকিতে পারে, তাঁহারই বুকের মাঝে একি

নিরুপম নারীর হৃদয়! মানুষ তাঁহার এই মহিমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিল, ইহাই ইসলামের মহাবিজয়—ফত্‌হুম্ মুবীন্।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে হজরত বিশ্বাসী অনুচরদের সঙ্গে লইয়া জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। এতোদিনে তাঁহাদের উপর দিয়া বিপদের কতো ঝঞ্ঝা বাত্যা বহিয়া গেলো। এখন কি তাঁহারা একবার নিরুপদ্রবে কা'বা দর্শন করিতে পারেন না? এখানে শত্রু মিত্র ভেদ নাই; কা'বায় তীর্থ করিবার সকলেরই সম অধিকার। তবে কেন তাঁহাদের কা'বা দর্শনে বাধা হইবে?

বৎসরের চারিটী মাস আরবের চক্ষে পবিত্র। এ-সময় হিংসা-হিংসি, রক্তারক্তি, লড়াই-ঝগড়া একেবারেই নিষিদ্ধ। কা'বায় তীর্থ করিবার মাসে কেহ কাহাকেও বাধা দিবে না, কেহ কাহাকেও আঘাত করিবে না—ইহাই আরবের চিরাচরিত বিধান। এই বিধানের বলে বুক বাঁধিয়া হজরত পবিত্র জিলকাদ মাসে তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। রসুলুল্লাহ্ কা'বা সন্দর্শনে যাইবেন শুনিয়া সমস্ত মদীনা ভাঙিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল; মদীনার পার্শ্ববর্ত্তী মুস্‌লিম বেদুইনরাও তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু হজরত তাহাদের নিরস্ত করিলেন। খুব বেশী লোক তাঁহার সঙ্গে গেলে কোরেশেরা ভাবিবে: মোহাম্মদ যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তিনি তাহাদের মনে এইরূপ একটা অমূলক আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিতে চান না। তিনি যাইবেন তীর্থ করিতে; কোরেশদের সঙ্গে লড়াই করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তাই মাত্র হাজার দু'য়েক লোক তাঁহার সহিত রওয়ানা হইল; পথে দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র তীর্থযাত্রীরা বহন করিতে পারেন না। হজরতের সহযাত্রীরাও সামান্য তরবারি ভিন্ন অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র লইলেন না। কোরেশদের মনে যাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ উদিত হইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কোর্‌বাণীর পশুগুলিকে আপনাদের আগে আগে চালাইয়া

দিলেন। কিন্তু এতো করিয়াও হজরত কোরেশদের নিশ্চিন্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা মুস্‌লিম তীর্থযাত্রীদের আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহাদের মক্কা-প্রবেশে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরামর্শ স্থির হইল : প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে। মক্কার আশে-পাশে সংবাদ গেলো : শিকার এবার হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! সকলে তৈরী হও। খালেদ-বেন্‌-ওলিদ, এক্‌রামা-বেন্‌-আবুজেহেল উত্তেজনার মুখে কয়েকশত অশ্বারোহী সৈন্য লইযা মুসলিমদের সহিত মুকাবিলা করিতে আসিল। কিন্তু তাহাদের পথ এড়াইযা হজরত ও তাঁহার সহযাত্রীরা মক্কার কাছাকাছি একটী জায়গায় গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। এই জায়গাটীর নাম হোদায়বিয়া।

খোজাআ বংশ পৌত্তলিক হইলেও মুস্‌লিম দলের বন্ধু! তাহাদের দলপতি বোদেল-বেন্‌-ওরকার মুখে হজরত শুনিলেন : কোরেশরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত! মুস্‌লিমদের তাহারা মক্কা-প্রবেশ করিতে দিবে না।

হজরত বোদেলকে বলিলেন : আমরা তীর্থ করিতে আসিয়াছি, যুদ্ধের জন্য আসি নাই। যুদ্ধে যুদ্ধে কোরেশদের সর্ব্বনাশ হইল! আর কেন? তার চেয়ে তাহারা আমার সঙ্গে সন্ধি করুক। সকলকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে দেওয়া হোক! সত্য করিয়া বলিতেছি, কারেশদের ধর্ম্ম-স্বাধীনতায় আমরা কখনো হস্তক্ষেপ করিব না! আব ইহাতে সম্মত না হইয়া যদি তাহারা যুদ্ধ করিতে চায়, আমরাও প্রস্তুত—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লড়িবার জন্য প্রস্তুত।

বোদেল কোরেশদের মজলিসে আসিয়া হজরতের কথা সমস্তই একে একে বলিলেন। নবীনেরা মুস্‌লিমদের মারিতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রবীণেরা শান্তভাবে সব দিক বিবেচনা করিতে লাগিল। সাকিফ-প্রধান ওর্‌ওয়া বলিল : মোহাম্মদের প্রস্তাব সঙ্গত, সুবিধাজনক। ইহাতে অমত করা উচিত নয়।

সত্যের প্রতিষ্ঠা

ওর্‌ওয়াই প্রথমে কোরেশদের দূতরূপে হজরতের কাছে আসিল। কিন্তু এখানে সে উল্টা সুর ধরিল। কোরেশ ও মক্কার আর আর গোত্রগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিনাযুদ্ধে মুসলিমদের তাহারা তীর্থ করিতে দিবে না। এ যুদ্ধে জয়ী হইয়া কোরেশদের ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কি পৌরুষ? আর যদি লড়াইয়ে তোমার হার হয়, তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে? এই ছোটলোকগুলি তখনই তোমাকে ছাড়িয়া পলাইবে।—এই ধরণের অনেক কথাই ওর্‌ওয়া বলিতে লাগিল। তাহার উক্তি শুনিয়া হজরতের সঙ্গীদের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ কয়েকদিন ধরিয়া তাহার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইলেন।

অবশেষে ওর্‌ওয়া কোরেশদলে ফিরিয়া আসিল। হজরতের সঙ্গে তাহার যে যে কথা হইয়াছে, সমস্তই খুলিয়া বলিল; আর বলিল তাঁহার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা :—"আমি অনেক রাজা-রাজড়ার দরবারে গিয়াছি, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্যের এমন গভীর নিদর্শন আর কোথাও দেখি নাই। খস্‌রু, সিজার, নিগাস্—কতো সম্রাটকে আমি দেখিয়াছি; তাঁহাদের মহামহিমাকে জিনিয়া শিষ্যমণ্ডলীর মাঝখানে মোহাম্মদের গৌরবের আসন। তোমরা এখনও সঙ্গত প্রস্তাবে সম্মতি দাও।

ওর্‌ওয়া চলিয়া গেলো। আরো কয়েকজন আরব সরদার পর পর হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। হজরত সকলকেই তাঁহার শান্তিপ্রিয়তার কথা বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা রসুলুল্লার নম্রমধুর ব্যবহারে, সাধুসঙ্গত শান্তি-প্রস্তাবে খুশী হইয়া আসিল। কোরেশরা বলে: মোহাম্মদ আমাদের মারিতে আসিয়াছে, প্রতিশোধের আগুন তাহার অন্তরে দাউ দাউ জ্বলিতেছে। কিন্তু কই, মদীনার রাষ্ট্রপতিকে দেখিলে, তাঁহার আন্তরিকতামাখা কথাবার্ত্তা শুনিলে, তাঁহার শান্তিপ্রস্তাব বিশ্লেষণ করিলে তাহা তো সত্য মনে হয় না।

আরব সরদারদের অনেকে কোরেশদের উপর চটিয়া গেলো, কাহারো কাহারো তাহাদের সঙ্গে অল্পবিস্তর বচসাও হইল।

ধূর্ত্ত কোরেশরা দেখিল: মোহাম্মদকে এতোদিন তাহারা যে মূর্ত্তিতে আরবদের সাম্‌নে খাড়া করিয়াছে, তাহা আর টিকিবে না। হজরতের অনুপম চরিত্রের চুম্বক-আকর্ষণ সহজেই তাহাদের চিত্তকে আপন করিয়া লইবে। তাই তাহারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে কোরেশদের সহিত মিটমাট করিয়া তীর্থদর্শনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্‌ ওসমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। কোরেশরা তাঁহাকে বলিল: ওসমান, তুমি আসিয়াছ, তুমি তীর্থ করিয়া যাও, মোহাম্মদকে আমরা কিছুতেই আসিতে দিব না। ইহা শুনিয়া ওসমান ভয়ানক চটিয়া গেলেন। বলিলেন: রসূলুল্লাহ্‌ তীর্থ না করিলে আমার তীর্থ করায় কি ফল? কথা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কোরেশরা কাল বিলম্ব না করিয়া মুসলিম দূতকে লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিল।

হোদায়বিয়ায় সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। রোষে ক্ষোভে তীর্থযাত্রীরা অধীর হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অপমানে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনায় হজরতও যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তীর্থকামী মুস্‌লিম দল নেতার হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন: ওসমানের শোণিতপাত যদি হইয়া থাকে, তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ না নিয়া আমরা দেশে ফিরিব না। সেজন্য যদি আমাদের প্রত্যেককে জীবন দান করিতে হয়, সে-ও স্বীকার! মুস্‌লিমদের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা—বায়াতে রেজ্‌ওয়ান্‌ কোরেশদের চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল। ইসলামপন্থীর মনের সাহস, বাহুর বল, ত্যাগের শক্তি, নিষ্ঠার তেজ তাহারা অনেকবার দেখিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে ভীষণতম পরীক্ষার সম্মুখে—সমরক্ষেত্রে ত্রিগুণ চতুর্গুণ দুর্মদ শত্রুর মুকাবিলায় মুস্‌লিমের অনম্যতা—অপরাজেয়তা কখনও ভুলিবার বস্তু নয়।

কোরেশ ক্রোধের বশে ক্ষণিকের জন্য তাহা ভুলিয়াছিল, কিন্তু বায়াতে রেজ্‌ওয়ান্ সে-ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। তাহারা তাড়াতাড়ি ওসমানকে ফেরত পাঠাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইল নূতন করিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে একজন দূত—সোহেল-ইব্‌ন্-আম্‌র্।

অনেক আলাপ আলোচনার পর সন্ধির শর্ত্তগুলি ঠিক হইল। হজরত আলী সন্ধিপত্র লিখিতে বসিলেন। ইসলামী প্রথায় শুরুতে লেখা হইল: বিস্‌মিল্লাহের্-রহমানের্-রহিম। সোহেল আপত্তি করিল। বলিল: উহা তোমাদের রীতি, আমরা উহা মানি না। কোরেশ-প্রথায় লেখা হোক: বেএস্‌মেকা আল্লাহুম্মা। হজরত বলিলেন: আচ্ছা, তাই হোক। তারপর আলী (রাঃ) লিখিলেন—রসুলুল্লাহ্ (আল্লার রসুল) মোহাম্মদ ও কোরেশদের মধ্যে এই সন্ধি। সোহেল বলিল—রসুলুল্লাহ্ লিখিলে চলিবে না। আমরা যদি তোমাকে রসুলই মানিব, তবে আর এত সব গোলযোগের প্রয়োজন কি? তার চেয়ে লেখা হোক: আবদুল্লার পুত্র……। হজরত ইহাতেও রাজী হইলেন। কিন্তু আলী বলিলেন: আমায় মাফ করিবেন, আমি 'রসুলুল্লাহ্' শব্দটী কাটিয়া দিতে পারিব না। হজরত তখন নিজের হাতে উহা কাটিয়া দিলেন। অতঃপর সন্ধির শর্ত্তগুলি লেখা হইল: (১) মুস্‌লিম ও কোরেশের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি হইল। ইহার মধ্যে কেহ কাহারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না। এক পক্ষের মিত্র গোত্রগুলিকেও অপর পক্ষ আক্রমণ করিবে না। (২) আরব গোত্রগুলির মধ্যে যাহার যে-দলের সহিত ইচ্ছা মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে। (৩) মোহাম্মদ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা এবৎসর হোদায়বিয়া হইতেই মদীনায় ফিরিয়া যাইবেন। (৪) আগামী বৎসর তাঁহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবেন, কিন্তু তিন দিনের বেশী মক্কায় থাকিতে পাইবেন না। (৫) মক্কা প্রবেশের সময় মুসলিমরা কোষবদ্ধ তরবারি ভিন্ন অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে

আনিবেন না। (৬) মক্কার মুসলিমদের মদীনায় যাইতে হজরত অনুরোধ বা বাধ্য করিবেন না। (৭) মুসলিম দলের কোন পুরুষ কোরেশদের নিকট পলাইয়া গেলে কোরেশরা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে না, কিন্তু মক্কার কেহ মুসলমানদের নিকট পলাইয়া গেলে মুস্‌লিমরা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

প্রথম দৃষ্টিতে সন্ধির সর্ত্তগুলি মুস্‌লিমদের পক্ষে অপমানজনক মনে হয়। এইজন্য এক দূরদর্শী আবুবকর ছাড়া আর সকল মুসলিমই হজরতের এইরূপ সন্ধি স্বীকারে প্রথমতঃ ঘোর অসন্তুষ্ট হইলেন। কোর্‌আনে মুস্‌লিমদের যে মহাবিজয়ের—ফত্‌হুম্‌-মুবীনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, এইবারেই তাহা ফলিয়া যাইবে,—তীর্থযাত্রীদের এই ছিল আশা। এ-আশা তাঁহাদের পূর্ণ হইল না; তাঁহারা দেখিলেনঃ হজরত যেন বেশ খানিক হীনতা স্বীকার করিয়াই এবারকার মতো ফিরিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে দুইটী উৎপীড়িত মুস্‌লিম—ইহাদের একজন শৃঙ্খলিত অবস্থায়—হোদায়বিয়ায় উপস্থিত হইল। তাহারা হজরতকে তাহাদের মদীনায় নিয়া আশ্রয় দিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া হজরত অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; মুস্‌লিমরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া হজরত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেনঃ আল্লা শীঘ্র তোমাদের দুর্দ্দশার প্রতিকার করিবেন। এই ব্যাপারে সন্ধির শোচনীয়তা যেন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তীর্থযাত্রীদলে অসন্তোষ গুঞ্জরিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হোদায়বিয়া সন্ধি বাহ্যতঃ মুসলিমদের পক্ষে অপমানজনক হইলেও ইহার পর হইতেই তাঁহাদের প্রকৃত মহাবিজয় শুরু হইল। হজরতের অনুপম চরিত্র-মাধুরী, ইসলামের আশ্চর্য্য উদারতা ক্রমে ক্রমে পাথরকে পানি করিতেছিল, শত্রুকে ক্ষমা ও তিতিক্ষা দিয়া আপনার জন করিয়া

তুলিতেছিল। যেন কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আরবনাট্যের দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। হোদায়বিয়ার শর্ত্ত অনুসারে হজরতে সঙ্গী ও সহচরেরা নানা কার্য্যে যত্রতত্র ভ্রমণের স্থবিধা পাইলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য আরব ইস্‌লামে আত্মসমর্পণ করিল। সন্ধির পর দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে মুস্‌লিম সমাজের লোক-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া গেলো।

বনু-কোরেজা গোত্রের চরম দণ্ডভোগের পরও ইহুদীদের চৈতন্যোদয় হইল না। তাহারা ইস্‌লামের সত্য গ্রহণ করিল না কিম্বা মুস্‌লিমদের বন্ধু হইয়া থাকিতেও রাজী হইল না। পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদী মুস্‌লিম আরবদের মধ্যে বিবাদটীকে চিরজাগ্রত রাখিয়া ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের সুযোগ করিয়া লইবার মতলব তাহাদের একেবারে পাইয়া বসিল। অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ তাহাদের অধিকারে। ইচ্ছা করিলে তাহারা মুসলিমদের যথেষ্ট বেগ দিতে পারে। তাহাদের ভাবগতি দেখিয়াও তাই মনে হয়। ইসলামের চিরশত্রু পৌত্তলিক গৎফান গোত্রের সহিত তাহারা মিতালী করিল। পলায়িত, বিতাড়িত, বিচ্ছিন্ন ইহুদী গোত্রগুলিকে তাহারা খায়বারে ডাকিয়া ঐখানেই কল্পিত ইহুদী রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র গড়িয়া তুলিল। সিরিয়ার সীমাদেশে খায়বর। এইজন্য বহুকাল হইতে স্থানটী স্বতই বাণিজ্যনিপুণ ইহুদী জাতির একটী বড়ো আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর হজরত মোহাম্মদ ও মুস্‌লিম জাতির প্রতি শত্রুতার বশে তাহারা উহাকে এখন দস্তুরমতো একটী সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করিল। মধ্যে এক বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল জনপদ; তাহার চারিদিকে ছোট বড়ো সুদৃঢ় সুরক্ষিত দুর্গ। এইখানেই ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন পাকিতে শুরু করিল।

প্রথম উদ্যমের উত্তেজনায় তাহারা স্থানে স্থানে মুসলিমদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। বাণিজ্যযাত্রীদের কাফেলা লুণ্ঠন, গৃহপালিত

পশু হরণ, শস্যনাশ প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রবে তাহাদের লড়ুয়ে মনোভাব ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ইহুদীদের গতিবিধি আঁ হজরতের সতর্ক চক্ষু এড়াইতে পারিল না। ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীর সংহত শক্তি অভিযান করিবার পূর্ব্বেই তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া তিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। মুস্‌লিম রাষ্ট্রশক্তি এখন আর নগণ্য নয়। আরবের সম্মিলিত বাহিনী তার লৌহ-কঠিন গাত্রে আহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তারপর মুস্‌লিম দলে আরো কতো কতো লোক আসিয়া ভিড়িয়াছে। সকলের সমবেত চেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধনৈপুণ্য, নেতৃত্ব-কৌশল—সব-বিষয়েই তাঁহারা আগের চেয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন আর ইহুদীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার পথে বাধা কি ?

হজরত আর কাল বিলম্ব করিলেন না। প্রায় চার হাজার পদাতিক ও দুই শত অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া তিনি মদীনা হইতে বাহির হইলেন। ইহুদী শক্তি চূর্ণ না করিয়া তিনি গৃহে ফিরিবেন না—এই তাঁহার পণ। ক'মাস ধরিয়া মুসলিম বাহিনী ইহুদী দমন করিয়া ফিরিল। কতো গোত্র বশ্যতা স্বীকার করিল ; কতো দুর্গের পতন হইল। দুর্ব্বার মুস্‌লিম শক্তির সম্মুখে ইহুদীদের বহুদিনের সঞ্চিত ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন তাসের তৈরী ঘরের মতো টুটিয়া পড়িতে লাগিল। নয়েম, ফদক, ওয়াদি-অল্‌-কোরা, ওয়াতিশ, সালালেম্, সকলের শেসে খায়বর মদীনার কাছে হার মানিল। ইহাদের মধ্যে খায়বরই লড়িয়াছিল প্রাণপণে। প্রায় তিন সপ্তাহ অবরোধের পরও খায়বরের পতন হইল না। কি করিয়া এখানকার দৃঢ়তম কামুস্ দুর্গ দখল করা যায়, হজরত ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আবুবকর ইসলামের পতাকা দুর্গশীর্ষে উত্তোলন করিলেন। কিন্তু ইহুদীদের পাল্‌টা আক্রমণের প্রচণ্ডতায় তিনি হটিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তারপর দিন ওমর মুস্‌লিম আক্রমণকারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহাতেও কোনো

সুবিধা হইল না। তৃতীয় দিন নেতা হইলেন আলী। এই দিন কামুস্ দুর্গের পতন হইল ; ইহুদীশক্তির শেষ আশ্রয় ভাঙিয়া গেলো।

খায়বরের পতন হইলে ইহুদীরা মদীনার আধিপত্য মানিয়া লইল, প্রচলিত নিয়মে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক অংশ মুস্লিম রাজসরকারে দিতে সম্মত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে হজরত তাহাদের ঘরবাড়ী ও জমিজমা সমস্তই তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলেন।

খায়বর যুদ্ধের পর ইহুদীরা হজরতের সহিত মৈত্রীর বন্ধন চিরস্থায়ী করিবার জন্য তরুণী সুফিয়াকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিল। যুদ্ধে সুফিয়ার স্বামী মারা যায় এবং সুফিয়া মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। আঁ হজরতের বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব, সুন্দর পুরুষোচিত কান্তি সহজেই সুফিয়ার চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহারই জন্য ইস্লামে দীক্ষা লইলেন। বন্দী নারী রাষ্ট্রপতির গৃহিণীপনার অধিকার লাভ করিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হইলেও হজরত দরিদ্র। খায়বরের যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেন নাই। নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিবাহ-সভায় আপন আপন ভোজ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সভাভঙ্গের পর সুফিয়া খায়বর-বিজেতার তাঁবুতে আসিলেন। তাঁহার জীবনের সে এক মহামুহূর্ত্ত।

কামুস্ দুর্গ-রক্ষক মাইব খাইবর যুদ্ধে মারা যায়। জয়নব তাহার ভগ্নী। জয়নবের স্বামী হারেস্। সেও যুদ্ধে নিহত হয়। স্বামী ও ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় জয়নব এক মতলব আঁটিল। শান্তির সম্মানার্থে সে এক ভোজের আয়োজন করিল। হজরত ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী নিমন্ত্রিত হইলেন। আহারে বসিয়া তিনি প্রথমে লোক্মা মুখে দিয়াই তাহা থু-থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে! কিন্তু এতো সতর্কতা সত্ত্বেও সামান্য একটু বিষ হজরতের উদরস্থ হইল। বিষে তাঁহার ওষ্ঠদেশ বিবর্ণ হইয়া গেল।

জয়নব ও তার সহকারীদের হজরতের নিকট উপস্থিত করা হইলে জয়নব স্বীকার করিল—হজরতকে হত্যা করিবার জন্যই সে খাদ্যে বিষ মাখাইয়াছিল। জয়নবের কথা শুনিয়া হজরত হাসিয়া বলিলেন—"তা হইবার নয়—আল্লাহ্ তোমার ইচ্ছা কখনো পূর্ণ করিবেন না।"

খায়বার-বিজয়ী সাহাবীরা উত্তেজিত হইয়া জয়নবকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলেন। হজরত অনুমতি দিলেন না—জয়নবকে ক্ষমা করিলেন। হজরতের জয়গানে খায়বরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল।*

হোদায়বিয়া সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে তীর্থের মৌসুমে হজরত মক্কায় চলিলেন। কিন্তু খুব বেশী লোকজন সঙ্গে লইলেন না। কোরেশপ্রধানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না, কিন্তু বিতাড়িত লাঞ্ছিত মোহাম্মদ অনুচরদের সঙ্গে লইয়া মক্কার বুকে তিনটী দিন বিচরণ করিবে, এ দৃশ্য দেখিবার মতো ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহাদের ছিল না। তাই তাহারা তীর্থের তিনটী দিন মক্কার বাহিরে চলিয়া গেলো। হজরত জনসাধারণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমান সহিয়াও বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। আপনার মনে হজ্ সমাপ্ত করিয়া তিনি মদীনায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সাধারণের অগোচরে তিনি তাঁহার চরিত্র-মাধুরী দিয়া অনেক-গুলি হৃদয় জয় করিয়া গেলেন।

এখন আর আঁ হজরত যে-সে লোক নন। তিনি শুধু তাঁহার জীবনকালের নন, তিনি যুগের; শুধু যুগেরও নন, তিনি চিরকালের। মক্কায় থাকিতেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল: ইস্‌লাম শুধু কোরেশের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য, নিখিল বিশ্বের জন্য। ইস্‌লামের আল্লা রব্বুল্-আ'লামিন্ বিশ্ব-ভুবনের মালিক। তিনি রব্বুন্নাস্, মালিকুন্নাস্, এলাহিন্নাস্—মানুষের প্রভু,

* বশ্‌রকে হত্যা করার অপরাধে পরে জয়নবের মৃত্যুদণ্ড হয়।

মানুষের মালিক, মানুষের উপাস্য। শুধু খৃষ্টান, ইহুদী বা মুস্‌লিমের উপাস্য তিনি নন, সমস্ত সৃষ্টির—সমস্ত জড় ও জীবের তিনি অধিপতি। সুতরাং ইসলামের সত্য জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া, ইহার দিকে সকল মানুষকে আমন্ত্রণ করা হজরত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। এতোদিন আরবের বাহিরে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা হয় নাই; এখন তাহাই হইল। একদিন জুমার নামাজের পর হজরত সহচরদের বলিলেন: বিদেশী রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াৎ দিয়া দূত পাঠাইতে হইবে। কাহাকে কোথায় পাঠাইলে ভালো হয়, তোমরা ঠিক করিয়া দাও।

ইরাণের অধিপতি খসরু পর্‌ভেজ্। তাঁহার দরবারে গেলেন আবদুল্লা-বেন্-হুজাফা। হজরত একখানি পত্রে অগ্নিপূজক খসরুকে ইস্‌লামের সত্যে আহ্বান করিলেন। পত্রখানির উপরে সিলমোহরে লেখা রহিল: মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লাহ্। খসরু একজন অনুবাদককে উহা পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। অনুবাদক পড়িল:

'আল্লার রসুল মোহাম্মদ ইরাণ-অধিপতি খসরুর প্রতি…' পত্রের এইটুকু শুনিয়া পরভেজ জ্বলিয়া উঠিলেন। সামান্য একজন আরব—মোহাম্মদ, সে মহামহিম খস্‌রুর নামের পূর্ব্বে তাহার নিজের নাম বসাইয়াছে! রাগের মুখে খস্‌রু হজরতের চিঠিখানি ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। এমনের শাসনকর্ত্তা—বাজানকে এক জরুরী হুকুমনামা পাঠাইলেন: "এখনই লোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার দরবারে হাজির কর।" মুস্‌লিম দূত ফিরিয়া হজরতকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন: "আল্লা খসরুর সাম্রাজ্যও ঐভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবেন।"

ইহার পর বাজানের লোকজন হজরতকে খস্‌রুর নামে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। কিন্তু তাহারা গ্রেপ্তার করিবে কি? হজরতের অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আশ্চর্য্য চরিত্র দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গেলো। হজরত

বলিলেন : বাজানকে গিয়া বল—খসরুর মহিমাকে জিনিয়া আমার ধর্ম্ম, আমার সাম্রাজ্য শীঘ্রই বিস্তৃত হইবে। বাজানকে আমি ইস্‌লামের সত্যে আহ্বান করিতেছি। তিনি মুস্‌লিম হইলে শাসনকর্ত্তার পদ তাঁহারই থাকিবে।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল : সয়োস্‌ তাঁহার পিতা খস্‌রু পরভেজকে হত্যা করিয়াছেন, যেমন খস্‌রু তাঁহার পিতা হরমুস্‌কে মারিয়াছিলেন। বাজানের সম্মুখে যে বাধা ছিল, দূর হইল। তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন।

দেহিয়া কাল্‌বী হজরতের একজন বিশ্বস্ত লোক। তিনি সুচতুর সুপণ্ডিত। তাঁহাকে রোমসম্রাটের দরবারে পাঠান হইল। কাল্‌বী এই পত্র লইয়া গেলেন :

"করুণাময় কৃপানিলয় আল্লার নামে—আল্লার দাস ও রসুল (প্রেরিত ভাববাদী) মোহাম্মদের পক্ষ হইতে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সমীপে। সত্যপথচারীদের প্রতি সালাম (শান্তিবাণী)। আমি আপনাকে ইসলামের সত্যে আমন্ত্রণ করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে, আল্লা আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন। আর যদি ইহাতে অসম্মত হন, আপনার প্রজাসাধারণের পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে। (অতঃপর কোর্‌-আনের একটী আয়াত পত্রে সংযোজিত হইল)। হে গ্রন্থধারিগণ (খৃষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি জাতিগণ), এসো আমরা একযোগে সত্যপথ অবলম্বন করি। আমরা আল্লা ছাড়া আর কাহারো পূজা করিব না; তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও আমাদের প্রভু মানিব না। আর যদি তাহারা ইহাতে অসম্মত হয়, তবে, (হে মুস্‌লিমগণ) তাহাদের বলিয়া দাও : তোমরা সাক্ষী থাকিও আমরা মুস্‌লিম।"

পত্র পড়িয়া হেরাক্লিয়াস্‌ মুগ্ধ হইলেন। তিনি মুস্‌লিম দূতকে রাজোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ডাকিয়া তিনি এক সভা করিলেন। সেখানে পুরোহিতগণ

আসিলেন। রোম রাজ্য-সীমায় যেখানে যতো আরব দেশবাসী খুঁজিয়া পাওয়া গেলো, সকলকে আনিয়া হাজির করা হইল। মক্কার প্রধান আবু-সুফিয়ান বাণিজ্যের জন্য গাজায় আসিয়াছিল, সে-ও আসিল। সিজার হেয়াক্লিয়াস্ হজরতের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও এতোগুলি লোকের সম্মুখে—বিশেষতঃ মহিমান্বিত রোম-সম্রাটের দরবারে মিথ্যা বলিবার সাহস তাহার হইল না। সে বলিল : হাঁ মহারাজ, মোহাম্মদের শিষ্য-সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

দেহিয়া রোম-সম্রাটের দরবারে গিয়াছেন। এদিকে মিসরপতি কপ্‌ত্‌-রাজ মকৌকাস্-এর দরবারে গেলেন হাতিব্। মকৌকাস্ গ্রীকদের অধীনতায় মিসর শাসন করিতেছিলেন ; কিন্তু প্রভুজাতির উপর তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। শুধু বিরক্ত নয়, গ্রীকদের তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণাই করিতেন। তথাপি প্রকাশ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার যথেষ্ট ছিল। সুতরাং মুসলিম তিনি হইলেন না, হজরতের দূতকে সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, একটী শ্বেত অশ্বতর, মিসরে প্রস্তুত কিছু কাপড, কিছু মাখন ও মধু এবং অন্যান্য উপঢৌকন দিয়া বিদায় দিলেন।

আবিসিনিয়ার রাজদরবারেও হজরত একজন দূত পাঠাইলেন। মক্কায় অত্যাচারিত মুসলিম দল পলাইয়া আবিসিনিয়ায় গিয়া নেগাসের কাছে কিরূপ সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। অবশেষে হজরতের দূত যখন তাঁহার দেশে ইসলামের দাওৎ লইয়া গেলেন, নেগাস্ আস্‌হামা নিঃসঙ্কোচে নব সত্যের সেবক হইলেন।

সিরিয়ার সীমাচুম্বী একটী মধ্য-আরব রাষ্ট্রের অধিনায়ক গাসান গোত্র। ইহারা খৃষ্টান। শুরাহ্‌বিল্-ইব্‌ন্-আম্‌র্ ইহাদের প্রধান। ইসলামের দূতকে এই খৃষ্টান দলপতি বিদ্রূপ করিয়া বলিল : আমি নিজেই তোমার পত্রের উত্তর

নিয়া আসিতেছি। দূত ইহা শুনিয়া মদীনার পথে ফিরিলেন। কিন্তু খানিক দূর আসিয়াই একটী বেদুইনের হাতে মারা পড়িলেন। বেদুইনটী শুহ্‌রা-বিলের ইঙ্গিতক্রমেই দূতকে আক্রমণ করে। হজরতের কাছে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি এই অন্যায়ের প্রত্যুত্তর দিবেন, মনস্থ করিলেন।

এমামা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হাওয়াজা মুস্‌লিম দূতকে বলিল: মোহাম্মদকে গিয়া বল—ফের যদি সে তাহার ধর্ম্মের কথা আমাকে বলে, আমি মদীনা আক্রমণ করিব।

হজরত শুনিয়া বলিলেন: তাহাকে কষ্ট করিয়া এতদূর আসিতে হইবে না।

পারস্য উপসাগরের উপকূলে বাহ্‌রায়েন প্রদেশ। মোনজার ইহার অধিপতি। তিনি ও তাঁহার রাজ্যের আরববাসিন্দারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ওস্মান প্রদেশের অধিপতি জায়কর ও তাঁহার কনিষ্ঠ আব্‌দ্ মুস্‌লিম মণ্ডলীর অন্তর্গত হইলেন।

এতো গেলো রাজা-রাজড়াদের কথা। এ-ছাড়া সাধারণ অসাধারণ বহু আরবের চিত্তে ইসলাম ধীরে ধীরে আপনার অধিকার বিস্তার করিল। ওহোদের আরব বীর খালেদ-বেন-ওলিদ, নেগাসের দরবারে প্রবাসী মুস্‌লিমদলের বিরুদ্ধবাদী কোশের দূত আম্‌র্‌-ইব্‌নুল্‌-আস্, কা'বার রক্ষক ও সেবক ওস্‌মান-ইব্‌ন্‌-তালহা মদীনায় আসিয়া হজরতের সত্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। কোরেশদের মেরুদণ্ড প্রায় ভাঙিয়া পড়িল। তাহারা শতচেষ্টা করিয়াও ইসলামের দুর্ব্বার গতি রোধ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের সম্মুখে নিরাশার নীরন্ধ্র অন্ধকার।

সিরিয়ার অন্তর্গত বস্‌রার খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা শুহ্‌রাবিলের ইচ্ছায় মুস্‌লিম দূত হারেস্ নিহত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি। হজরত এই নিরপরাধ দূতহত্যার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। ওদিকে বদ্ধিষ্ণু

মুসলিম শক্তির সহিত মুকাবিলা করিবার জন্য শুহ্রাবিলও প্রস্তুত। তাহার প্ররোচনায়—খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের উত্তেজনায়—নানাস্থান হইতে খৃষ্টান সৈন্য সংগৃহীত হইল। তাহার নিজের ও সংগৃহীত সৈন্য মিলিয়া প্রায় একলক্ষে দাঁড়াইল। হজরত জানিতেন: বস্‌রা আক্রমণ করিলে হয়তো বাইজান্টিয়াম্ ক্ষেপিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইসলামের নামে তিনি সাহসে বুক বাঁধিলেন। পরাক্রান্ত গ্রীক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটী আরব রাজ্যের অভ্যুত্থান ইতিহাসে এই প্রথম। কে জানে, হয়তো এই অভ্যুত্থানের ফলেই—কালে—সিজারদের সাম্রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইবে! হজরত কি ভবিষ্যতের বুকে তাহার অস্পষ্ট আভাষ দেখিয়াছিলেন?

মোটের উপর রসুলুল্লাহ্ বস্‌রার বিরুদ্ধে অভিযানে একটু বেশী রকম হুশিয়ার হইলেন। তিন হাজার মুসলিম সৈন্য—জায়দের সেনাপতিত্বে শুহ্রাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। হজরত বলিয়া দিলেন: জায়দের পতন হইলে জাফর, জাফরের পর আবদুল্লা-বেন-রওয়াহা সেনাপতিত্ব করিবেন। আবদুল্লার যদি পতন হয়, মুসলিম সৈন্যদল নিজেরাই সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এই বলিয়া তাহাদের আল্লার হাতে সঁপিয়া দিলেন। নবদীক্ষিতের নূতন তেজ ও আকুল আগ্রহ লইয়া ইস্‌লামের ইজ্জত রক্ষা করিতে অভিযাত্রী দলের যাত্রা শুরু হইল।

মূতা প্রান্তরে যুদ্ধ বাধিল। একদিকে লক্ষ গ্রীক-রোমান সৈন্য, অন্যদিকে তিন হাজার মাত্র পথশ্রান্ত মুস্‌লিম। অসমান যুদ্ধ মুসলিমদের আজ নূতন নয়, কিন্তু তেত্রিশ চৌত্রিশ গুণ সুদক্ষ সুসজ্জিত সৈন্যের সহিত তাঁহাদের মুকাবিলা এই প্রথম। তথাপি বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ মুস্‌লিম মুশ্‌কিল ভাবিলেন না। জায়দ বিবি খদিজার ক্রীতদাস, হজরতের পালিত পুত্র। হজরত আলীর ভ্রাতা জাফর, সমস্ত আনসার ও মোহাজের সৈন্য, তাঁহার আজ্ঞাধীন। জাফর তরুণ মুস্‌লিম। তিনি বংশ-মর্য্যাদার মোহে জায়দের নেতৃত্বে মৃদু আপত্তি

তুলিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত বলিয়াছিলেন: জাফর, জায়দই তোমাদের নেতা। এ ব্যবস্থায় কি পরম কল্যাণ নিহিত আছে, তুমি জান না। জাফর আর আপত্তি করেন নাই। তিনি, তাঁহার মতো তিন সহস্র মুস্‌লিম আজ জায়দের সেনাপতিত্বে এক লক্ষ শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। জায়দ কৌশলী সেনাপতির মতো সৈন্য চালনা করিলেন। কিন্তু বিপক্ষ দল নৈপুণ্যে কম নয়। তিনি ইসলামের পতাকাহস্তে রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। জাফর সেই পতাকা তুলিয়া ধরিলেন। শেরে-খোদা আলীর ভ্রাতা তিনি সিংহবিক্রমে শত্রুদের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারও পতন হইল।

তাঁহার পর আবদুল্লা সৈনাপত্য করিলেন। ইসলামের শ্বেত পতাকা তুলিয়া তিনি মুসলিম সৈন্যদের উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু তিনিও শত্রুর আঘাতে ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন।

অল্প ক'দিনের ভিতরেই মুস্‌লিমদের তিন তিন জন সেনাপতি নিহত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যেন বেশ খানিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আবদুল্লার পরে কে সেনাপতি হইবেন, সৈন্যরাই স্থির করিবেন। কিন্তু ভীষণ যুদ্ধ-ঘূর্ণীর অস্ত্র-ঝন্‌ঝনার মধ্যে যখন প্রত্যেকটী মুসলিম সৈন্য রণমাতাল হইয়া উঠিয়াছে, এক হইতে অন্য জন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কে তাঁহাদের সেনাপতি নির্ব্বাচন করে? নেতার উৎসাহ-ধ্বনি থামিয়া গিয়াছে, ইসলামের সমর-নিশান অবনমিত হইয়াছে। এ সময় কে মুসলিমদের অভয়বাণী শোনায়? কয়েকটি সৈন্য ব্যাপার দেখিয়া মদীনার পথ লইল। ইতিমধ্যে বীরকেশরী খালেদ-বিন-ওলিদ ভীমনাদে মদীনার বিজয় বৈজয়ন্তী তুলিয়া ধরিলেন। বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল যেন অকূলে কূল পাইল। আবার তাহারা সুবিন্যস্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

হজরত মুতা অভিযানের বিপদ-সম্ভাবনা জানিতেন। তিনি প্রথম সৈন্যদল রওয়ানা করিয়া দিবার ক'দিন পরেই দ্বিতীয় আর একদল যোদ্ধা

তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলেন। খালেদ মুসলিম সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইলেন। শুধু রণকৌশল নয়; তিনি যেন কোনো অলৌকিক শক্তিবলে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া বিস্ময়কর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতির আশ্চর্য্য আদর্শে সমস্ত মুসলিম সৈন্যের বল-বীর্য্য বহুগুণ বাড়াইয়া দিল। বিজয়ে বীরত্বের পুরস্কার, সহস্র কণ্ঠে যশোকীর্ত্তন; মরণে শহীদের অনন্ত সৌভাগ্য—সীমাহীন স্বর্গ-সুখ। প্রত্যেকটি মুসলিমের সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ: "হব জয়ী, নয় হইব শহীদ মৃত্যু সহিয়া যুদ্ধ মাঝ।" এ-ছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা তাহার নয়। এই দুইটি সম-প্রশস্ত, সমান মহান্ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মুসলিম বীরদল অপূর্ব্ব শৌর্য্যে জীবন-মৃত্যুর ভীষণ খেলা খেলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। রাত্রির অন্ধকারে উভয় দল শিবিরে ফিরিয়া গেলা।

মদীনার সাহায্য যথাসময়ে পৌঁছিল। প্রভাতে খালেদ অপূর্ব্ব কৌশলে সেনা-বিন্যাস করিলেন। বোধ হইল যেন বহু সহস্র মুসলিম সৈন্য মুতা ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা ও আশ্চর্য্য বীরত্বে গ্রীক-রোমান সৈন্যদল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর আজ এই দূরপ্রসারী যোদ্ধসন্নিবেশ দেখিয়া তাহারা প্রমাদ গণিল। লড়াই আরম্ভ হইবার খানিক পরেই লক্ষ সৈন্য লক্ষ্য হারাইয়া দিগ্বিদিক ছুটিতে শুরু করিল। একা খালেদের হাতেই নয়খানি তরবারি ভাঙিল। মুসলিম দলে তাঁহার নাম হইল সায়্ফুল্লাহ্—আল্লার তরবারি।

শত্রুর পরিত্যক্ত বহু দ্রব্যসম্ভার লইয়া মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরিল। নিহত বীর শহীদদের সামরিক সম্মান-সমারোহে সমাহিত করা হইল। রসুলুল্লাহ্ শহীদদের প্রাণদানে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিলেন। জাফরের শিশু-পুত্র, জায়দের বালিকা কন্যাকে দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত

করিতে লাগিলেন। বন্ধু বিস্মিত হইয়া বলিলেন: একি দেখিতেছি, হজরত! রসুলুল্লাহ্ কহিলেন: বন্ধুর জন্য বন্ধুর বেদনার অশ্রু এ!

লক্ষ সৈন্যের সহিত মুকাবিলা করিয়া মদীনার মুস্‌লিম সমাজ শান্তির আশা করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ বিশ্রাম তাঁহাদের অদৃষ্টে ছিল না। মক্কার বাসিন্দারা হোদায়বিয়া সন্ধিপত্রে হজরতের কাছে আশ্চর্য্য উদার ব্যবহার পাইয়াও মুস্‌লিমদের প্রতি শত্রুভাব ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। হাতয়াজিন্ ও সাকিফ গোত্র দুইটির সঙ্গে তাহারা আবার নূতন করিয়া ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল। ষড়যন্ত্রের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। হোদায়বিয়া সন্ধি অনুসারে বনু খোজাআ মদীনার এবং খোজাআর চিরশত্রু বনু-বক্‌র্ মক্কার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল। কোরেশের চেষ্টা হইল বনু-বক্‌র্ গোত্রের দ্বারা খোজা-আর সর্ব্বনাশ করিয়া হোদায়বিয়া সন্ধি ভাঙিয়া ফেলা। বক্‌র্ গোত্র সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং কোরেশদের নেতৃত্বে খোজায়ীদের অতর্কিত-ভাবে আক্রমণ করিল। রাত্রির অন্ধকারে যাহাকে যে-অবস্থায় পাইল হত্যা করিয়া মনের সাধ মিটাইল। ইহাতেও তাহাদের তৃপ্তি হইল না। কা'বা গৃহে ভীষণতম শত্রুও অবধ্য। এইজন্য খোজায়ীরা সেখানে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু কা'বার চির পুরাতন পবিত্রতার সম্মুখেও ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্র অবনমিত হইল না। এখানেও পলায়িত খোজায়ীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল।

বনু খোজাআর পক্ষ হইতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ মদীনায় পৌঁছিল। হজরত সব কথা শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। সন্ধির শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কোরেশরা মুস্‌লিমদের এই নিরপরাধ মিত্র গোত্রটির ধনপ্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে। ইহার প্রতিকার না হইলে মদীনার রাষ্ট্র নামধারণ বৃথা, তাঁহার সম্মান-প্রতিপত্তির দাবী একেবারেই মূল্যহীন। তাই হজরত ন্যায়ের নামে যুদ্ধের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

সত্যের প্রতিষ্ঠা

ইতিমধ্যে মক্কার প্রধান আবু সুফিয়ান মদীনার মনোভাব ও সমরায়োজনের খবর পাইলেন। উত্তেজনার বশে সাকিফ ও হাতয়াজিনদের প্ররোচনায় কোরেশরা হঠাৎ মুসলিমদের ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখিয়া কোরেশ-নেতা নিজেই মদীনায় যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাঁহার কন্যা ওম্মে হাবিবা ইস্‌লামের প্রথম আহ্বান শুনিয়াই সত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন রসুলুল্লার সহধর্ম্মিণী, ওম্মে হাবিবার কাছে গিয়া আবু সুফিয়ান্ তাঁহার মারফতে মুসলিমদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। আলী, আবুবকর, এমন কি স্বয়ং হজরতের কাছে আবেদন করিয়াও কোনো সুবিধা হইল না। রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রসুলুল্লার ক্ষমা, তিতিক্ষা ও শান্তিপ্রিয়তার উর্দ্ধে। তিনি ব্যক্তিগত অপমান সহিয়াও নীরব থাকিতে পারেন; কিন্তু সন্ধিপত্রের অমর্য্যাদা—মিত্র জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমার অযোগ্য ; তাই হজরত কোরেশের প্রতি অসীম প্রেম পোষণ করিয়াও যুদ্ধের আদেশ দিলেন।

হাতেব মদীনার একজন মুস্‌লিম। তাঁহার পরিজনবর্গ ছিলেন মক্কায়। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বিপদ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি গোপনে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধায়োজনের সংবাদ দিলেন। কোরেশরা তাঁহার এই উপকারে খুশী হইয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, এই ছিল তাঁহার আশা। কিন্তু তাঁহার গোপনে সংবাদ দেওয়ার কথা বাহির হইয়া পড়িল ; তাঁহার প্রেরিত চিঠিখানি রাস্তায় ধরা পড়িল। হাতেবের বিচার হইল। ওমর বলিলেন: শত্রুকে সামরিক সংবাদ দেওয়া গুরু অপরাধ। ইহাতে হাতেবের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু হজরত বলিলেন: ওমর, হাতেব বদর যুদ্ধে আমাদের সঙ্গী ছিল। উহাকে ছাড়িয়া দাও।

ইতিমধ্যে হজরত কোরেশদের নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। দূত মক্কায় গিয়া দলপতিদের নিকট তিনটি বৈকল্পিক প্রস্তাব উপস্থিত

করিলেনঃ (১) বনু-খোজাআদের হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদণ্ড দেওয়া হোক, অথবা (২) কোরেশরা বনু-বক্‌র্‌ গোত্রের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুক, অথবা (৩) হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রত্যাহার করা হোক।

কোরেশগণ শেষোক্ত প্রস্তাব মানিতে সম্মত হইল। বস্তুতঃ হোদায়বিয়া সন্ধি ভাঙ্গিয়া হাতয়াজেন ও সাকিফ গোত্রের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলে মদীনার শক্তি চূর্ণ করিবার চেষ্টা আর একবার করিয়া দেখা যাইতে পারে, ইহাই ছিল তাহাদের মনোগত 'অভিপ্রায়। এইজন্য তাহারা প্রস্তাব মাত্র তৎক্ষণাৎ হোদায়বিয়া সন্ধির সমাধি সাগ্রহে ঘোষণা করিল।

তখন যুদ্ধযাত্রা ভিন্ন হজরতের সম্মুখে আর কোনো পথ খোলা রহিল না। হিজরীর আট সালের ১৮ই রমজান। রসুলুল্লাহ্‌ দশ হাজার মুসলিম সৈন্য লইয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চলিলেন। হোদায়বিয়া সন্ধি ভাঙিয়া কোরেশরা কর্ত্তব্য স্থির করিতেছে। ইতিমধ্যে সহসা এক রাত্রিতে মক্কার পার্শ্বে মরর্‌ অধিত্যকায় দশ হাজার মশাল জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আবু-সুফিয়ান ও বোদেল-বেন্‌-অরকা বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দূরে মশালের আলো লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতেছেন, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে কয়েকটী মূর্ত্তি বাহির হইল। তাহারা বজ্রকণ্ঠে বলিলঃ ঐখানে দাঁড়াও, তোমরা বন্দী!

হজরত ওমর একদল রক্ষী সৈন্য লইয়া রাত্রিতে রোঁদে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হাতেই কোরেশ-দলপতি বন্দী হইলেন। দীর্ঘ একুশটী বৎসর কোরেশরা এতো যে অত্যাচার চালাইয়াছে, এতোভাবে এতোরূপে এতোবার যে ইসলামকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে, সে সব কথা হজরতের মনে একটীও দাগ কাটিতে পারে নাই। আবুসুফিয়ানকে দেখিয়াই তাঁহার অন্তর করুণায় গলিয়া গেলো। তিনি প্রীতিপেলব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আবু-সুফিয়ান, এখনো কি তুমি সেই নিরংশ নিষ্প্রতিম অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাকে

চিনিতে পার নাই ? কোরেশ দলপতির মুখ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন। তিনি বলিলেন : তা কিছু কিছু পারিতেছি বই কি ? দেবতাগুলি আমাদের সাহায্যে তো আসিল না ! হজরত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : আচ্ছা, আমাকে কি তুমি আল্লার রসুল (রসুলুল্লাহ্) মানিতে পার ? আবু-সুফিয়ান বলিলেন : এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু কোরেশ-দলপতির সন্দেহ দূর হইতে বিলম্ব হইল না। হজরতের পিতৃব্য আব্বাস্ প্রভৃতি অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আবু-সুফিয়ানও তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিলেন।

প্রভাতে দশ সহস্র মুস্লিম সৈন্য মক্কা প্রবেশের জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। বিভিন্ন সৈন্যদল এক একজন নেতার অধীনতায় নগরের বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। জোবায়ের, সা'দ, আলী, খালেদ প্রভৃতি সেনানায়কেরা স্বস্ব সৈন্যদল সহ মক্কার দ্বারদেশে উপস্থিত। হজরত পশ্চাদবর্ত্তী সৈন্যদলের সঙ্গে চলিয়াছেন। শত্রুজেতার দর্পদম্ভের ছায়ামাত্র আজ তাঁহার প্রশান্ত বদনকে স্পর্শ করে নাই। ক্রীতদাস জায়দের পুত্র ওসামার সঙ্গে তিনি এক উষ্ট্রে মক্কার পথ ধরিয়াছেন। চক্ষে তাঁহার প্রীতির মায়া, বক্ষে তাঁহার অনন্ত ক্ষমার উৎস। তিনি প্রত্যেক সেনাপতিকে আদেশ দিয়াছেন : সাবধান, আজ যেন কাহারও প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করা না হয় ! আবু-সুফিয়ান হজরতের অভয়বাণী প্রচার করিয়াছেন : যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিবে, কা'বায় অথবা আবু-সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে কিম্বা নিজ নিজ গৃহে গৃহে আবদ্ধ থাকিবে, তাহাদের আজ কোনোই আশঙ্কা নাই। মক্কীয়দের দর্প আজ চূর্ণ হইয়াছে, তাহারা কোনো সেনাপতিকেই বাধা দিতে সাহস করিল না। কিন্তু একরামা বিন আবুজেহেল একদল কোরেশ সৈন্য লইয়া খালেদের গতিপথ রুদ্ধ করিল। হজরত দূর হইতে প্রভাতী সূর্য্যের কিরণে অস্ত্রের চমক দেখিযা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন : এ কি দেখিতেছি !

আমি কি আজ অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করি নাই? খালেদ কৈফিয়ৎ দিলেন: কোরেশরাই আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল, আমরা আত্মরক্ষা করিয়াছি মাত্র! হজরতের অভয়দানের পরেও মক্কীয়েরা কোরেশ ও অনুগত গোত্রগুলির দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ লোকদের গোপনে সমবেত করিয়াছিল। একস্থানে মুসলিমদের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া সুবিধা বুঝিলে সর্ব্বত্রই আক্রমণ চলিবে, এই ছিল তাহাদের মতলব। কিন্তু মুসলিমবাহিনী রণ-বিন্যাসে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সহিত সংগ্রামের চেষ্টা বৃথা! হজরত ব্যাপার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। সকলকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে আবু-সুফিয়ান হজরতের কাছে আসিয়া বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিলেন: মোহাম্মদ, আজ যদি কোরেশদের তুমি ধ্বংস কর তাহাদের নাম নিশানা আর পৃথিবীতে থাকিবে না। রসুলুল্লাহ্ তাহাদের আবার ক্ষমা করিলেন, ধনপ্রাণ সম্পর্কে আবার অভয়বাণী শুনাইলেন।

আজ দীর্ঘ একুশটী বৎসর পরে হজরত বিজয়ীর বেশে জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করিতেছেন। দশ হাজার বর্শাফলক সূর্য্যকিরণে চমকিত হইয়া যেন বিদ্যুৎ হানিতেছে। ইসলামের জয় পতাকা পত্ পত্ শব্দে বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। কণ্ঠের আনন্দ সঙ্গীত, ঢোলকের বিজয়-বাজনা আজ মুস্লিম নেতাকে অভিবাদন জানাইতেছে। চারিদিকে জনতা। হজরতের প্রত্যেকটী চাহনী, প্রতিটী অঙ্গভঙ্গি আজ সহস্র সহস্র নরনারীর বাল-বৃদ্ধের কুতূহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইসলাম-ঘোষণার প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা নবসত্যের সেবক ও অনুগামীদের উপর যে অসহ অত্যাচার চালাইয়াছে, সব কথা একে একে তাহাদের স্মৃতিপথে আসিয়া ভিড় জমাইতেছে, আর তাহার স্বাভাবিক পরিণাম—ন্যায়সঙ্গত দণ্ডের চিত্র তাহাদের নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। হজরত তাহাদের সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছেন, সকল অন্যায় ক্ষমা করিয়া অভয় দিয়াছেন; তথাপি

তাহাদের ব্যগ্র ব্যাকুল চাহনি আজ তাঁহারই প্রতি বিন্যস্ত। সত্যই কি হজরত ক্ষমা করিবেন? এতো অত্যাচার ক্ষমা করা কি বস্তুতঃ মানুষের পক্ষে সম্ভব? এতো ষড়যন্ত্র, এতো বিশ্বাসঘাতকতা, এতো নৃশংসতা কি বিস্মৃতির যোগ্য? মক্কাবাসীর চিত্ত আজ সংশয়-সন্দেহে দোল্ খাইতেছে, আবার রসুলুল্লার প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ভরসায় তাহারা বুক বাঁধিতেছে। ওদিকে স্নেহ-করুণার প্রতিমূর্ত্তি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সমস্ত জয়-সাফল্যের পরম প্রদাতা আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মস্তক অবনত করিতেছেন। কা'বা যতোই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততোই সেই মহামহিমের—আজিকার এই মহাবিজয়ের প্রতিস্রোতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতায় তিনি গলিয়া পড়িতেছেন।

সাধারণ আরবী পোষাকে—দশ সহস্র তারকাপুঞ্জের মাঝখানে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো—হজরত কা'বার সমীপবর্ত্তী হইলেন। প্রথামতো তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি পুরাতন পবিত্র মন্দিরকে পৌত্তলিকতার কলুষ হইতে মুক্ত করিতে চলিলেন: একে একে তিন শত ষাটটী প্রতিমা অপসারিত হইল, স্তম্ভে প্রাচীর-গাত্রে যতো চিত্র ছিল, সমস্তই মুছিয়া গেলো। হজরত হাতের ছড়ি দিয়া প্রতিমাগুলির দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন আর বলিতেছেন: সত্য আসিল, মিথ্যা অপসারিত হইল, মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য্য। সত্য আসিল, মিথ্যা প্রত্যাবর্ত্তন আর সম্ভব নয়।

কা'বায় প্রবেশ করিয়া হজরত প্রাণ ভরিয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করিলেন। বহুদিনের মাতৃস্পর্শবঞ্চিত শিশু মাকে পাইলে যেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকে, তেমনি করিয়া ডাকিলেন। তাঁহার সহচর ও অনুচরগণ রসুলুল্লার মতোই তক্‌বির ধ্বনি করিলেন। দিন গেলো, রাত্রি গেলো। আল্লাকে ডাকিয়া মুসলিমের আর তৃপ্তি হয় না।

পরদিন বেলালের মধুস্রাবী কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হইল। দলে দলে কোরেশ আসিয়া ভিড় করিল। মোহাম্মদ আজ কি বলেন, শুনিতে হইবে।

বিজেতা আজ বিজিত শত্রুর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন, জানিতে হইবে। নামাজের পর হজরত খোত্‌বা দিলেন—একটী অভিভাষণে মক্কার সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন। ব্যক্তিগত নরহত্যার অপরাধের দণ্ড স্বরূপ পুরুষানুক্রমিক গোষ্ঠিগত যুদ্ধ-কলহ তিনি সর্ব্বপ্রথম নিষিদ্ধ করিলেন কৌলিন্যের গর্ব্ব ইসলামের অঙ্গ নয়; তাই মানুষে মানুষে তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন। মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, অনাচার, ব্যভিচার তিনি হারাম করিলেন। তারপর সমবেত কোরেশদের ডাকিয়া বলিলেন : মক্কার বাসিন্দাগণ, আজ তোমরা আমার কাছে কি আশা কর? সকলে সমকণ্ঠে উত্তর করিল : মঙ্গল প্রত্যাশা করি, আজ তুমি বিজয়ী, তথাপি করুণায় তুমি মহান্, তোমার কাছে আমরা কল্যাণ কামনা করি।

হজরত বলিলেন : তাই হোক! আজ তোমাদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই! আল্লা তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা সকলেই আজ মুক্ত—স্বাধীন।

যাহারা নৃশংস অত্যাচারে তাঁহাকে, তাঁহার সত্যের গ্রাহকদেরে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, তাঁহার জীবন ও তাঁহার সমাজের বিরুদ্ধে বারবার হীনতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, এবং এই প্রেমক্ষমার দিনেও তাঁহার সহিত লড়িতে চাহিয়াছিল, দণ্ডদানে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াও আজ তিনি তাহাদের বিনাশর্ত্তে ক্ষমা করিলেন, মুক্তি দিলেন! আবু-সুফিয়ানের পত্নী হামজার কাঁচা কলিজা চিবাইয়া খাইয়াছিল, ওয়াহ্‌শী বর্শাঘাতে হামজার পৃষ্ঠভেদ করিয়াছিলেন, একরামা এই মক্কাপ্রবেশের সময়েও খালেদের গতিরোধ করিয়াছিলেন, আবু-সুফিয়ান বার বার হজরতের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন,—সকলেই আজ বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, সত্যের বাহনকে হত্যা করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়া যদি কোনো পাপের ভাগী হইয়া থাকেন, আল্লা তাঁহাদের মাফ

করুন—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল আজ এই পরম প্রার্থনা। পাপী ঘৃণার পাত্র নয়, পাপই ঘৃণ্য ; মোস্তফা মানুষের মন হইতে সেই পাপ-কালিমার মার্জ্জনা চাহিলেন। দুষ্কৃতকে তিনি ভালোবাসিয়া কোল দিলেন, কিন্তু তাহার দুষ্কৃতির জন্য আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এই ব্যাপারের পর মক্কার বাসিন্দারা দলে দলে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে নিঃসহায় নিঃসম্বল মোহাম্মদ সাফা পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া হইতে সত্যের আহ্বান ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন তাহার উত্তরে বর্ষিত হইয়াছিল রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড আর শাণিত অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ। আজ হজরত মোস্তফা রাষ্ট্রপতি, আরব-বিজয়ী মহাবীর ; সহস্র সহস্র বাহু আজ তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় উত্তোলিত। তথাপি জোর নাই, জবরদস্তি নাই। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের মতো মধুর-গম্ভীর আহ্বান তাঁহার পেলব কণ্ঠে আজও ধ্বনিয়া উঠিল। মক্কার বাসিন্দারা আজ সত্যের প্রীতিমহান্ ক্ষমাসুন্দর রূপ দেখিয়াছে, আল্লার মহিমাগৌরব তাহাদের ভাগ্যের উত্থান-পতনে আজ তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই স্রোতোমুখে ভাসমান তৃণগুচ্ছের মতো তাহারা দলে দলে সত্যের টানে ছুটিয়া চলিল। হজরত হাসিমুখে সকলকে বায়্আৎ করিতেছেন, সত্যের দীক্ষা দিয়া মিথ্যার ময়লা মানুষের অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। নবদীক্ষিতের কণ্ঠ ভেদিয়া বাণী জাগিতেছে: আশ্‌হাদো-আন্-লাএলাহা ইল্লাল্লা—আশ্‌হাদো-আন্না-মোহাম্মদুর্ রসুলুল্লা (আমরা সাক্ষ্য: আল্লা ভিন্ন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ তাঁহার রসুল)। যাহারা আজ ইসলাম কবুল করিল, হজরত তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন, আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যাহারা মুসলিম মণ্ডলীর অন্তর্গত হইতে আসিল না, তাহাদেরও ক্ষমা দিলেন, সহিষ্ণুতা দিয়া রক্ষা করিলেন। হজরত

ইব্রাহিমের পুত্র ইস্‌মাইল 'কা'বা মন্দির নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানুষ আল্লাকে ভুলিয়া সেইখানে তুচ্ছতম পাষাণ-খণ্ডের, মানুষের হস্তাঙ্কিত চিত্রের—প্রতিমূর্ত্তির পূজায় প্রমত্ত হইয়াছিল। হজরত পৌত্তলিকতার সেই উৎসব-লীলা সাঙ্গ করিয়া কা'বাকে তাহার প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ওস্‌মান-ইব্‌নে-তাল্‌হা ছিলেন পৌত্তলিক কা'বার সেবক ও রক্ষক। রসুলুল্লাহ্‌ তাঁহাকে আবার সেই সম্মানিত পদে বহাল করিলেন। আব্বাস্‌ হজরতের চাচা; তাঁহাকে পবিত্র জম্‌জম্‌ কূপের পানি-পাত্রের অধিকার দিলেন। মক্কীয়দের যতোটুকু কর্ত্তৃত্ব ছিল, সমস্ত তিনি বজায় রাখিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লার মনোযোগ মক্কার আশ-পাশের গোত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা হোদায়বিয়া সন্ধির ফলে কোরেশদের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ইসলাম ও ইসলাম-বাহীর প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এতোদিনে তাহারা বুঝিল : ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম, প্রেম ও কল্যাণের প্রশস্ত রাজপথ; ইসলামের বাহন নবী মোহাম্মদ আশ্চর্য্য মানুষ। মানুষের মঙ্গল-কামনায় তাঁহার সমান কেহ নাই; পাপী মানুষের প্রতি ক্ষমা-তিতিক্ষায় তাঁহার জোড়া আর একটীও মিলে না। উচ্চ নীচ ভুলিয়া সকল মানুষকে একই আল্লার বান্দা—একই আদিম জনক-জননীর সন্তান ভাবিতে শিখাইয়া তিনি পতিতকে সমুন্নত, দুর্ব্বলকে সবল করিলেন; আপনার উচ্চতার উপলব্ধি হারাইয়া যাহারা ধূলার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টি আবার আকাশের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। মানুষের এমন বন্ধু আর কে আছে? তাই চিরদিনের শত্রু মক্কা আজ তাঁহার পদানত; প্রাণের যাহারা বৈরী, তাহারাই আজ তাঁহার প্রীতিসুন্দর ক্ষমার পাত্র! সমস্ত দেখিয়া চারিদিকের আরব-মন গলিয়া পড়িতেছে। এমনি সময়ে হজরত ইসলামের আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য—জোর নাই জবরদস্তি নাই, ভীতিপ্রদর্শন নাই,

অনুশয়-বিনয় নাই, শাদা মনে—শাদা কথায় সত্যের প্রতি গম্ভীর আহ্বান জানাইবার জন্য দিকে দিকে প্রচারক-দল পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ একটী দলের অধিনায়ক হইয়া গেলেন সায়ফুল্লাহ্—খালেদ-বিন্-ওলিদ্। যাজিমা গোত্রের কাছে গিয়া তিনি ইস্‌লামের দাওয়াৎ দিলেন। তাহারা রুখিয়া দাঁড়াইল, খালেদের সঙ্গে লড়িতে চাহিল। খালেদ তখনো ইসলামের শান্তিবাণীর মহিমা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি যতো বড়ো মুস্‌লিম, তার• চেয়ে বড়ো তিনি যোদ্ধা। বনু-যাজিমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তিনি লড়িলেন। খালেদের হাতে তাহাদের পরাজয় কঠিন কথা কিছু নয়। তাহাদের কতক লোক নিহত হইল, কতক হইল বন্দী। হজরত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তখনই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিয়া হজরত আলীকে পাঠাইলেন। খালেদকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন; আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিলেন: হে আল্লা! তুমি সবই জানিতেছ প্রভু, খালেদের এই কাজের সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই।

বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ্ যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিয়া কাহাকেও কোথাও পাঠান নাই। তথাপি দলে দলে আরব আসিয়া ইসলামের পতাকা-তলে ভিড় জমাইতে শুরু করিল।

অনিবার্য্য ইস্‌লাম

গোত্রের পর গোত্র মক্কায় আসিয়া ইসলামের সত্যের অথবা মুস্‌লিম রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। রসুলুল্লার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ব্যাপার দেখিয়া হোনায়নের হাওয়াজিন্ ও তায়েফের সাকিফ গোষ্ঠি আতঙ্কিত হইল। মক্কা-জয়ের পূর্ব্বে হাওয়াজিন্ গোত্রই মদীনার বিরুদ্ধে সমরায়োজনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে আয়োজন সফল হইবার পূর্ব্বেই মক্কা মুস্‌লিমের পদানত হইল, কা'বার প্রতিমা ধূলায় মিশিল, কোরেশের সামরিক শক্তি ভাঙিল। হাওয়াজিন ও সাকিফ দেখিল: যদি ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের অভ্যুত্থান আদৌ সম্ভব হয়, সে এই সময়েই। হাওয়াজিন সুনিপুণ তীরন্দাজ, তাহাদের ধনুর্বিদ্যার খ্যাতি আরবের সর্ব্বত্র। তাহারা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মক্কার মুস্‌লিম শক্তিকে মারিতে অগ্রসর হইল।

হজরত সংবাদ পাইয়াই কুচ করিলেন। মদীনার দশ হাজার মুস্‌লিম; মক্কার মুস্‌লিম-পৌত্তলিকে মিলিয়া দু' হাজার—মোট বারো হাজার যোদ্ধা লইয়া তিনি যুদ্ধে চলিলেন। শত্রুরা হোনায়ন প্রান্তরে অপেক্ষা করিতেছিল। একজন নেতার অধীনে বারো হাজার সৈন্যের একসঙ্গে অভিযান আরবের ইতিহাসে অতি-অসাধারণ ব্যাপার। মুস্‌লিমদের কাহারো কাহারো মনে এজন্য একটু গর্ব্ব দেখা দিল; তাঁহারা হাওয়াজিনদের সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না। এইরূপ অসতর্কতার ফলেই যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তাঁহারা সম্মুখে পশ্চাতে একই সময়ে আক্রান্ত হইলেন। দুই দিকে পর্ব্বত, সামনে পিছনে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ।

হাওয়াজিন্ ধানুকীর তীর পতঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়িতেছে, হাজার হাজার অশ্বসাদী পৌত্তলিক সৈন্য তাহাদের এই শেষ চেষ্টা সফল করিবার জন্য মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে মুস্‌লিমবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। স্বয়ং হজরতের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার বিশ বৎসরের কঠোর সাধনা আজ বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়!

ঘোর সংগ্রামের মধ্যে জয়-পরাজয় অনেকক্ষণ অনিশ্চিত হইয়া রহিল। অবশেষে হজরতের পিতৃব্য আব্বাসের আহ্বানে বিচ্ছিন্ন মুস্‌লিম বাহিনী আবার একত্র হইল। নব উদ্যমে আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গেলো। হাওয়াজিন্-শক্তি সে আক্রমণের বেগ সহিতে পারিল না। মুস্‌লিম বাহিনী জয়লাভ করিল।

হাওয়াজিন্ বাহিনী হোনায়নে পরাজিত হইয়া আওতাস্ ও তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু কোনোখানেই তাহারা তিষ্ঠিতে পারিল না। হাওয়াজিন্ ও সাকিফ দুই গোত্রেরই পতন হইল। ইহার পর পৌত্তলিক শক্তি আর ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করে নাই।

হাওয়াজিন্‌দের পরাজয়ের কিছুদিন পরে তাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াজিন্ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইল। হজরত নিজেই এ বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য কোরেশরাও আপন আপন অংশের বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

এই যুদ্ধের ব্যাপারে প্রাপ্ত সম্পত্তি হজরত কোরেশদের মধ্যেই বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন, আনসারদের দেন নাই। কপট দল এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিল এবং আনসারদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। আনসার প্রধানদের ডাকিয়া হজরত সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কোরেশরা নূতন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, এবং হোনায়ন যুদ্ধে ক্ষতি হইয়াছে তাহাদেরই সব চেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে কোরেশদের উট ছাগল ভেড়া দিয়াই খুশী করা হইল; কিন্তু

রসুলুল্লাহ্ জীবনে মরণে আনসারদেরই থাকিবেন। হজরতের বক্তব্য শুনিয়া আনসাররা সন্তুষ্ট হইলেন। দুনিয়ার সব-কিছুকে ছাড়িয়া তাঁহারা রসুলুল্লাকে চান। হজরত বলিলেন: তাহাই হইবে। ইহাতেই তাঁহাদের পরম সন্তোষ।

হিজরীর আট সাল হজরতের জীবনে বিশেষ স্মরণীয়। এই বৎসরে মক্কা বিজিত হইল, গ্রীক বাহিনী মুসলিম সৈন্যদলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল, হুনায়ন ও আওতাস যুদ্ধে আরবের পৌত্তলিক শক্তি চিরদিনের জন্য চূর্ণ হইয়া গেলো।

আর একটী কারণে এই বৎসরটী হজরতের ব্যক্তিগত জীবনে বড়ো করুণ হইয়া রহিল। তাঁহার একটি মাত্র পুত্রসন্তান—ইব্রাহিম। শিশু-ইব্রাহিম ছিলেন পিতার স্নেহের ধন—নয়নের পুত্তলি। শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের মতো, পথের দীন-দুঃখী মানুষের মতো হজরতের মনেও একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিবার হয়ত বাসনা জাগিত। নবীর সেই কামনা মূর্ত্ত হইয়াছিল বিবি মরিয়মের গর্ভজাত এই সন্তানটীতে। কিন্তু হিজরীর আট সালের শেষে—পর পর কয়েকটী সামরিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আসিল ইব্রাহিমের মৃত্যু। হজরত চোখের জলে ভাসিয়া মৃত পুত্রকে কবরে শোয়াইলেন, আল্লার ইচ্ছার সম্মুখে আপনার জয়োন্নত শির বার বার নোয়াইলেন। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতো ধীর স্থির অচঞ্চল চিত্ত আজ পুত্রবিয়োগের ব্যথায় গলিয়া পানি হইয়াছে; তিনি সিক্তঃদৃষ্টিতে বার বার উর্দ্ধদিকে চাহিতেছিলেন। "অশ্রু মানুষের শোকে সান্ত্বনা"—তিনি কবরের মাটী চাপা দিতে দিতে বলিলেন,—"যদিও ইহাতে মৃতের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই।

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন স্ূর্য্যগ্রহণ হইল। কেহ কেহ বলিল: হজরতের পুত্র-বিয়োগে :প্রকৃতির এই বিষণ্ণতা। রসুলুল্লাহ্ বলিলেন: "চন্দ্র-সূর্য্য আল্লারই নিদর্শন; উহাদের 'গ্রহণ' আল্লার মহিমাদ্যোতক, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই।"

অনিবার্য্য ইস্‌লাম

•অলৌকিকতার মাহাত্ম্যপ্রচার করিতে হজরত দুনিয়ায় আসেন নাই। তিনি গাহিয়াছেন মানবতার জয়গান। প্রাকৃতিক ঘটনার সুযোগ লইয়া —কুসংস্কারকে ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার তাঁর জন্য নয়।

তায়েফবাসীর বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে হজরত মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। চারিদিকের গোত্রগুলি ক্রমেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। তিনি তাহাদের কাছে সত্যের আহ্বান পৌছাইবার জন্য প্রচারক দল পাঠাইলেন। নবম হিজরীর শুরু হইতেই নানা গোত্রের প্রতিনিধিরা মদীনায় আসিয়া সত্যের প্রতি—কেহবা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানাইতে লাগিলেন। যাঁহারা ইসলাম কবুল করিলেন, তাঁহারা জাকাত দিবেন, স্বদেশ ও রাষ্ট্রের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন; আর যাঁহারা ইস্‌লাম গ্রহণ না করিয়া শুধু রাষ্ট্রের অনুগত হইয়া রহিলেন, তাঁহারা সামরিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। জাকাতের পরিবর্ত্তে এবং দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগদানের বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাইয়ের বদলে তাঁহারা আর একপ্রকার কর দিবেন, স্থির হইল। জাকাত সমর্থ মুসলিমদের সাংসারিক ব্যয়ের অতিরিক্ত যাবতীয় অর্থ ও গৃহপালিত পশুর মূল্যের শতকরা আড়াই অংশ। অমুসলিমদের উপর যে কর স্থাপিত হইল, তাহার নাম জিজিয়া—অতি-সঙ্গত, কিন্তু বহু-নিন্দিত, জিজিয়া। ইহার পরিমাণ অতি সামান্য।

হজরত মদীনায় মুসলিম রাষ্ট্রের বিধি ব্যবস্থা ও শক্তি সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার জীবনের শেষ বৎসর কয়টী নিযুক্ত করিতেছেন, ইতিমধ্যে সিরিয়ার খৃষ্টান শক্তির সমরায়োজনের সংবাদ আসিল। মূতা যুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার মতলবে খৃষ্টানদের একলক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। এবারে স্বয়ং রোম সম্রাট সিজার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। লাখ্‌ম্‌, গস্‌সান, জোজাম্‌ প্রভৃতি আরবের বহু খৃষ্টান গোত্র সিজারের সহিত যোগ দিয়াছেন। এবারে কত সৈন্য ইসলামের বিরুদ্ধে সমবেত হইবে কে

জানে? ইরাণীদের সম্প্রতি কয়েকটা যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া রোমের—রোমান বাহিনীর সাহস ও স্পর্দ্ধা চরমে উঠিয়াছে। ইসলামের মুণ্ডপাত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না, এই ভরসায় তাহারা আজ উন্মত্ত।

হজরত এ-সমস্ত সংবাদই পাইলেন। ভক্তদের যথাসাধ্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সমরায়োজনে সাহায্য করিতে বলিলেন। হজরত ওমর আনিলেন তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক; হজরত আবুবকর আনিলেন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। হজরত বলিলেন: আবুবকর, তোমার নিজের জন্য কি রাখিলে? আবুবকর বলিলেন: আল্লা ও তাঁহার রসুল! এইভাবে যিনি যাহা পারিলেন, যুদ্ধ ফাণ্ডে আনিয়া জমা দিলেন। দ্রুত আয়োজন চলিল। ত্রিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বসাদী সৈন্য সঙ্গে লইয়া হজরত রোমান বাহিনীর সাম্‌না লইবার জন্য যাত্রা করিলেন। মদীনার শাসনভার রহিল হজরত আলীর উপর। কপটেরা পানির অভাব, দুর্ভিক্ষ, পথের দুর্গমতা, রোমবাহিনীর রোমাঞ্চকর বীরত্ব—প্রভৃতি নানা অজুহাত ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া যুদ্ধের দায় এড়াইল। হজরত কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আল্লার শক্তি ও সাহায্যে আকাশস্পর্শী প্রত্যয় লইয়া তিনি চল্লিশ হাজার সমর-সঙ্গী সহ কুচ্ করিলেন। পথ চলিতে—দুঃসহ গ্রীষ্মের তাপে, সুপেয় পানির অভাবে তাঁহাদের ক্লেশের সীমা রহিল না। কত লোক গন্তব্য স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই মরিয়া গেলো। হজরত বৃদ্ধ বয়সে সঙ্গীদের সহিত সমস্ত দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শই চল্লিশ হাজার মুস্‌লিমকে এই নিদারুণ পরীক্ষার মধ্যেও সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে উৎসুক করিয়া রাখিল।

দীর্ঘ পথ বাহিয়া হজরত—মদীনা ও দামশ্‌কের মাঝখানে—তাবুক পৌছিলেন। মুতা যুদ্ধে গ্রীক-রোমান বাহিনী সংখ্যাল্প মুসলিম সৈন্যের

শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছে। এবারে চল্লিশ হাজার মদীনীয় যোদ্ধার আগমন-সংবাদ পাইয়া তাহারা ভড়্‌কিয়া গেলো। গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া রোম-সম্রাট সিজার ইসলাম ধ্বংসের কল্পনা ছাড়িয়া দিলেন। হজরতের এতো কষ্ট স্বীকার কিন্তু ব্যর্থ হইল না। প্রথমতঃ, প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ আরব সৈন্য রোমান শক্তির সহিত লড়িতে আসিয়াছে। ইহাতে সিজার বেশ বুঝিতে পারিলেন: প্রাচীন যুগের ন্যায় এযুগেও আরবকে বিদেশীর অধীন করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সিরিয়া সীমান্তের অনেকগুলি খৃষ্টান দলপতি মুস্‌লিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিল। একজন খৃষ্টান রাজা মুস্‌লিম বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ্‌ দিয়া আপনার সুদৃঢ় দুর্গে ঢুকিয়াছিলেন। খালেদের বীরত্বে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল; তিনি মদীনার অধীনতা মানিয়া লইলেন। এক হাজর উট, আট শত অশ্ব এবং চার শত বন্দী লইয়া হজরত গৃহে ফিরিলেন।

তাবুক হইতে ফিরিয়া হজরতের হুকুমে একদল মুসলিম তীর্থ করিবার জন্য মক্কা ধামে গমন করিলেন। হজরত আবুবকর হইলেন এই দলের নেতা। হজ্বব্রত সমাপ্ত হইবার পর মদীনার পক্ষ হইতে এক ঘোষণা প্রচারিত হইল: (১) এখন হইতে পৌত্তলিকরা কা'বায় হজ করিতে পাইবে না, এবং (২) উলঙ্গ হইয়া কেহ কা'বা পরিক্রমণ (তাওয়াফ) করিতে পারিবে না (পূর্ব্বে নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফ করিবার নিয়ম ছিল)।

হিজরীর নয় সাল, দশ হিজরীর প্রারম্ভ কাল আরবে ইসলামের পূর্ণ পরিণতির যুগ। নিকট ও দূরের—এয়মন, বাহ্‌রায়েন, সিরিয়া ও 'ইরান' সীমান্তের—বহু জাতি প্রতিনিধি-দল পাঠাইয়া ইসলাম কবুল করিল। তায়েফের সাকিফ গোত্র এতোদিন ইস্‌লামের ঘোর শত্রু ছিল। তাহারাও আজ নবসত্যের পরম সেবক হইল। কিন্তু পুরাতনের সহিত কঠিন তাহাদের বাঁধন। তাহারা তাহাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী—'রব্বাহ্‌'—লাৎ দেবীর

প্রতিমাটী আপাততঃ কিছুদিন রক্ষা করিবার অনুমতি চাহিল। শুনিয়া হজরত ওমর জ্বলিয়া উঠিলেন : নরকের অগ্নি তোদের অদৃষ্ট হোক! সাকিফ দূত বলিল : আমরা মোহাম্মদের সহিত আলাপ করিতেছি, তোমার সঙ্গে নয়।

হজরত বলিলেন : ভালো; কিন্তু তোমাদের প্রস্তাব আমি মানিতে পারিব না। হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয় তো লাৎ-দেবীকে লইয়া থাকো। এ দুইটী এক সঙ্গে থাকিতে পারে না।

সাকিফরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। বলিল : অন্ততঃ দু'মাসের জন্য অনুমতি দিন।

হজরত : না।

সাকিফ : তাহা হইলে এক মাসের জন্য?

হজরত বলিলেন : এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়।

রসুলুল্লার এই সিদ্ধান্তে লাৎ-দেবীর ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেলো চিরকালের জন্য।

সাকিফ গোত্র ভিন্ন কা'ব, তামিম, আবদুল্-কায়েস্, হানিফ, তায়ী, দাওস্, আসাদ, কেন্দা, আশ্আর্, হেমায়র্ প্রভৃতি বংশ মুস্লিম মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইল। আরবে—সিরিয়া-ইরানের দূর প্রান্তে ইসলামের গৌরব-মহিমা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। যিনি ছিলেন অত্যাচারিত পলায়িত, তিনি আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী; তাঁহার প্রচারিত সত্যের আজ চারিদিকে জয় জয়কার!

ওপারের ডাক

হজরতের দীর্ঘ আয়াসিত জীবন আজ সফলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। অত্যাচারের পর অত্যাচার হানিয়া, অস্বীকৃতি ও অবমাননার ধূলাবালি ছড়াইয়া শয়তান যে-সত্যকে মারিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহা মানুষের মাথার মণি, দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আজ তাহার জয় জয়কার। এমন পরিপূর্ণ সাফল্য কয়জন মানুষের ভাগ্যে হয়? মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ বৃদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার প্রচারিত সত্যের দিগন্তব্যাপী সমুজ্জ্বল দীপ্তির মাঝখানে তাঁহার নয়নে ক্রমশঃ গোধূলি ঘনাইয়া আসিতেছে; গত বাইশটী বছরের ভীতিহীন শ্রান্তি-হীন দুর্ম্মদ সাধনায় আল্লার অনন্ত করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তর কৃতজ্ঞতার উদ্বেল আবেগে বার বার নুইয়া পড়িতেছে। এ সময় তাঁহার একবার—হয়তো জীবনে শেষ বার—তাঁহার সত্য-সাধনার এবং বর্ত্তমানে তাঁহার সত্য-সাফল্যের পুণ্য কেন্দ্র কা'বা দর্শন করিয়া আসা উচিত নয় কি?

হজরত মক্কাধামে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হিজরীর নয় সালের শেষভাগেই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল: আগামী হজ-মৌসুমে আঁ হজরত মক্কা-শরীফে গমন করিবেন। লক্ষ-লক্ষ নও-মুসলিমের কাছে এই বারতা এক অপূর্ব্ব আনন্দ বহিয়া আনিল। হজরতের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য বহু লোকের হয় নাই। তাঁহারা এইবার প্রভুকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইবেন। হাজার হাজার লোকের তাঁহার সহিত মিলিয়া হজব্রত পালনের পুণ্য অর্জ্জিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব সুযোগ এইবার মিলিবে। দিকে দিকে মুসলিম দল প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হিজরীর দশ সালে, জিলকাদ মাসের শেষে হজরত হজযাত্রা করিলেন। সম্পত্তি, বংশ-গৌরব, প্রভুত্বের গর্ব্ব—সব কিছু ভুলিয়া, সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রেম ও সাম্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত লক্ষ মুসলিম মক্কার পথে প্রাণপ্রিয় হজরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। দশ বছর পূর্ব্বে যে-পথ ধরিয়া হজরত দীন হীন ফকিরের বেশে মদীনায় আসিয়াছিলেন, আজ আবার সেই পথে তিনি চলিলেন —অধিপতি রূপে। যতোই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নব নব যাত্রিদল তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইল। মক্কায় পৌঁছিয়া তিনি যথারীতি হজ ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন; আরবের দুই লক্ষ মানুষ তাঁহার সহিত সমকণ্ঠে আল্লার নামের জয়ধ্বনি করিল। যেদিন মক্কায় আল্লার নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না সেই এক দিন, আর আজ একদিন। সেই অতীত-কথা স্মরণ করিয়া আজ হজরতের মাথা—সকল জয়-সাফল্যের মহিমময় প্রদাতা আল্লার নামে বার বার অবনত হইল। অশ্রু-নীরে ভিতিয়া তিনি দীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি তাঁহাকেই নিবেদন করিলেন।

হজের পর একটী উটের পিঠে চড়িয়া হজরত সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ-উপদেশ শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু হজরতের কণ্ঠ এতো বড়ো জনতার শেষ-সীমা-পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তাই তাঁহার প্রত্যেকটী বাক্য সেই বিরাট সভার বিভিন্ন স্থান হইতে ঘোষণাকারীদের কণ্ঠে সমুচ্চারিত হইতে লাগিল। হজরত এক একটী বাক্য উচ্চারণ করেন, শত স্থান হইতে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়া সমগ্র প্রান্তরটী-মুখরিত করিয়া তোলে। কিন্তু সভাজন নিস্তব্ধ নীরব; রসুলের মুখের প্রত্যেকটী বাণী গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের সারা দেহ মন উন্মুখ। হজরত বলিলেন:

"সমবেত জনমণ্ডলি, মনোযোগ দিয়া আজ আমার কথাগুলি তোমরা শুনিয়া লও। কেননা তোমাদের সঙ্গে আবার হজ করিতে পারিব, এ আশা

আমার নাই। আজিকার এই দিবস, মক্কার এই পুণ্যধাম লোকচক্ষে যেরূপ পবিত্র, স্মরণ রাখিও তোমাদের পরস্পরের ধনপ্রাণও তোমাদের কাছে সেইরূপ পবিত্র, সেইরূপ রক্ষনীয়।

"শুন শুন মানুষ, আমি যাহা বলিতেছি অন্তরে গাঁথিয়া রাখ : **প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুস্‌লিমের ভাই।** তাহাদের সকলের সমান দায়িত্ব, সমান অধিকার। সম-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ তোমরা একটী মাত্র সমাজ। অতএব তোমাদের ভাই স্বেচ্ছায় তোমাদের যাহা দান করে, তাহার অতিরিক্ত গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হারাম।

"জানিয়া রাখ সমবেত জনগণ, স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার, সেইরূপ স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর অধিকার। তাহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদের দাম্পত্য ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিও। তাহারা তোমাদের কাছে আল্লার গচ্ছিত ধন, তাহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিলে আল্লার ক্রোধ তোমাদেব উপরে নামিয়া আসিবে।

"তোমরা নিজেরা যাহা খাও, যে বসন পরিধান কর, তোমাদের দাসদাসীদের সেই আহার্য্য, সেই পরিধেয় দিবে। তাহাদের নির্য্যাতন করিও না, মর্ম্মে ব্যথা দিও না। যদি কোনো নাক-কাটা ক্রীতদাসকেও তোমাদের নায়ক পদে বরণ করা হয়, তোমরা বিনা দ্বিধায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবে।

"সমবেত জনমণ্ডলি, শয়তান আর কখনো তোমাদের দেশে পূজা পাইবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক তুচ্ছ ব্যাপারের ভিতর দিয়া শয়তান মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

"আল্লার কেতাব (কোরআন্) তোমাদের জন্য আমি রাখিয়া গেলাম। উহাই যেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়।"

শেষে হজরত বলিলেন : "অনেক মুসলিম এখানে আজ অনুপস্থিত ; তোমরা সকলের কাছে আমার এই উপদেশ-বাণী বহন করিও।"

তারপর তিনি আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করিলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিলেন : "হে আল্লা, আমি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম।"

হজরতের এই কথায় জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বজ্রনিনাদ শুনিয়া লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি জাগিল : হাঁ রসুলুল্লাহ্, সত্যই আপনি আল্লার বাণী আমাদের দান করিয়াছেন।

অভিভাষণ সমাপ্ত হইল। হজরত বুঝিলেন : তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন করিয়াছেন ; তাঁহার জীবনের মহাব্রত আজ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জনতার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। গম্ভীর আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন : বিদায় !

তাই হজরতের এবারের হজ হইল বিদায়-হজ, তাঁহার উপদেশ-বাণী বিদায় অভিভাষণ। মানুষের জন্য যে মঙ্গল তিনি চাহিয়া আনিয়াছিলেন, আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল, যে-সত্যের সেবায় দীর্ঘজীবনের দুঃখ-দহন বরণ করিলেন, তাহা আজ পরিপূর্ণ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কোর্‌আনের শেষ আয়াত সম্পূর্ণতার বাণী লইয়া আসিল : আল্‌-য়্যাওমা আক্‌মালতু-লাকুম্ দীনাকুম্— ও আত্‌মাম্‌তু আলায়কুম্ ন্য'মাতি। আজ আমরা তোমার ধর্ম্মকে—তোমার সত্যকে পূর্ণপরিণত করিলাম ; তোমার প্রতি আমাদের ন্যে'মত্—অনুগ্রহ-দান আজ সম্পূর্ণ হইল।

এখন আর হজরতের ইহ-জীবনের প্রয়োজন রহিল না। হিজরীর এগারো বৎসরে সফর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। তিনি যেন ওপারের ডাক স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। একদিন মসজিদে খোৎবা দিতে উঠিয়া তিনি বলিলেন : আল্লা তাঁহার একজন সেবককে জগতের সম্পদ দান করিলেন, কিন্তু সে তাহা তুচ্ছ করিয়া আল্লাকেই বরণ করিল। হজরত আবুবকর রসুলুল্লার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর কেহ বৃদ্ধের অশ্রুপাতের কারণ জানিতে পারিল না।

ওপারের ডাক

খায়বারে জয়নাব-প্রদত্ত বিষের ক্রিয়া বর্ত্তমান ব্যাধিকে বড়োই ক্লেশকর করিয়া তুলিল। হজরত সঙ্গীদের ডাকিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানের এবং অনাগত কালের অনুগামীদের উদ্দেশে শান্তি ও স্বস্তিবাণী—সালাম পাঠাইলেন। নবী ও রসূলদের প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া মানুষ পরিণামে তাহাদের পূজা শুরু করিয়া দেয়, মুস্‌লিমদের এ-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিলেন।

ক্রমেই পীড়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলিল। রবিউল্‌-আউয়ল মাসের দুই তারিখ। হজরতের অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। মৃত্যু-যন্ত্রণায় তিনি বার বার সংজ্ঞা হারাইতেছেন; চেতনা ফিরিয়া আসিলেই বলিতেছেন: আল্লা, পরম বন্ধু আমার, প্রিয়তম সুহৃদ আমার, তোমারই কাছে, প্রভু, তোমারই সন্নিধানে!

বিবি আয়শার কোলে মাথা রাখিয়া হজরত অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত। হজরত আলীর দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন: দাসদাসীদের প্রতি নির্ম্মম হইও না।

মৃত্যুর হস্ত তাঁহার দেহ স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার সারা অঙ্গ তুহিনশীতল হইয়া উঠিতেছে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন: **নমাজ, সাবধান! দাসদাসীদের প্রতি—সাবধান!**

মহাপুরুষের মুখমণ্ডলে মৃত্যুর মলিনতা ছাইয়া গিয়াছে। অস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখে আল্লার নাম ধ্বনিত হইল: হে আল্লা, হে আমার পরম বন্ধু!

এই তাঁহার শেষ বাণী।

মানুষ-মোহাম্মদ

হজরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদীনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারো মুখে আর কথা সরে না; কেহ বা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে। রসুলুল্লার পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন: তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন: যে বলিবেন হজরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে!

মহামতি আবুবকর শেষপর্যন্ত হজরতের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন: যাহারা হজরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লার উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লা অমর, অবিনশ্বর। আল্লার সুস্পষ্ট বাণী: মোহাম্মদ একজন রসুল বই আর কিছুই নন; তাঁহার পূর্ব্বে আরো অনেক রসুল মারা গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ্ মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন; তাই বলিয়া তিনি যে-সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে—ঐ দূর অন্তরীক্ষে যা কিছু দেখিতে পাও, সবই আল্লার (সৃষ্টি); তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হজরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলের চৈতন্য হইল। হজরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটীতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হজরতের বাণী: আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল: কোর্‌আনের আয়াত: মোহাম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাদেরও ভাগ্য!

তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুস্‌লিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি : আমরা সাক্ষ্য : মোহাম্মদ আল্লার দাস (মানুষ) ও রসুল।

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতেও আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হজরত আবুবকর রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের সীমা-রেখা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তিনি রসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখবেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ এই কথাই বৃদ্ধ হজরত সিদ্দিক মূর্চ্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যতঃ তাঁহার মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু বংশ-গৌরব হজরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই। জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নর-নারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল্-আমীন—বিশ্বস্ত, প্রিয়-ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা—বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, বলিষ্ঠ দেহ—দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুতঃ হজরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদীনা পলায়নের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটীরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাঁহাদের ব্রত। হজরত যখন আসিলেন, কুটীর-স্বামী আবু-মা'ব্‌দ্ মেষপাল চরাইতে গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী উম্মে-মা'ব্‌দ্ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হজরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহ-পতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নবী-অতিথির রূপ-বর্ণনা করেন : সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ ; বয়ানে অপূর্ব্ব কান্তি শ্রী। তাঁহার আয়ত কৃষ্ণ দু'টী নয়ন ; কাজল-রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল

তাঁহার সু-উচ্চ গ্রীবা ; 'কালো কালো দু'টী চোখের ঢল ঢল চাহনি—মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব্ব পুলক-দীপ্তি তাঁহার চোখে-মুখে, বলিষ্ট পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সে অপরূপ রূপের অধিকারী !

সত্যই হজরত বড়ো সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতোটুকু সহায়তা করে, তার সবটুকুই তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল ; কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনার জন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন ; শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্য্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহ-কপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্ব্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বার বার তিনি জর্জ্জরিত হইয়াছেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে—অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্ত-রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে-প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তর-ঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বার বার তিনি উপহসিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটী মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে : এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা ক'রো।

তায়েফে সত্যপ্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কি ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে চলিতে শত্রুর প্রস্তর-ঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন ; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্ব্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথর বৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন তিতিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত

রুধিরধার পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধন-সম্পদ, নেতৃত্বের মর্য্যাদা, রাজার সিংহাসন—সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া যে-সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাকে উপহসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ ঘৃণা বা বিরক্তির একটী শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাৎ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন: না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি আসিয়াছি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করাই আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়তো কাল তাহারা—তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে! আপনার আঘাত-জর্জ্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল: তিনি ঊর্দ্ধদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন: তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্ব্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও! বিপদবারণ তুমি, অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা, তাঁহাদের পংক্তিতে আমায় স্থান দাও।

মক্কীয়েরা হজরতের নবীত্ব-লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কি নির্ম্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্য্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেলো: কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হজরত মদীনায় পলাইয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হজরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া শত শত ঘাতক—ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র ঘাতক পাঠানো

হইল। বদর, ওহোদ ও আহ্‌জাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের—মুস্‌লিমের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খায়বারের যুদ্ধে হজরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হজরতের মৃত্যু-সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হোদায়বিরা সন্ধিতে হজরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুস্‌লিমদের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হজরত যে দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেদিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালেদের সহিত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্য্যাতন; প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বাণ; হজরত তাহাদের সহিত কি ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া, ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া তিনি বলিলেন: ভাই সব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত! মানুষের প্রতি প্রেমে-পুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান্ প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হজরতের বিরাট্ মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণার নয়, মানুষ হিসাবে আপনার তুচ্ছতাবোধ, আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমা-গৌরবকে মুহূর্ত্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কা-বিজয়ের পর হজরত সাফা পর্ব্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটী লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হজরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন: কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য্য!

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতার এই অনুভূতিই হজরতের চরিত্রকে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটীর অধীন, হজরতও মানুষ; সুতরাং তাঁহারও ত্রুটী হইতে পারে :—এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশে—মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলে দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্যপ্রচারে ব্রতী। মজলিসের একপ্রান্তে বসিয়া একটী অন্ধ। সম্ভবতঃ সে হজরতের দু'একটী কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটী প্রশ্ন করিয়া সে হজরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হজরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাষ ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটী এমন গুরুতর কিছুই নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার, দুঃখী দুর্ব্বল লোকদের হজরত বড়ো আদর করিতেন, কাহারো ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন—কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এ-কথা কাহারো মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটীর প্রতি ইঙ্গিত আসিল কোর্‌আনের একটী বাণীতে; তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন : 'একজন অন্ধ তাঁহার বক্তৃতায় বাধা দেওয়ায় নবী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন। তিনি এমন কতকগুলি লোককে সম্বোধন করিতেছিলেন নবীকে দিয়া যাহাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এবং একজন আসিল, যাহার প্রয়াস ছিল কঠিন, অন্তর ছিল ধর্ম্মভীরু; তাহার দিক হইতে তিনি মুখ ফিরাইলেন!' হজরতের সামান্য অমনোযোগের জন্য এই তিরস্কার, তাঁহার নিজের মুখে প্রকাশিত এই ভর্ৎসনা মানুষের দৃষ্টিতে অক্ষয় হইয়া রহিল।

মানুষ হিসাবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্ম্মল অনুভূতি হজরতকে আপনার দোষত্রুটী সাধারণের চক্ষে এমন নির্ব্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছাস্বীকৃত দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্ব্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড়ো অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুস্‌লিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্ব্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়—সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হজরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকলের সঙ্গী সহচররূপে সহোদর ভাইয়ের মতো—আদর্শ-প্রয়াসী নেতার কর্ত্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্য্যাতন সহিলেন, দুঃখশোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লার নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা—মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক-মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সমগ্র আরবের তিনি অধিপতি হইলেন, গোষ্ঠিপতি দলপতি দেশাধিপতি তাঁহাকে আনুগত্য দিল—রাজা মানিল, চিরদিনের শত্রু অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার উদ্দেশে পতাকা অবনমিত করিল। এমন মহামহিম সম্রাটের গৃহে কি সম্বল ছিল? তাঁহার বর্ম্ম বন্ধক রাখিয়া এক ইহুদীর বাড়ী হইতে কিছু খাদ্য-শস্য আনা হইয়াছিল। কর্জ্জ শোধ দিয়া সেখানি তখনো ফেরত আনা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্ব নিশীথে স্নেহ-বঞ্চিত প্রদীপ বিষাদের অন্ধকারে আলো দেয় নাই। এমনি সময়ে, এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবী মৃত্যু-রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগ-বিধুরা আয়শার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল: মানুষের মঙ্গলসাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই

সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন! নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন! সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লানবদনে সহিলেন, সেই ধার্ম্মিক আজ চলিয়া গেলেন! পাপ-অন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই; শত অত্যাচার নির্য্যাতন তাঁহার পুণ্য হৃদয়কে মলিন করে নাই; দুর্গত দীন-দুঃখীকে তাঁহার করুণা কোনো দিন বঞ্চিত করে নাই। সেই প্রিয় নবী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন!—হায়, সেই দয়ার নবী, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তর-ঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাট রুধিরাক্ত হইয়াছিল; আর সেই আহত জর্জ্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন! দু'বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্য হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত্ত প্রকাশ মহানবী আজ চলিয়া গেলেন!

বিবি আয়শার মর্ম্মছেড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের—সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য-সাধনায় নয়, শুধু ঊর্দ্ধলোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হজরত মোস্তফা ইতিহাসের একটী অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন—চরিত্র-সৌন্দর্য্যের এতোগুলি দিকের সমাহার ধূলামাটীর পৃথিবীতে বড়ো সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপন জন হইয়াও তিনি নমস্য—বরণীয়।

বালাগাল্‌উলা বেকামালিহি।
কাশাফদ্‌দুজা বেজামালিহি।

সমাপ্ত

ঘটনা-পঞ্জী

ঘটনা	খৃষ্টাব্দ	হিজরী
হজরতের জন্ম	৫৭১ খৃষ্টাব্দ	
বিবি আমেনার মৃত্যু	৫৭৬ খৃষ্টাব্দ	
বিবি খদিজার সঙ্গে হজরতের বিবাহ	৫৯৫ খৃষ্টাব্দ	
প্রথম ওহী	৬১০ খৃষ্টাব্দ	
বিবি খদিজা ও হজরত আলীর ইসলাম গ্রহণ	৬১০ খৃষ্টাব্দ	
প্রকাশ্যে ইসলামপ্রচার	৬১৩ খৃষ্টাব্দ	
হজরত ওমরের ইসলামগ্রহণ	৬১৫ খৃষ্টাব্দ	
আবুতালেব ও বিবি খদিজার মৃত্যু	৬২১ খৃষ্টাব্দ	
বিবি আয়শার সঙ্গে হজরতের বিবাহ	৬২১ খৃষ্টাব্দ	
মে'রাজ	৬২২ খৃষ্টাব্দ	
হিজরত	৬২২ খৃষ্টাব্দ	
বদর যুদ্ধ	৬২৪ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ২য়)
বিবি ফতেমা ও হজরত আলীর বিবাহ	৬২৪ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ২য়)
ওহোদের যুদ্ধ	৬২৫ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৩য়)
হোদায়বিয়ার সন্ধি	৬২৮ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৬ষ্ঠ)
বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের দাওয়াত	৬২৯ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৭ম)
মক্কায় হজ	৬২৯ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৮ম)
মক্কা বিজয়	৬৩০ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৮ম)
হোনায়নের যুদ্ধ	৬৩০ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ৮ম)
বিদায় হজ	৬৩২ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ১০ম)
ওফাত	৬৩২ খৃষ্টাব্দ	(হিজরী ১১শ)